আশ্চর্য যন্ত্র এই দেহ

আকাশ সেন

গৃহচিকিৎসক গ্রন্থাগার

আশ্চর্য যন্ত্র এই দেহ

আকাশ সেন

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রকাশ করেছেন ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩ থেকে।

ছেপেছেন অদ্রীশ বর্ধন
দীপ্তি প্রিন্টার্স
৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৪ থেকে।

ভেতরে ছবি এঁকেছেন প্রণবেশ মাইতি।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন আলোক দাশগুপ্ত

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৮২

দাম : পঁচিশ টাকা

উপেন আর উমা

আদর্শ পুরুষ এই উপেন। তার বউ উমা-ও আদর্শ নারী। উপেনের বয়স ৪৬, উমার ৪১। এদের ছেলেমেয়ের সংখ্যা তিন।

এদের প্রত্যেকের যা দেহযন্ত্র, তা সব পুরুষের এবং সব নারীর আছে। এই দেহ-যন্ত্ররাই বলছে তাদের চমকপ্রদ কাহিনী।

এই গ্রন্থে তাই অধিকার রইল বিশ্বের সমস্ত উপেন এবং সমস্ত উমার।

ঋণ স্বীকার

বহু পত্র পত্রিকা এবং ডাক্তারী বইয়ের কাছে।

সূচীপত্র

ভূমিকা

"জৈব স্থিতিস্থাপকতার দিক দিয়ে মানুষের দেহ একটা বিস্ময়।"

এ বই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই এই কারণে যে এর মধ্যে যে সব বিস্ময় রয়েছে তা আপনাকে আর আপনার দেহকে নিয়ে।

হ্যাঁ, বিস্ময় লুকিয়ে রয়েছে আপনার দেহের মধ্যে; কিন্তু আপনি সে সম্বন্ধে বোধহয় ওয়াকিবহাল নন—অথচ প্রতি নিয়ত এই দেহ নিয়েই বেঁচে আছেন আপনি।

আপনার বাড়ীতে যন্ত্রপাতি নিশ্চয় অনেক আছে। তাদের খবর যতটা রাখেন, আপনার দেহযন্ত্রটার খবর হয়ত ততটা রাখেন না।

যন্ত্রপাতি কি করে চলে, সে খবর রাখেন—কিন্তু বোধহয় খবর রাখেন না আপনার এই দেহযন্ত্রটি চলে কি করে। রেডিও নিয়ে খুটখাট করছেন যে রেডিও-ইঞ্জিনীয়ার, তিনি রেডিও সম্বন্ধে যতটা জানেন, তত জানেন না নিজের দেহ সম্বন্ধে। হেঁসেল নিয়ে গৃহবধূ রান্নাঘরের উনুনের যতটা যত্ন নেন অথবা গেরস্থালির জিনিস পত্র যতটা গোছগাছ করে রাখেন, তার কণামাত্রও যত্ন নেন না নিজের ফুসফুস জোড়ার।

যে দেহ আমাদের নিজেদের, আর কারো নয়, সেই নিজস্ব দেহটা সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা সত্যিই বড় বিস্ময়কর—দেহের বিস্ময়ের চাইতেও। দেহের যন্ত্রগুলো চালু রয়েছে কি করে, সে সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানও আমাদের নেই। দেহটাকে কিন্তু যত ভালবাসি, আলিবাবার রত্নগুহাকেও অত ভালবাসি না। দেহ যেন আমাদের সম্পদ। কিন্তু মজার কথা হল, এই পরম সম্পদ দেহটাকেই আবার তাচ্ছিল্য করি, দেহযন্ত্রের অনাদর করি। দেহের শারীরস্থান যেন সমস্ত বুঝে ফেলেছি, এই রকম একটা ধারণা নিয়ে পরম নিশ্চিন্ত থাকি—কারণ, দেহটা যখন আমাদের, তখন দেহের শারীরস্থান তো জানবই; শারীরস্থান মানেই তো আমরা—আমরা মানেই শারীরস্থান। আমাদের দেহের দৈহিক গঠন আমরা জানব না তো কারা জানবে। কিন্তু এ তো নিজেদেরই প্রবঞ্চনা করা। দেহগত ভাবে বললে, আমরা বেশীর ভাগই অর্ধ-শিক্ষিত।
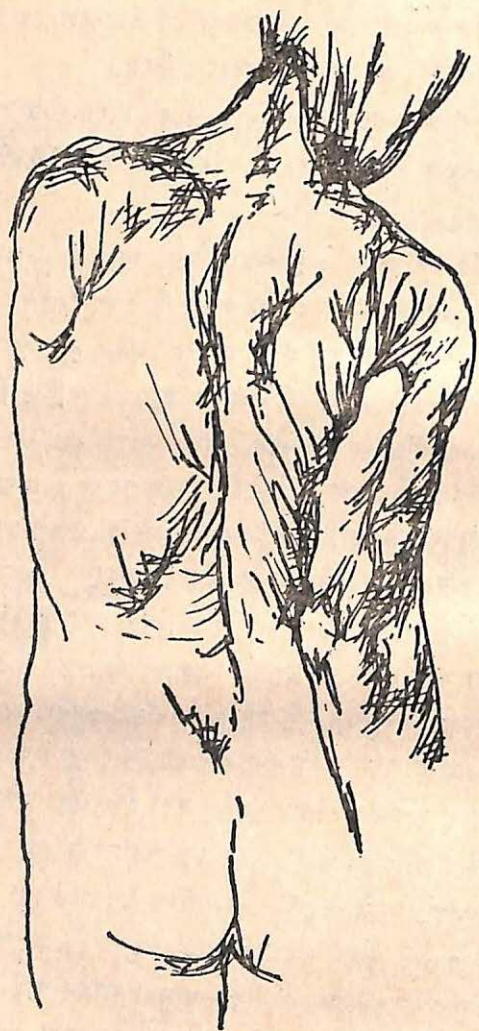
এর মধ্যেও কিন্তু বিদ্রূপের রেশ থেকে যাচ্ছে। হঠাৎ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি, তাহলেই দেহযন্ত্রগুলোর ওপর সম্ভ্রম বোধ যেন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বিলম্বে হলেও, অকস্মাৎ দীর্ঘশ্রান্ত এবং রোগাক্রান্ত দেহযন্ত্র এবং কলাতন্তুগুলোর ওপর বড় বেশী নজর দিতে থাকি—তারাই তো বেতাল হয়ে দেহটার ছন্দপতন ঘটিয়েছে। কয়েক শতাব্দীর চেষ্টায় ডাক্তারী শাস্ত্রে আমরা বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছি। চিকিৎসা জ্ঞান সম্পদের কত কিছুই না আহরণ করে রেখেছি ডাক্তারী বইয়ের পাতায় পাতায়। অত্যন্ত কঠিন ব্যাধিকেও পরাভূত করার অস্ত্র এখন চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের হাতের মুঠোয়। অস্ত্রোপচারের ভেল্‌কি দিয়ে ভগ্নদেহকেও সোজা করা যায়, চোখ ধাঁধানো সেইসব কায়দা কৌশল গল্প উপন্যাসকেও হার মানায়, ভেষজ শিল্পের বিস্ময়কর ওষুধপত্র দুরন্ত আধিব্যাধিকেও শায়েস্তা করে। আমরা দেহ সম্বন্ধে অকস্মাৎ সচেতন হয়ে ঝুঁকে পড়ি বহু শতাব্দী সঞ্চিত ডাক্তারী হাতিয়ারগুলোর দিকে।

কিন্তু রোগ সারানোর চাইতে রোগ যাতে না হয়, সেই জ্ঞান কি আমাদের আছে? অনেকেরই নেই। এর চাইতে মহাবিদ্রূপ বোধ হয় আর নেই।

মানব প্রকৃতি বড় বিচিত্র। বিপর্যয়ের সম্মুখীন না হলে যেন সমস্যা নিয়ে গুরুত্ব সহকারে মস্তিষ্ক ঘর্মাক্ত করতে মন চায় না। ফল কি হয়েছে? অধিকাংশ বড় ধরনের আধিব্যাধি থেকে সুচারুভাবে নিরাময় হওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আপনারা বারবার বছর বছর ছোট খাট অজস্র রোগ জ্বালায় কষ্ট পাচ্ছেন—সংক্রমণ ফুলোফালা, বদহজম থেকে আরম্ভ করে পিঠের ব্যথা, মাথার ব্যথা কিছুই বাদ যাচ্ছে না। ওষুধের দোকানগুলোর সামনে দাঁড়ালেই দেখবেন মলম আর মিক্সচার, টনিক আর ট্যাবলেট, সিরাপ আর পাউডারের জন্য কি হুড়োহুড়ি আর লাইন লাগানোই না চলেছে দিবারাত্র। কেউ কি জানেন কি ভাবে ওষুধ পত্তরের দাস হয়ে পড়ছেন নিজেরা, স্বেচ্ছায়? জানেন কি ঠিক কি দেহযন্ত্রের বিকলতার দরুন ওষুধের দোকানে এত ছুটোছুটি, এত হয়রানি এবং খোলামকুচির মত অনর্থক পয়সা উড়োনো? এইটুকুই শুধু জানেন যে শরীর থাকলেই শরীর খারাপ হয়, মাথা থাকলেই মাথা ব্যথা করে—
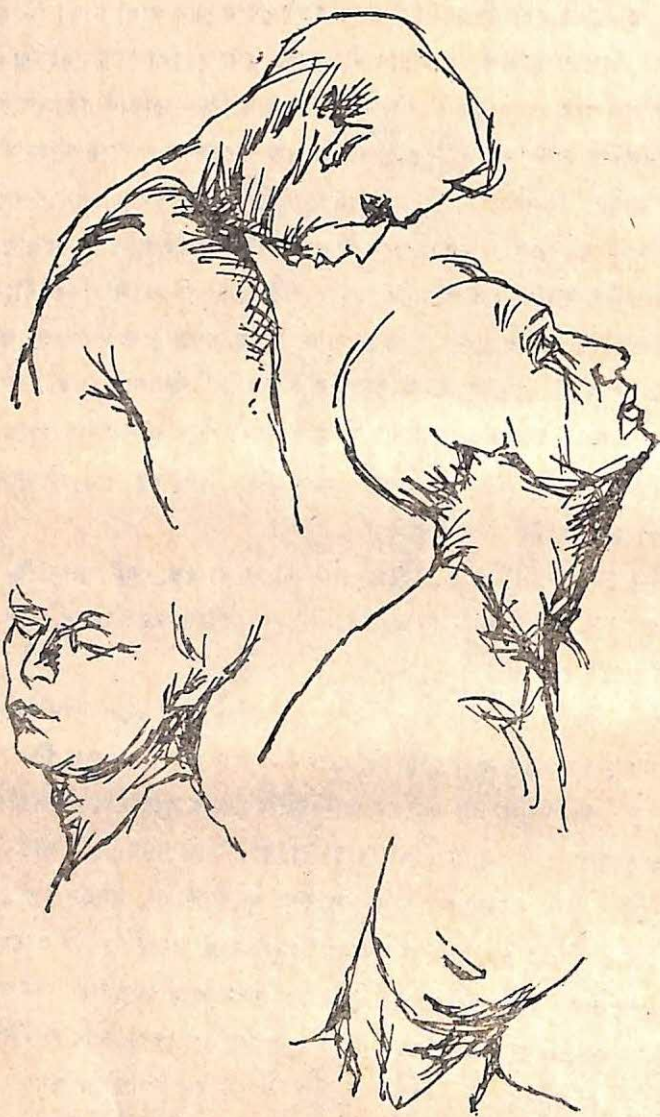
মাঝে মাঝে অমন সবারই হয় ; তাই তো টনিক-ট্যাবলেট-মলম-মিকশ্চারের এত ছড়াছড়ি !

এই কেতাব পাঠ সমাপন হলেই যে শরীর খারাপ আর হবে না, এমন কথা কিন্তু বলা হচ্ছে না। এর চাইতে ভেজাল সত্য আর হয় না। আমরা বাস করছি একটা ভেজাল ভর্তি দুনিয়ায়, একটা বৈরী জগতে। এখানে ডিজেল বাসের ধোঁয়া, কলকারখানার নোংরা, উনুন-চিমনির বিষ, ঝুল তেল এবং হাজার রকমে অনিষ্টকর কেমিক্যাল, তীক্ষ্ণ বস্তু, হাওয়া চলাচলহীন বদ্ধ পরিবেশ, বাসে ট্রামে ঘাড় গুঁজে মুরগী ঠাসা অবস্থার অস্বাস্থ্যকর অভিজ্ঞতা, এবং অজস্র স্বাস্থ্য বিপর্যয় আমাদের নিয়ত স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়ে চলেছে। এখানে হাওয়া দূষিত, খাবারে ভেজাল। আক্রমণ তো চতুর্দিক থেকে ; চলনে, বলনে, শয়নে, স্বপনে। কিন্তু নিজেদের দেহগুলোর কাজকর্ম সম্বন্ধে যদি ওয়াকিবহাল থাকি—আমাদের সবাই যতটা ওয়াকিবহাল, তার চাইতে যদি বেশী একটু থাকি—তাহলেই অধিকাংশ আক্রমণকে প্রতিরোধকরতে সক্ষম হবো। অবশ্য-নবলব্ধ জ্ঞান অনুসারে দেহযন্ত্রগুলোকে অধিকতর সমীহ করা দরকার—এখন যতটা করি, তার চাইতে বেশী। তাদের প্রতি অধিকতর সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে। তাদের খাটালে, তারাই প্রতিদানে অধিকতর উৎসাহে লক্ষ লক্ষ আণুবীক্ষণিক হানাদারদের রুখতে থাকবে—চর্মচক্ষে অদৃশ্য এই শত্রুরা কিন্তু নিরন্তর বেষ্টন করে রেখেছে আমাদের প্রত্যেককে।

একটা বিষয় কিন্তু মনে রাখা দরকার। ছোটখাট অসুখ বিসুখ আমাদের বাগে আনতে পারে না, দক্ষতার সঙ্গে তাদের প্রতিরোধ করে যাই আমরা। দেহযন্ত্রগুলোর কার্য পদ্ধতির ওপর নানান দিক দিয়ে অত্যাচার চালাই বলে তারা তাদের প্রতিশোধ ব্যবস্থা কমিয়ে আনে, আমরা তখন কুপোকাৎ হই। তাই যদি না হত, যদি ছোট খাট অসুখ বিসুখগুলোকে প্রতিরোধ করতে না পেরে তাদের কব্জায় চলে যেতাম, তাহলে এই যে ডাক্তার-নার্সরা নিয়ত আমাদের অসুখ বিসুখে উদয়াস্ত খেটে মরছেন, এঁরা চিরস্থায়ী অসুস্থতায় ভুগতেন। কিন্তু ঘটনা তা নয়। আমাদের অধিকাংশর চাইতেই বরং তারা বেশী সুস্থ। তাঁদের এই-অধিকতর ভাল স্বাস্থ্যর গুপ্ত রহস্য-বোধহয় তাঁরা তাদের দেহ-তন্ত্রের খবরটা বেশী রাখেন এবং দেহযন্ত্র
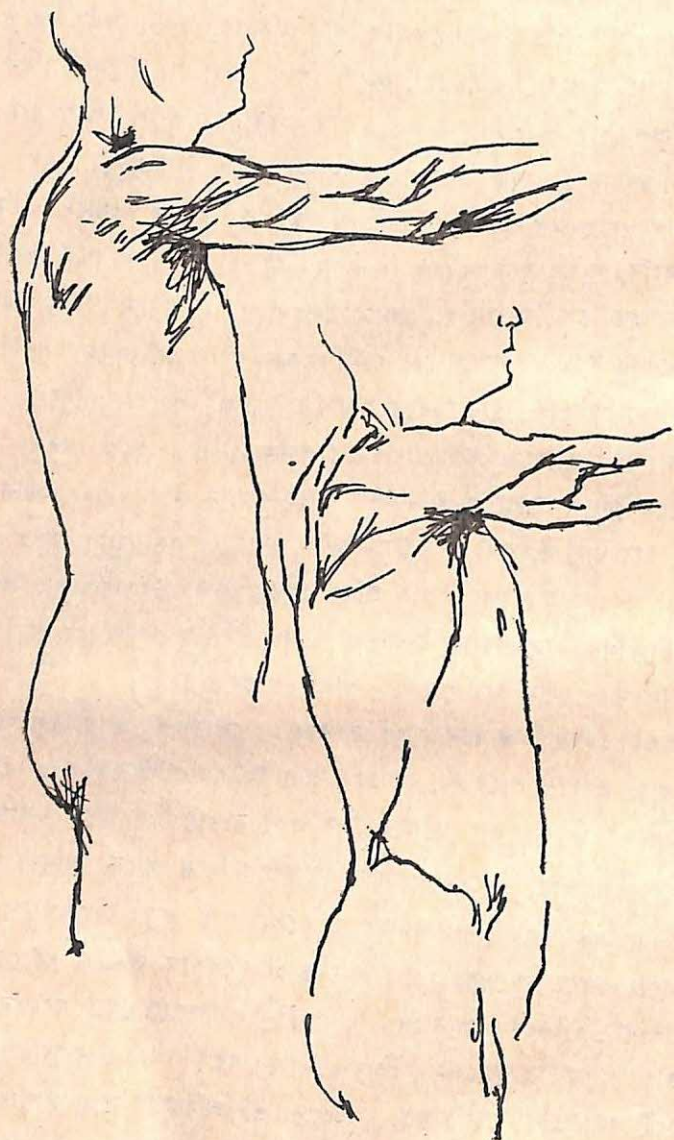
যাতে বেতাল না হয়, সেদিকে নজর বেশী দেন। ছন্দপতনও তাই ঘটে না।

তাই শুধু এই টুকুই বলা যাক, এই কেতাবটি উত্তমরূপে যদি পাঠ করেন এবং পাঠের পরিণাম স্বরূপ যদি নিজেদের দৈনন্দিন ক্ষতিকর-অভ্যেস টভ্যেস-গুলোকে একটু নিয়মের মধ্যে আনেন এবং পরিহার করতে পারেন তাহলেই আরও একটু বেশী দিন বাঁচবার এবং একটু বেশী শক্তিসহ জীবনধারণের সুযোগ পেয়ে যাবেন। ফুসফুসজোড়া কিসে সুস্থিরভাবে নিঃশ্বাস প্রঃশ্বাস নিয়ে ভাল থাকবে, কিসে পাকস্থলীটা খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে জীর্ণ করতে পারবে—এ সবগুলো আপনার জানা দরকার বৈকি।

জানার ইচ্ছে যে আপনাদের অনেকের মধ্যেই আছে, তা তো জানা কথা। নইলে এই ভূমিকা পড়তে বসেছেন কেন। কিন্তু এতাবৎকাল আপনারা জ্ঞান আহরণের নিমিত্ত মোটা মোটা ডাক্তারী বইয়ের পাতার পর পাতা উল্টে গেছেন, শেষকালে নাজেহাল হয়েছেন। বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন—খটমট ডাক্তারী ভাষার মাথামুণ্ড বুঝতে পারেননি। কেউ কেউ ঠাকুমা দিদিমা মা দিদির কাছে ঝাড়ফুঁক টোটকা মাদুলির গল্প শুনেছেন এবং দেহের গঠন সম্বন্ধে নানা উদ্ভট ধারণা করে বসে আছেন। নরদেহের শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার চাইতে সর্বনাশা আর কিছু নেই। আরও এক ধরনের ভুলের বোঝা আপনাদের অনেকে বয়ে মরে। প্যাথলজির কোনো পাঠ্যপুস্তক হাতের কাছে পেয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে ভাবেন বুঝি বেরি বেরি থেকে গলগণ্ড পর্যন্ত সব রোগই আপনাকে আশ্রয় করেছে অথবা করতে আসছে।

আপনি যদি ডাক্তার বা নার্স না হন, ডাক্তারী বইতে যা লিখেছে, ভুলে মেরে দিন; ঠাকুমা দিদিমার কাছে শোনা গল্পগুলোকেই আর মনে করার চেষ্টা করবেন না। আধুনিক পপুলার সিরিজের বই পড়ুন—এই বইয়ের মত। কারণ, এই ধরনের বইতেই থাকে দেহের মূল ধর্মের সরল বর্ণনা, বাগাড়ম্বরের ধার দিয়েও না গিয়ে সোজাসুজি উপস্থাপিত করে মূল বক্তব্য এবং বিজ্ঞানের কচকচি দিয়ে আপনার চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করে না। প্রত্যেকটা দেহযন্ত্র কাজ করছে কি করে, সে তত্ত্ব জানবার সঙ্গে সঙ্গে জেনে নিন দেহযন্ত্রগুলোকে নিখুঁত ভাবে চালু রাখতে হলে তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য কি। এই জ্ঞানকে জমিয়ে রাখুন মনের পেছনে এবং দরকায় পড়লেই জ্ঞান-ভাণ্ডারের তাক থেকে তথ্যটা নামিয়ে এনে কাজে লাগান—নিজে সক্রিয় হোন। সব সময়ে যে এমনটা করতে পারবেন না, তা ঠিক; কিন্তু সুযোগ পেলেই
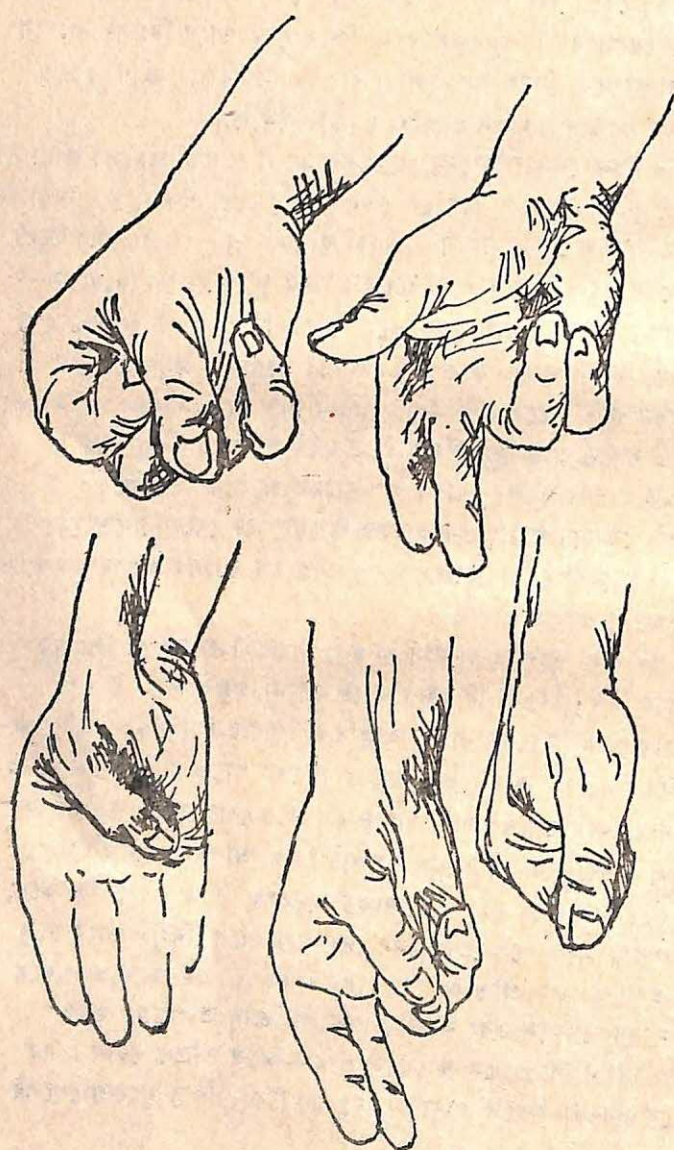
সঞ্চিত জ্ঞানের কথা মনে তো পড়বে। কি ভাবে তখন এই বইয়ের পাতা হাতড়ে প্রয়োজনীয় খবরটাকে টেনে বার করতে হবে—তা তো জানবেন। বইখানাকে তাই সদাই রাখুন চোখের সামনে—নাগালের মধ্যে।

এই প্রসঙ্গে ঝটিতি একটা সতর্কবাণী উচ্চারণ করা যাক। এই বইয়ের তথ্যাদি মনের পেছনে জমিয়ে রাখতে বলা হয়েছে কিন্তু—জিভের ডগায় নয়। অহরহ যদি এই জ্ঞান বর্ষণ করতে থাকেন বন্ধুবান্ধবদের কানের ওপর, তখন তো তাদের জীবন দুর্বিসহ হবেই, সেই সঙ্গে অবাঞ্ছিত অস্বস্তিতে ভুগতে পারেন নিজেও। এত কথা বলার পরেও বলব, জৈব স্থিতিস্থাপকতার দিক দিয়ে মানুষের দেহ একটা বিস্ময়। নরদেহের তুলনায় বৃহত্তম কমপিউটারও একটা নিছক খেলনা ছাড়া কিছু নয়। নিজের পূর্বাবস্থা নিজে থেকেই ফিরিয়ে আনার অবিশ্বাস্য ক্ষমতা আছে এই নরদেহের। শুধু দরকার আপনার দিক থেকে একটু সহায়তার, আর অত্যাচার অনিয়ম অবহেলার পরিবর্তে একটু যত্ন, একটু নিয়ম, একটু সহানুভূতির। এই ব্যাপারেই এই গ্রন্থ কাজে আসবে আপনার।

তর্কের খাতিরে বলতে পারেন, লক্ষ লক্ষ বছরের ক্রমবিবর্তনের পর নরদেহ আজকের এই উন্নত অবস্থায় পৌঁছেছে যখন—যা কিনা প্রাণী তত্ত্বের ইতিহাসে একটা অত্যাশ্চর্য কলকজার অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন বলা যায়—তখন বাইরের সাহায্য ছাড়াই এ হেন কলকজা আপনা থেকেই চলতে পারবে আপন ছন্দে—এই বইয়ের পাতা থেকে সাহায্য গ্রহণের দরকার তো হবেই না। কিন্তু এ হেন জোরালো ধারণার একটা মূল ভ্রান্তি থেকে যাচ্ছে। কেন না, যে পরিবেশে আমাদের বিবর্তন শুরু হয়েছিল, সে পরিবেশে এখন আর আমরা বাস করছি না। গত কয়েক'শ বছরের শিল্প বিপ্লব এবং জন-বিস্ফোরণের পর আমরা পেল্লায় ইমারত ঠাসা শহরগুলোর মাথা ঠোকাঠুকি করতে করতে এমন অবস্থায় পৌঁছেছি যে, চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িয়েই চলেছি চোখ, কান, নাক, ফুসফুস, হার্ট, কিডনি এবং অন্যান্য দেহ-যন্ত্রের কাছে। এত চাহিদা তাদের কাছে কখনোই ছিল না আমাদের। এই বাড়তি চাহিদার মোকাবিলা করার জন্যেই আমাদের দরকার একটু বাড়তি জ্ঞান আর বাড়তি যত্নের।

মোদ্দা কথা হল অজ্ঞতা, বিজ্ঞতা এবং অবহেলা—এই তিনটের মধ্যে একটু ভারসাম্য দরকার। প্রত্যেকটা দেহযন্ত্রের সহজ, সরল, খোলাখুলি আত্মকাহিনী শোনার পর তাদের আপনি সমীহ করবেনই। ওদের জটিল কাজ কর্ম যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, সে ব্যাপারও সহায় হবেন। বিনিময়ে তারা আপনার সেবা করে যাবে বছর বছর। □

১
মূল একক

কোষ

আমি যেন একটা পেল্লায় শহর। আমার মধ্যেই তড়িৎ উৎপাদনের পাওয়ার স্টেশন, মাল বয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিবহন ব্যবস্থা আর যোগাযোগ চালিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত অত্যাধুনিক অতিসূক্ষ্ম সব রকম ব্যবস্থাই আছে। কাঁচামাল আমদানী করি আমি, উৎপাদন করি অনেক জিনিস, জঞ্জাল পাচার করার ঝটপট ব্যবস্থাও চালু রাখি নিজের মধ্যে। খুব দক্ষ গভর্ণমেন্টকে দিয়ে এত কাজ করাই আমি—আসলে এ সরকারকে ডিকটেটর বললেই চলে—কড়া একনায়কতন্ত্র পছন্দ করি—করতেই হয়—অবাঞ্ছিতদের দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে সমানে টহল দিতে হয় শহরের মধ্যে।

এই যে এলাহি কাণ্ড কারখানা চলছে, তা কতটুকু সাইজের মধ্যে কল্পনা করতে পারেন? মাইক্রোসকোপ দিয়ে দেখতে হয় মশায় আমাকে। আর যদি আমার ভেতরকার পেল্লায় শহরটাকে দেখতে চান তো নিয়ে আসুন সুপার মাইক্রোসকোপ—মামুলি অণুবীক্ষণও ফেল করবে—দেখতেই পাবে না আমার শহরকে। কি বুঝলেন!

আজ্ঞে হাঁ। আমি একটা নগণ্য কোষ। উপেনের এই দেহটার মধ্যে ৬০ মহাপদ্ম কোষ আছে—আমি তাদেরই একজন। মহাপদ্ম কি তাও বুঝলেন না? ইংরেজিতে বললে বুঝবেন? বিলিয়ন—এক মহাপদ্ম মানে এক বিলিয়ন অর্থাৎ ১,০০০,০০০,০০০,০০০। সংক্ষেপে, একের পিঠে বারোটা শূন্য চাপালে যা হয়—তাই। এ হিসেব হল ইংরেজ আর জার্মান মতে।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই। ৬০,০০০,০০০,০০০,০০০ কোষ নিয়ে উপেনের যে দেহ গড়ে উঠেছে (ঠিক যেন ৬০,০০০,০০০,০০০,০০০ ইঁট দিয়ে তৈরী একটা ইমারত) আমি তাদেরই একজন। এই জন্যেই হামেশাই শুনবেন কোষকে বলা হয় প্রাণের মূল উপাদান। আরও সাদা এবং সাচ্চাভাবে বলতে গেলে, প্রাণ তো আমরা নিজেরাই। উপেনের ডান চোখের রড কোষ হিসেবে আমি এখন শোনাবো আপনাদের বিচিত্র এক উপাখ্যান—বিরাট এই জনসংখ্যার প্রতিভূ হিসেবে শোনাবো সেই কাহিনী। শুনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাবেন—গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি।

প্রতিরূপ বা আদর্শস্বরূপ 'টিপিক্যাল' কোষ বলে কোনো কোষ কিন্তু নেই। একটা জিরাফ আর একটা ইঁদুরের চেহারা আর কাজকর্মে যেমন আশমান জমিন ফারাক, ঠিক তেমনি ফারাক রয়েছে আমাদের মহাপদ্ম কোষেদের মধ্যেও। হরেক রকম আয়তন আমাদের, সবচেয়ে বড় আয়তনটা হল অস্ট্রিচ পাখীর ডিমের মত পেল্লায়। এটাই হল বৃহত্তম। ওর থেকে ছোট হতে হতে আমরা এত ছোট আয়তনেও পৌঁছেছি যে একটা আলপিনের ডগায় আমাদের ক্ষুদ্রতম কোষদের দশলক্ষ জনকে অনায়াসেই বসিয়ে রাখতে পারেন। ভাবতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি? হবেই তো। নিজের শরীরটা যাদের দিয়ে তৈরী তাদের কথা কোনোদিনও যে ভাবেন নি।

আর হাঁ, আমরা শুধু আয়তনেই হরেকরকম নই—আকারেও বটে, আমাদের কেউ রডের মত—যেমন আমি নিজে; কেউ চ্যাপ্টা চাকতির মত; আবার কেউ গোল বলের মত। তা সত্ত্বেও কিন্তু আমরা সবাই কোষ—একই দেহের কোষ।

উপেন যাই করুক না কেন, তার সব কিছুতেই অংশ নিই আমরা। ধরুন, উপেন একটা ব্যাগ টেনে তুলল। ভাবল বুঝি হাতটাই তুলল ব্যাগকে, আসলে কাজটা কিন্তু করল তার পেশীর কোষ। নিজেরা সংকুচিত হয়ে

টেনে তুলল ভারী ব্যাগকে। উপেন যখন শ্বশুর বাড়ী গিয়ে পঞ্চব্যঞ্জন নিয়ে খেতে বসে, ভাবতে থাকে আগে মাছের মুড়ো খাব, না, শুক্তো খাব—তখন কিন্তু এই ভাবনার কাজটাও করছে ওর ব্রেনের কোষগুলো। অথবা ধরুন দাড়ি কামাতে বসল, তখনও কিন্তু স্নায়ু আর পেশীর কোষেরাই মিলে-মিশে তুলে দিল কাজটা। গালের যে চুলগুলো কাটল উপেন, সেগুলোকেও কিন্তু উৎপাদন করেছিল অন্য কোষেরা। আকাট উপেন ভেবে গেল বুঝি সবটাই নিজের বাহাদুরি। মূর্খ আর কাকে বলে!

চোখের মধ্যে রড কোষ হিসেবে আমার কাজ কিন্তু সামান্য নয়। ক্ষীণতম আলোও যদি কোথাও দেখা যায়—ধরুন, তারার চিকিমিকি—তক্ষুনি তাকে পাকড়াও করি, বাড়িয়ে নিয়ে এবং একটা সংকেতে পরিণত করে উপেনের মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দিই। এই রকম সংকেত বা সিগন্যাল যদি বেশ কিছু পৌঁছোয় মগজে, তাহলেই তারাটাকে 'দেখতে' পায় উপেন। উপেনের চোখে আমরা, এই রড কোষেরা, সংখ্যায় ২৫ কোটি; এই ২৫ কোটির মধ্যে রয়েচে আলো পাকড়াও করার রঞ্জক দ্রব্য সমন্বিত তিনকোটি অণু—কতখানি শক্তি আমরা ব্যয় করছি, অনায়াসেই এখন অনুমান করতে পারবেন। শক্তি সৃষ্টি করার জন্যে আমাদের আছে কয়েক হাজার মাইটোকনড্রিয়া—সসেজ আকারের অতি ক্ষুদে পাওয়ার স্টেশন, যেখানে জ্বালানি (শর্করা) পুড়িয়ে এনার্জি উৎপাদন করে ফেলে দিই 'ছাই' (জল আর কার্বনডায়অক্সাইড)। অত্যন্ত জটিল এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট (সংক্ষেপে ATP) নামে একটা বস্তুর সংযোগসাধন ঘটায় এরা। রেউচিনি গাছ থেকে মানুষ পর্যন্ত এই দুনিয়ার সব কিছু সজীব বস্তুর সার্বজনীন শক্তির উৎস হল এই জিনিসটাই।

যখনি এনার্জির দরকার হয়—যখনি হৃদ্‌যন্ত্রকে স্পন্দিত হতে হয়, নিঃশ্বেস নিতে গিয়ে বুকের খাঁচাকে ফুলে উঠতে হয়, চোখের পাতা ফেলতে হয়—ATP ভেঙে গিয়ে সহজতর উপাদান হয়ে যায়—শক্তিকে ছাড়তে থাকে নিজে ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। কাজেই দেখুন, উপেন যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন এই এনার্জির আর ATPর চাহিদাও থেকে যাবে। এমন কি গভীর ভাবে ঘুমন্ত অবস্থাতেও তৎপরতা থেকে যায় প্রপাতের মতই—স্বপ্ন দেখার জন্যে মস্তিষ্কের কোষকে এনার্জি যোগাতে হয়, রক্ত প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্যে হৃদযন্ত্রের কোষকে স্পন্দিত হতে হয়। ATPর এই ভাঙা এবং

কোষ

গড়া তাই বিরামবিহীন।

মাইটোকনড্রিয়া আছে আমাদের সব কোষের মধ্যেই—উল্লেখ যোগ্য ব্যতিক্রম রয়েছে শুধু এক জায়গায়। লাল রক্ত কণিকায় এরা থাকে না। কেন থাকে না? কারণ লাল রক্ত কণিকারা তো কিছুই উৎপাদন করছে না। রক্ত প্রবাহে গা ভাসিয়ে শুধু ভেসেই যায়—শক্তির কোনো দরকার হয় না।

কোষদের মধ্যে চূড়ান্ত বিস্ময় সম্ভবতঃ নারীদেহের ডিম্বাণু বা স্ত্রী-প্রজনন কোষ—উপেনের মায়ের দেহে যা ছিল। প্রায় .০১ ইঞ্চি ব্যাসার্ধ-বিশিষ্ট ডিম্বাকার এই জীবন কণার সঙ্গে গর্ভাশয়ের ভেতরে পুং-প্রজনন কোষের মিলন ঘটলেই একটা ডিম্বকোষ ভেঙে গিয়ে দুটো হয়ে যায়। দুটোর প্রত্যেকটা আবার ভাঙতে থাকে একই হারে। এই ভাবে ভেঙে যাওয়া প্রত্যেকটা কোষ ভেঙে দুটো হতে হতে গিয়ে দাঁড়ায় দুই মহাপদ্ম (বিলিয়ন) কোষে—একটা শিশুদেহ গড়ে ওঠে এই কোষে। বিস্ময়কর এই ভেঙে-গিয়ে-বহু-গুণে-বেড়ে-ওঠার মধ্যে সবচেয়ে বড় বিস্ময় হল পুং-প্রজনন কোষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর স্ত্রী-প্রজনন কোষের মধ্যে যে পরিমাণ তথ্য সঞ্চিত হয়, তা সত্যিই একটা এলাহি ব্যাপার। কাঁড়ি কাঁড়ি খবরে ঠাসা হয়ে যায় এতটুকু কোষ। পুঁচকে ঐ জীবন কণার মধ্যে থাকে লিভার নামক সবচেয়ে জটিল রাসায়নিক যন্ত্রের নক্সা। চুলের রঙ, চামড়ার চেহারা, দেহের আকার—সবকিছুর সাংকেতিক হিসেব সঞ্চিত থাকে ওর মধ্যে। কড়ে আঙুলের বৃদ্ধি ঠিক কখন বন্ধ করতে হবে, সে খবরও জমা হয়ে যায় ঐটুকু জীবন কণার মধ্যে। এর চেয়ে বড় বিস্ময় আর আছে কি?

প্রশ্ন এখন একটাই। এই যে ছোট্ট ডিম যার সাইজ স্তন্যপায়ী অর্থাৎ ম্যামালদের মধ্যে প্রায় একই—জানছে কি করে যে কোন ডিম থেকে হবে তিমি, কোনটা থেকে খরগোস, অথবা উপেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেই আসতে হচ্ছে ডি-এন-এ প্রসঙ্গে।

বিস্ময়কর এই ডি-এন-এ উপাদানটার পুরো নামটা মনে রাখুন—ডিঅক্সি-রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড। ভুলবেন না দয়া করে। ডি-এন-এ'র অলৌকিক ক্ষমতা আজকের বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় বিস্ময়। সংখ্যায় কোটি কোটি আমরা এই কোষেরা তার হুকুমে চলি। সে বলে দেয় আমাদের কোষ মধ্যস্থ উপাদানদের ঠিক কি রকম ব্যবহার করতে হবে, কিভাবে চলতে হবে, কি জিনিস উৎপাদন করতে হবে, কি বস্তু খুঁজে পেতে বার করতে হবে এবং কি-

কোষ
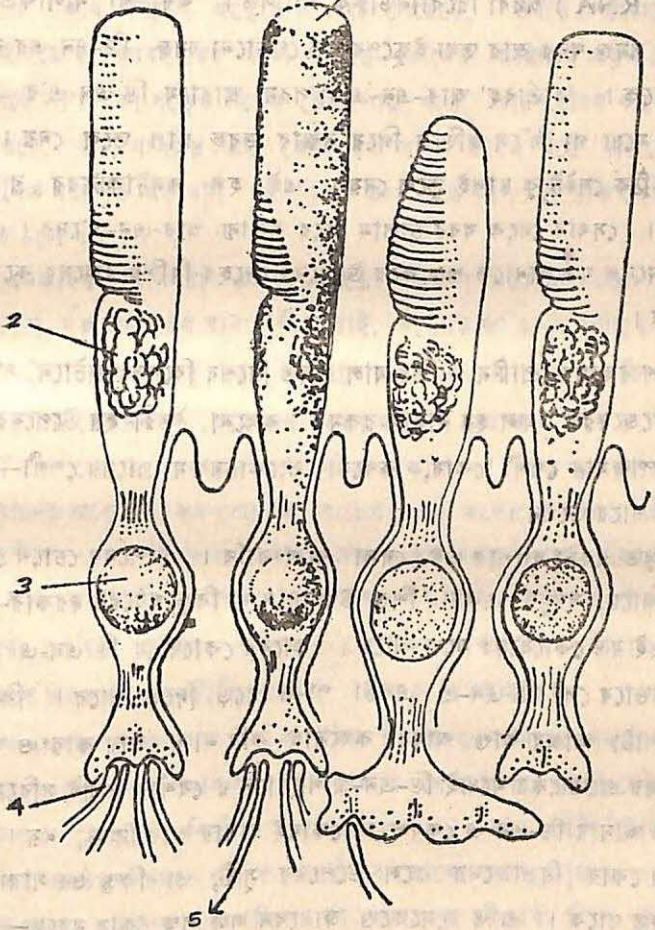
১। চোখের বড় কোষ; ২। মাইটোকনড্রিয়া; ৩। নিউক্লিয়াস;
৪। সাইনাপ্‌স্ (দুটি স্নায়ুকোষের সংযোগস্থল) ৫। মস্তিষ্ক অভিমুখে।

কি এড়িয়ে যেতে হবে।

আমার ডি-এন-এ (DNA) কে মস্ত এক স্থপতির সঙ্গে তুলনা করা চলে। বেঁচে থাকতে গেলে চমকপ্রদ যে নক্সার দরকার—সে নক্সা এই ডি-এন-এ বানায়। কিন্তু বড় স্থপতির মতই নিজের হাতে বাড়ী বানায় না—বানানোর কাজ ছেড়ে দেয় কনট্রাকটারের হাতে—এ ক্ষেত্রে যাদের নাম আর-এন এ (RNA) অথবা রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড। অণু বা মলিকিউলের আকারে সমস্ত খবর আর তথ্য ইস্কুপের মত পেঁচানো যমজ ডি-এন-এর মধ্যে ছাপা থাকে। 'বার্তাবহ' আর-এন-এ'রা পরম আরামে ডি-এন-এ'র যমজ প্যাঁচের মধ্যে গা ঘেঁসে জড়িয়ে গিয়ে নক্সার হুবহু ছাপ তুলে নেয়। যা দরকার ঠিক সেইটুকু ছাপই তুলে নেয়। এই হল কনট্রাকটরের ব্লুপ্রিন্ট নেওয়া। সেখান থেকে খবর চালান করে অন্যান্য আর-এন-এ'দের। এরাই তখন নির্দেশ মত বানাতে শুরু করে উপেনের দেহের বিভিন্ন রকমের কয়েক'শ প্রোটিন।

বিশ রকমের প্রোটিন পুঁতির মালার মত বিশেষ বিশেষ প্যাটার্নে সাজিয়ে নেয় নিজেদের। ফল হয় নানান রকম। কখনো তৈরী হয় উপেনের হৃদ-যন্ত্রের স্পন্দমান পেশী কোষ, কখনো সংকোচনক্ষম পায়ের পেশী—যাতে হাঁটতে পারে উপেন।

অদ্ভুত একটা ব্যাপার এই বেলা বলে রাখি। উপেনের চোখে যে রড কোষ আছে, সম্পূর্ণ একটা শিশু উৎপাদনে যা কিছু খবরের দরকার—তার সবই এই রড কোষেদের মধ্যে আছে। কানের কোষে যে ডি-এন-এ আছে, তত্ত্বগতভাবে সেই ডি-এন-এ একটা পা-ও গড়ে দিতে পারে। কিন্তু এই উল্টোপাটা আজব কাণ্ড আমরা কখনোই করি না। তার কারণও আছে। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ডি-এন-এ প্যাটার্নের বেশীর ভাগই সরিয়ে রাখা হয়। আমার ডি-এন-এ কেবল রড কোষই বানায় আর কিচ্ছু নয়।

যে কোষ বিভাজনের ফলে উপেনের সৃষ্টি, তা কিন্তু ওর সারা জীবন অব্যাহত থাকে। প্রতি সেকেণ্ডে জানবেন লক্ষ লক্ষ কোষ মরছে—আবার লক্ষ লক্ষ কোষ জন্মাচ্ছে। যে কোষগুলো আছে, তারাই ভেঙে দুটো হচ্ছে—হুবহু একই রকমের দুটো—যা থেকে দু'ভাগ হল—ঠিক সেই রকমই। তাদের প্রত্যেকে আবার দু'ভাগ হচ্ছে। চলছে এই ভাবে—বিরাম নেই—মৃত্যু যতক্ষণ না হচ্ছে। এদের মধ্যে চর্বিকোষরা নিজেদের নকল বানায়

ধীর গতিতে। এরা তো শুধু ভাঁড়ার কোষ বললেই চলে। কিন্তু চামড়ার কোষরা নকল বানাচ্ছে—দশ ঘন্টা অন্তর। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হল মস্তিষ্কের কোষ। অন্য সব কোষ মরছে—তাদের জায়গা দখল করছো নতুন কোষ। কিন্তু ব্রেনের কোষ একবার মরলে আর সে জায়গায় নতুন কোষ আসছে না। উপেন তার জন্ম মুহূর্তে সারা জীবনের উপযুক্ত মস্তিষ্ক কোষ নিয়েই জন্মেছে। যা পেয়েছে, তখনি পেয়েছে। যারা জখম হয়ে বা ব্যবহারের ফলে মরছে—তাদের জায়গায় নতুন কেউ আর আসছে না। তা সত্ত্বেও উপেন টের পায় না। কারণ প্রথম বারেই যা সে পেয়েছে, তা সংখ্যায় এত বেশী যে সারা জীবন ধরে মস্তিষ্কের কোষ নিয়মিত মরলেও অভাবটা চট করে ধরা পড়ে না। বাড়তি কোষ দিয়েই কাজ চলে যায়।

এনজাইম জিনিসটা এই দেহযন্ত্রের একটা অত্যাশ্চর্য বস্তু। আমরা, কোষেরা, যত এনজাইম বানাই নিজেরাই, সংখ্যায় তা ৬০০ পর্যন্ত। অত্যাশ্চর্য এই কেমিস্টরা (এনজাইমরা) আর-এন-এ'র মাধ্যমে ডি-এন-এ'র হুকুম পেয়ে প্রোটিন সংশ্লেষের গতিবেগ বাড়িয়ে দেয় হু-হু করে। উপেনের বুড়ো আঙুলের নখের জন্যে যে প্রোটিন দরকার, তা থেকে শুরু করে অসংখ্য হরমোনের জন্যে সবরকম প্রোটিন সংশ্লেষ হু-হু করে বেড়ে ওঠে এই মাস্টার কেমিস্টদের কেরামতিতে। রসায়ন-গুরু এহেন এনজাইমদের টেক্কা মারবার মত মানব-রসায়নবিদ আজও পৃথিবীতে জন্মায়নি—ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা নিয়ে যে-সব কেমিস্ট তাঁদের প্রতিভার ভেলকি দেখিয়েছেন—তাঁরাও স্তম্ভিত হয়েছেন এনজাইমদের কীর্তি দেখে। মহাগুরু নিঃসন্দেহে!

আমাদের ভেতরকার জটিল গঠন বৃত্তান্ত শুনে নিশ্চয় অবাক হচ্ছেন। আরও অবাক হবেন আমাদের বাইরেকার দেওয়ালের গঠন কৌশল যদি শোনেন। আমার ঝিল্লী আবরণ মাত্র .০০০০০০১ মিলিমিটার পুরু। এইরকম একটা পাতলা পর্দার আদৌ যে কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে, এই সেদিন পর্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিক তা ভাবতেও পারেন নি। তাঁরা মনে করেছিলেন এক রকমের পাতলা সেলোফেন থলির মতই এই ঝিল্লী আবরণ। কিন্তু তাঁদের চোখ খুলে দিয়েছে ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ। অতিশয় পাতলা এই ঝিল্লী যে আমাদের এই কোষদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তা তাঁরা এখন জানতে পেরেছেন। সাধু ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ!

কোষ

আমার মধ্যে দিয়ে বিশ্বের বৈজ্ঞানিকরা এখন দেখতে পান ঝিল্লী আবরণের অত্যাশ্চর্য ক্রিয়াকলাপ। দ্বাররক্ষকের মতই এই ঝিল্লী ঠিক করে নেয় কাকে ঢুকতে দেবে কোষের মধ্যে, আর কাকে রাখবে বাইরে। কোষের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্বও এই ঝিল্লী আবরণের। লবণ, জৈব বস্তুসমূহ, জল আর অন্যান্য উপাদানের ভারসাম্য বজায় রাখে—কমবেশী হওয়া কড়া হাতে দমন করে। জীবন জিনিসটা পুরোপুরিই নির্ভর করছে এই ঝিল্লী আবরণের ওপর। প্রোটিন উৎপাদনের জন্য যখন কাঁচামালের দরকার হয়, ঠিক কাজের জিনিসটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে অকাজের জিনিসটাকে বাইরে আটকে রাখে এই ঝিল্লী আবরণ। এ রকম চুলচেরা বিচার আর সূক্ষ্মভাবে উপাদান চিনে নেওয়ার ক্ষমতা ক'জনের আছে বলতে পারেন?

আমাদের প্রত্যেকের গায়ে সনাক্তকরণের লেবেলও সাঁটা থাকে—অন্যান্য ঝিল্লী আবরণেরা দেখলেই চিনতে পারে। আমাদের নিজস্ব উপনিবেশে বিদেশী বা আগন্তুক কোষ এলেই তাড়িয়ে দিই দূর-দূর করে। নইলে কি কাণ্ডটা ঘটত জানেন? যদি আগন্তুক কোষ বা বিদেশী কোষদের খেদিয়ে না দিয়ে জামাই আদর করে ঘরে তুলতাম—তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াতো আবোলতাবোলের উদ্ভট ব্যাপার। খামখেয়ালের রাজত্ব শুরু হয়ে যেতো উপেনের সর্বাঙ্গে। ধরুন, চুলের কোষ ঢুকেছে আমার এলাকায়—কিছুদিন বাদেই দেখতেন চুল গজাচ্ছে উপেনের চোখে। এইভাবে দেখতেন কিডনীতে গজাচ্ছে আঁচিল, চোখের পাতায় লিভারের কোষ।

অদ্ভুত কর্মা এই ঝিল্লী আবরণের আরও একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। অলৌকিক ক্ষমতা কিনা ঈশ্বর জানেন। অন্যান্য কোষেদের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা রাখতে পারে—কি করে যে রাখে তা কিন্তু জানি না। হৃদযন্ত্র খুলে নিয়ে কোষগুলো যদি আলাদা করে রাখেন, দেখতে পাবেন কোষগুলো এলোপাতাড়ি ধুকপুক করে চলেছে। কিন্তু তা কিছুক্ষণের জন্যে। একটু পরেই আবার একই ছন্দে একই তালে দেখবেন সব কটা কোষ ধুকপুক করছে, স্পন্দিত হচ্ছে—আলাদা আলাদা অবস্থাতেও। কিভাবে জানি না, খবর ঠিক চলে যায়।

যোগাযোগের এই আশ্চর্য ব্যবস্থায় অংশ নেয় হরমোনেরাও রাসায়নিক বার্তাবহ হিসেবে। যেমন ধরুন: উপেনের রক্তের শর্করা বাড়ছে। তৎক্ষণাৎ ওর প্যানক্রিয়াস বাড়িয়ে দেয় ইনসুলিন উৎপাদন; হুকুমটা চালায়

এইভাবে--'শর্করা (চিনি) পোড়াও বেশী করে।' রক্ত প্রবাহ ঝটিতি হুকুমটা ছড়িয়ে দেয় সারা দেহে ; সাড়া দেয় সমস্ত কোষ।

আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হল ভাইরাস। পরভোজী বিষম উৎপাত এই ভাইরাসদের নিজস্ব কোনো মাইটোকনড্রিয়া নেই—বেঁচে থাকতে গেলে যে শক্তির দরকার, এরা নিজেরা তা বানিয়ে নিতে পারে না এই কারণেই। মাঝে মাঝে এদের আক্রমণ ঠেকাতে না পেরে অকা পায় আমাদের ঝিল্লী আবরণের অভিভাবকরা—সুরুৎ করে ভেতরে ঢুকে পড়ে একটা ভাইরাস—দেওয়াল ফুটো করে। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে যায় মহা ভোজ। শক্তির ভাঁড়ারে বসে বংশ বাড়াতে আরম্ভ করে দেয় এই আগন্তুক আতংকেরা। হু হু করে সংখ্যায় বেড়ে যাওয়ায় কোষ বেচারীও খতম হয়ে যায় একসময়ে। ভাইরাসের দল হৈ-হৈ করে চড়াও হয় অন্যান্য কোষেদের ওপর। খুব সামান্য ভাইরাস আক্রমণেও মারা যায় লক্ষ লক্ষ কোষ। কিন্তু এ শরীরে এতরকম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আছে যে বেশী সুবিধে করতে পারে না আগন্তুক আতংকরা—যদি না থাকত উপেনকে বেশীদিন টিঁকে থাকতে হত না এই বৈরী দুনিয়ায়।

কোষদের কাহিনী সংক্ষেপে এই : উপেনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব কিছুর মধ্যেই আমরা আছি। সর্বঘটে কাঁঠালি কলা বলতে পারেন। আমরা এই ৬০ মহাপদ্ম (বিলিয়ন) কোষ কিভাবে যে এইভাবে মিলে মিশে ভারসাম্য বজায় রেখে যে-যার নির্দিষ্ট কাজ করে চলেছি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সুচারু-ভাবে, অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে, তা ভাবতে গেলেও মাথা ঘুরে যায়। তাই বল-ছিলাম, এর চেয়ে চরম বিস্ময় আর নেই—পরম বিস্ময়ও বলতে পারেন !

কোষ

২
কেন্দ্রীয় স্নায়ু তন্ত্র

মস্তিষ্ক

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিস্ময়ের শেষ নেই। কিন্তু আমার সঙ্গে যদি তুলনা করেন, তাহলে দেখবেন আমিই সবচেয়ে বড় বিস্ময়—সব বিস্ময়কে ম্লান করে দেওয়ার পক্ষে একা আমিই যথেষ্ট। আমার ওজন মোটে তিন পাউণ্ড। (১.৪৬ কিলোগ্রাম)। জিলেটিনের মত দেখতে ধূসর আর সাদা টিশুর একটা ব্যাঙের ছাতা যেন। আমার মাধ্যমে অযুত কর্মকাণ্ড চলছে, তার নকল হওয়ার মত কমপিউটর মানে, যন্ত্র-মস্তিষ্কও আজ পর্যন্ত বেরোয়নি। যাদের নিয়ে আমি গড়ে উঠেছি, সেই অংশগুলির সংখ্যাও আপনাকে স্তম্ভিত করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট : নিউরোন (স্নায়ুকোষ) আছে তিন হাজার কোটি, আর তার পাঁচ থেকে দশগুণ হল গ্লাইয়ার কোষ। এতগুলো জিনিস ঠাসা রয়েছে যে আধারটির মধ্যে তা ঢেকে দেওয়া যায় সামান্য একটা টুপি দিয়ে। বুঝতেই পারছেন আমি কে। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই উপেনের মস্তিষ্ক।

মস্তিষ্ক
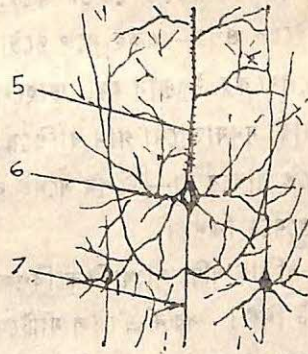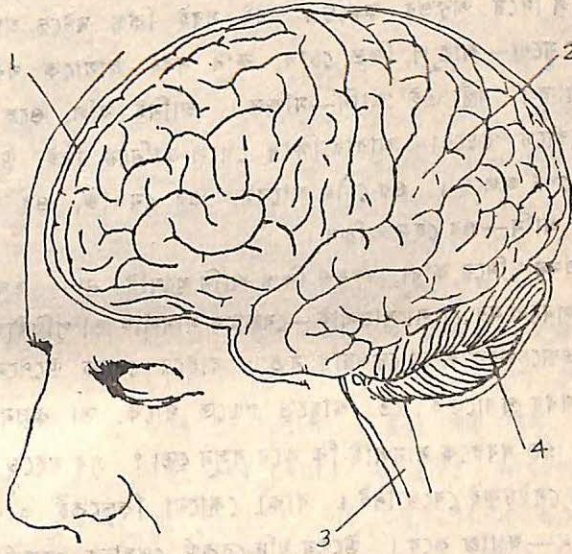
১। সেরিব্রাম অথবা গুরুমস্তিক (ডান গোলার্ধ) ; ২। সেরিব্রাম (বাম গোলার্ধ) ; ৩। স্পাইনাল কর্ড বা সুষুম্নাকাণ্ড , ৪। সেরিবেলাম বা লঘু মস্তিষ্ক ; ৫। ডেনড্রাইট্‌স্ (যার মধ্যে দিয়ে স্নায়ুকোষে খবর যাচ্ছে) ৬। কোষ দেহ , ৭। অ্যাক্সন (যার মধ্যে দিয়ে স্নায়ুকোষের খবর বাইরে যাচ্ছে) ;

কিন্তু যদি বলেন আমি উপেনের একটা অংশ ছাড়া আর কিস্সু নই, তাহলে কিন্তু মারাত্মক ভুল করবেন। অহংকার করেই বলছি—আমিই উপেন। আমি তার ব্যক্তিত্ব, তার সমস্ত প্রতিক্রিয়া, তার মানসিক ক্ষমতা। উপেন মনে করে কান দিয়ে সে শুনছে, চোখ দিয়ে দেখছে, জিভ দিয়ে চাখছে, আঙুল দিয়ে অনুভব করছে। এই সবই কিন্তু ঘটছে আমার এই দেড় কিলোর মধ্যে—আঙুল, জিভ, চোখ, কান সবই আমাকে খবর এনে দেওয়ার যন্ত্রমাত্র। যন্ত্রী এই আমি—মস্তিষ্ক। আমিই বলি, ওহে উপেন, এবার তুমি রোগে পড়েছো ; আবার ক্ষিদে পেলে জানিয়ে দিই, উপেন হে, খেয়ে নাও, পেট জ্বলছে। ওর যৌন আবেগ, ওর মেজাজ, ওর সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করি আমি—ওর হেড অফিস।

উপেন যখন ঘুমিয়ে কাদা, তখনও কিন্তু আমি ঘুমোই না। তখন আমি খবরাখবর লেনদেনের ঠ্যালা সামলাই—যেভাবে সামলাই তা পৃথিবীর সবকটা টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে লজ্জা দেওয়ার মত। বাইরে থেকে উপেনের ওপর যে পরিমাণ খবর প্রপাতের মত আছড়ে পড়তে থাকে, তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। এত খবরকে সামলাই কি করে বলুন তো? খুব সহজে। যেটুকু দরকার, ঠিক সেইটুকুই বেছে নিই। বাকী কোনো কিছুকেই আর আমল দেয় না উপেন—অগ্রাহ্য করে। উপেন যদি রেকর্ড প্লেয়ারে রেকর্ড চাপিয়ে দিয়ে একই সময়ে বই পড়তে চেষ্টা করে, তাহলে মনঃসংযোগ ঘটবে হয় রেকর্ড, নয় বইয়ের ওপর—একই সঙ্গে দুটোর ওপর নয়। বইটা যদি অত্যন্ত প্রিয় কোনো লেখকের উপন্যাস হয়, তাহলে তাতে এমনভাবে মন বসে যাবে যে রেকর্ড বেচারী মনমাতানো গান বাজিয়ে বেদম হয়ে পড়লেও উপেনের মন আর কাড়তে পারবে না—উপেন মনেই করতে পারবে না যে এমন কোনো গান কখনো শুনেছে কিনা।

তবে হ্যাঁ, সত্যিই যদি সাংঘাতিক বিপজ্জনক কিছু ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে আমি গিয়ার পালটে নিই। ধরুন এঁটেল মাটিতে পা পিছলে গিয়েছে উপেনের। তক্ষুনি বলি, ওহে উপেন, পপাতধরণীতল হওয়ার আগেই সামলে নাও ; হাত দুটোকে সিগন্যাল পাঠাই সামনে বাড়িয়ে যেন আছাড়ের বেগকে সামলে দেয়। তার পরেও যদি উপেন বেচারী চিৎপটাং হয়, তাহলেও উপেনকে জানিয়ে দিই। সবশেষে আছাড় খাওয়ার ঘটনাকে সযত্নে তুলে রাখি স্মৃতির ভাঁড়ারে যাতে ভবিষ্যতে উপেন এঁটেল মাটিতে পা টিপে টিপে চলে—

হুঁশিয়ার থাকে।

এই ধরনের জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করা ছাড়াও আরও হাজার রকমের ঘরসংসারের হেপাজত পোহাতে হয় আমাকে। ধরুন, উপেনের শ্বাসপ্রশ্বাসের খবরদারি করা। সেনসরি নার্ভের কাজ হল মস্তিষ্ক আর মেরুদণ্ডকে খবর পাঠানো। এই সেনসররা এসে জানায় উপেনের রক্তে কার্বনডায়অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। এখুনি ওকে বাড়তি অক্সিজেন দেওয়া দরকার। তখুনি শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বাড়িয়ে দিই আমি। বুকের পেশীর সংকোচন প্রসারণের হারও যায় বেড়ে। সবটাই আমার কেরামতি—এই দেড়কিলো ব্যাঙের ছাতা সদৃশ বিদঘুটে পিণ্ডটার।

এই রকম হাজার হাজার পন্থায় উপেনের দেখাশুনা করতে হয় আমায়। উপেনের সমস্ত শরীরের যা ওজন তার একশভাগের মাত্র দুভাগ ওজন আমার। অথচ ও যতটা অক্সিজেন নেয় নিঃশ্বেসের সঙ্গে তার পাঁচভাগের একভাগ নিয়ে নিই আমি। যতটা রক্ত ঠেলে দেয় ওর হৃদপিণ্ড সারা শরীরে রক্ত জোগানোর জন্য, তারও পাঁচভাগের একভাগ টেনে নিই আমি একা। অর্থাৎ ওজন দুই শতাংশ—চাহিদা কিন্তু বিশ শতাংশ—রক্তের বেলা আর অক্সিজেনের বেলা। এই দুটির অবিরাম জোগান দরকার আমার—বন্ধ হলেই সর্বনাশ। যদি কিছুক্ষণের জন্যেও ঘাটতি পড়ে এই দুটির সরবরাহে—তাহলেই জ্ঞান হারায় উপেন। মিনিটকয়েকের জন্যে সরবরাহ বন্ধ করে দিলে তো আর রক্ষে নেই—মারাত্মক ভাবে জখম হবে উপেন, হয় পক্ষাঘাত—নয় মৃত্যু। এছাড়াও আমার নিয়মিতভাবে পুষ্টির দরকার—মানে গ্লুকোজের দরকার। এমন কি যখন প্রচণ্ড আহারের দুর্ভোগ চলছে, তখনও ছিটেফোঁটা গ্লুকোজ পেটে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে তা লুঠে নিই আমি। কেন না, আমি না থাকলে তো উপেন থাকবে না—মৃত্যু অনিবার্য।

অনেক ক্ষেত্রে আমি আবার একটা বিশাল অনাবিষ্কৃত মহাদেশের মত—এমন একটা মহাদেশ যার উপকূলের আভাস মোটামুটি আন্দাজ করা যায়, হয়ত তার চাইতে একটু বেশীও অনুমান করে নেওয়া যায়—তার বেশী নয়। কিন্তু মজা হল এই যে, যে সব গবেষকরা মানচিত্র আঁকতে বসেন, তারাই চিত্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য আবিষ্কার করেন আমার মধ্যে। যেমন ধরুন, যদিও শরীরের যেখানে ব্যথাই লাগুক না কেন—সে ব্যথা অনুভূত হয় আমার মধ্যে;

মস্তিষ্ক

আমার নিজের কোনো ব্যথা অনুভূতি নেই—এমন কি আমাকে কেটে ফেললেও আমায় কিস্‌সু লাগে না। এই কারণেই রুগীকে জাগিয়ে রেখে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা যায়, ব্রেনের বিশেষ বিশেষ জায়গাকে বৈদ্যুতিক-ভাবে উদ্দীপ্ত করে ফলাফল পর্যবেক্ষণের সুযোগ লাভ করতে পারেন গবেষকরা।

উপেনের মস্তিকে এই ধরনের অস্ত্রোপচার ঘটলে তাজ্জব হয়ে যেত সে পরের ঘটনাগুলো দেখে। মস্তিষ্কের এক জায়গায় সামান্য বৈদ্যুতিক সুড়-সুড়ি দিলেই 'দেখতে' পেত বহু-বিস্মৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষককে। আর এক জায়গায় সুড়সুড়ি লাগলেই 'শুনতে' পেত এমন একটা ট্রেনের হুইস্‌ল্‌ বা নার্সারী ক্লাশের ছড়া যা কয়েক ঘন্টা আগেও কোনমতেই মনে করা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। আমি যেন জীবনব্যাপী স্মরণার্থ চিহ্ন বা অভিজ্ঞানে ঠাসা একটা সুপ্রাচীন চিলেকোঠা। উপেন হয় তো জানে না কি আছে চিলে কোঠায়, সুখ দুঃখে জড়ানো কত কি জড়ো করা রয়েছে ছোট ঘরটাতে—কিন্তু কিচ্ছু হারিয়ে যায় নি—তুচ্ছতম জিনিসটা রয়েছে ঐখানে—ঐ দেড়কিলো ব্যাঙের ছাতার মধ্যে!

মস্তিষ্কের মানচিত্রকররা কিন্তু অনেক রহস্যের কিনারা করতে না পারলেও কয়েকটা ব্যাপার ধরে ফেলেছেন। অন্তত পক্ষে কিছুটা তো পেরেছেন। যেমন ধরুন না কেন, আমার মধ্যে প্রাথমিক কাজকর্ম কিভাবে চলছে, তা মোটামুটি আঁচ করেছেন; মগজের পেছন দিকেই চলছে যা কিছু দেখা দেখির কারবার আর শোনাশুনি হচ্ছে মগজের পাশের দিকে। এর চাইতে বোধ হয় সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক আবিষ্কার হল 'আনন্দে ডগমগ হওয়ার কেন্দ্র'। একটা ইঁদুরকে যদি এমন একটা বোতাম টিপতে শেখানো হয় যে-বোতাম টিপলে বৈদ্যুতিক সুড়সুড়ি লাগবে তার 'আনন্দে ডগমগ হওয়ার কেন্দ্রে', তাহলে মহানন্দে বারবার ঐ আনন্দের অনুভূতি পাওয়ার আনন্দে সে বোতাম টিপেই চলবে—হয়ত খাওয়ার কথাও খেয়াল করবে না—ক্ষিদের জ্বালাও ভুলে যাবে। খাবার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেও সে পরম আনন্দ পাবে ঐ বোতাম টিপে। তেমন সময় যদি দেন, তাহলে দেখবেন বেচারী না খেয়ে হয়ত মরেই গেল—কিন্তু মনের সুখে মরল—ক্ষিদের জ্বালায় কষ্ট না পেয়ে। আরও ধরুন না কেন, উপেন মক্কেল হয়ত দারুণ বিমর্ষ-তায় ভুগছে বিষাদ রোগে একেবারে মুষড়ে পড়েছে। ডাক্তাররা তখন

তার ব্রেনে এই রকম একটা ইলেকট্রোড বসিয়ে দিলেও দিতে পারেন। ছোট্ট ছোট্ট বিদ্যুতের ধাক্কা গিয়ে বিমর্ষ উপেনকেও চক্ষের নিমিষে ফুর্তি-বাজ উপেন বানিয়ে তুলবে।

আমি থাকি কিন্তু একটা রীতিমত সুরক্ষিত কেল্লার মধ্যে। আমার এই কেল্লা, মানে, খুলিটা ওপর দিকে সিকি ইঞ্চি পুরু, তাই চাইতেও বেশি পুরু নিচের দিকে। মানে ডগায় যতটা মোটা, গোড়ায় মোটা তার চেয়ে বেশী। তাই বলে যেন মাথামোটা বলে বসবেন না। একরকম জলীয় পদার্থে অষ্টপ্রহর চান করা অবস্থায় থাকি আমি—ফলে বাইরে চোট ঝাঁকুনি লাগলে এই জলীয় পদার্থ তা গদীর মত শুষে নেয়—আমাকে রক্ষে করে। দ্বাররক্ষকের কাজ করে একটা ব্লাড-ব্রেন প্রতিবন্ধক—রক্ত আর মস্তিকের মধ্যেকার একটা বাধা। এই বাধা বেছে বেছে কাউকে পথ আটকায় কাউকে পথ ছেড়ে দেয়। গ্লুকোজ নইলে আমার একদণ্ডও চলে না—তাই গ্লুকোজকে খাতির করে ঢুকিয়ে দেয় আমার মধ্যে—কিন্তু আটকে দেয় ব্যাকটিরিয়া (জীবাণু) আর বিষ বা বা উপবিষ জাতীয় বদ বস্তুগুলোকে। তবে কি জানেন বেশীর ভাগ যন্ত্রণা নিবারক আর ঘুম পাড়ানিয়া বা অসাড়তা সৃষ্টিকারী (অ্যানেস্থেসিয়া) কেও পথ ছেড়ে দেয় এই দ্বাররক্ষক। সেইসঙ্গে ঢুকে পড়ে অ্যালকোহল (মদ) আর সেইসব ওষুধ (ড্রাগ) যারা আমার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতাকে লণ্ড-ভণ্ড করে দিয়ে ব্রেনে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করে দেয়। তখন আমি চোখে দেখা দৃশ্যকেও অনেক সময়ে কানে 'শুনতে' পাই। অন্যায় নয় কি ?

আমার স্থাপত্য সম্বন্ধে এই ফাঁকে একটা কথা বলে রাখি। মাঠ থেকে এক চাপড়া ঘাস তুলে নিয়ে দেখুন শেকড়গুলো কি রকম জট পাকিয়ে আছে—ছাড়াতে পারবেন না। ঠিক তেমনি ভাবে জট পাকিয়ে রয়েছে আমার তিন হাজার কোটি স্নায়ু কোষ বা নিউরোন—অন্যান্য সবার সঙ্গে রচনা করে রেখেছে—সংখ্যায় তারা ৬০,০০০ গুণ তো বটেই।

প্রত্যেকটা নিউরোনকে দেখতে অনেকটা মাকড়শার মত—সরু সরু সুতো বা তন্তুর গায়ে যেন আটকে আছে। মাকড়শার পা হল ডেনড্রাইট যার মধ্যে দিয়ে স্নায়ু কোষে খবর যাচ্ছে আর সরু তন্তু হল অ্যাক্সন—যার মধ্যে দিয়ে স্নায়ু কোষের খবর বাইরে যাচ্ছে। লাগোয়া নিউরোনের সিগন্যাল তুলে নেয়—পাঠিয়ে দেয় কোষ দেহে ; সিগন্যাল নেমে আসে তন্তু

বেয়ে—ঘণ্টায় ২২৫ মাইল বেগে। এক-একটা সিগন্যাল যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক সেকেণ্ডের দু'হাজার ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে নতুন করে রাসায়নিক পন্থায় নিজেকে শক্তিমান (রিচার্জ) করে নেয় তন্তু। কখনোই কোথাও একটা নিউরোনের সঙ্গে আর একটা নিউরোনের ছোঁয়া-ছুঁয়ি হচ্ছে না। সিগন্যালগুলো যাচ্ছে ফাঁকের মধ্যে দিয়ে স্ফুলিঙ্গের (স্পার্ক গ্যাপ) লাফিয়ে যাওয়ার কায়দায়। প্রতিবার ফায়ারিং হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিকভাবে (কেমিক্যালি) একটা স্নায়ু যোগাযোগ স্থাপন করছে আর একটা স্নায়ুর সঙ্গে।

আমার এত বহুমুখী প্রতিভা সত্ত্বেও হায় রে, পুনরুৎপাদন অথবা নতুন কোষের জন্মদান বিষয়ে আমি একেবারেই আকাট। আশ্চর্য এই রহস্য আমার করারও নয় সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে। আমি নিজেকে বাড়াতে পারি না—মরা কোষের জায়গায় নতুন কোষ বানিয়ে নিতে পারি না। এই একটি জায়গায় সৃষ্টিকর্তা আমাকে মেরে রেখেছেন। যকৃতের টিশু, চামড়া, রক্তের কোষ প্রত্যেকেই নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি সামলে নিতে পারে পুনরুৎ-পাদনের দৌলতে। জখম হলে ম্যানেজ করে নেয়। কিন্তু আমি পারি না—অথচ আমিই এই দেহটাকে চালাচ্ছি। এটা কি সৃষ্টি কর্তার ঠিক হয়েছে? আমার একটা কোষও যদি অক্কা পায়, তার বদলি আর কোনো কোষ আসে না—যে যায় সে একেবারেই যায়। পরিণামটা কি হয়েছে জানেন? আজ এই ছেচল্লিশ বছর বয়েসে উপেন প্রতিদিন একহাজারের বেশী স্নায়ুকোষ হারিয়ে চলেছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার ওজনও কমে আসে। ভাগ্যিস বাড়তি সঞ্চয় আছে আমার, নইলে কি সর্বনাশটা হত বলুন তো। পুনরুৎপাদন করতে না পারি, ভাঁড়ার থেকে বাড়তি কোষ জোগান দিয়ে যাই নিয়মিত। হাজার কোষ মরে তো আর এক হাজার কোষ এসে তাদের কাজ চালিয়ে নেয়। ঈশ্বরের অশেষ দয়া।

দিনকে দিন এইভাবে উপেনের যে লোকসান হয়ে চলেছে, কোষ ভাণ্ডার ফুরিয়ে আসছে একটু একটু করে, হয়ত কোনোদিনই উপেন তা টের নাও পেতে পারে। কিন্তু খুব বেশী কোষ হারানোর পর একদিন তার টনক নড়বে।—গন্ধ অনুভূতি কমে আসতে পারে। স্বাদ গ্রহণ করার অনুভূতি ততটা তীক্ষ্ণ আর নাও থাকতে পারে; কানে শোনার ব্যাপারটাও ততটা আর পরিষ্কার নাও থাকতে পারে। তখন হয়ত উপেনের খেয়াল হবে,

তাইতো, আগের মত সব ব্যাপারে আর তো সজাগ থাকা যাচ্ছে না—সবই যেন ঢিলেঢালা হয়ে যাচ্ছে। নাম মনে থাকছে না—মনে রাখতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। তারিখ আর টেলিফোন নাম্বার চট করে আর মনে পড়ছে না। তা সত্ত্বেও কিন্তু শেষের দিকের এর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ কাজ-টাজগুলোর দায়িত্ব আমি ঠিকঠাক পালন করে যাই—ত্রুটি রাখি না।

উপেন জানে তার দুটো কিডনী, দুটো ফুসফুস আর দুটো অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি আছে। আমারও যে 'জোড়া' আছে, এই জ্ঞান তার নেই—ভাবতেও পারে না। ভাবখানা যেন মগজ তার একখানাই—নির্বান্ধব—নিঃসঙ্গ। একক দেহযন্ত্র। কিন্তু আসলে আমি তা নই। আমারও পরিষ্কার দুটো ভাগ আছে। ডানদিক আর বাঁ দিক; ডান গোলার্ধ আর বাম গোলার্ধও বলতে পারেন। উপেনের শরীরের ডানদিকে যা কিছু কাজকর্ম, তার নিয়ন্ত্রণ আমার বাঁ অংশের ওপর; শরীরের বাঁদিকের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করছে মস্তিষ্কের ডান অংশ। যারা ডান হাত দিয়ে সব কাজ সারে, তাদের মগজের বাঁ অংশ অনেক বেশী প্রতাপশালী। আর যারা ল্যাটা, বাঁ হাতেই সব সারে তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো—মস্তিষ্কের ডান অংশ বেশী প্রতাপশালী।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, উপেনের কথা বলার ক্ষমতা, পড়াশুনা আর লেখালেখি করার ক্ষমতা, অংক করার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করছে আমার বাম গোলার্ধ। আমার ডান গোলার্ধ অপরিহার্য ভাবে বোবা ঠিকই, কিন্তু অন্যান্য কাজে বড় দড়—মৌলিক চিন্তা ভাবনাকে সামলাচ্ছে। এই গোলার্ধ হল কৃষ্টি আর সংস্কৃতির জগৎ; চোখে দেখে সৌন্দর্যকে তারিফ করা, শিল্পকলা আর বিমূর্ত চিন্তাভাবনা নিয়ে তন্ময় থাকা। এক গোলার্ধ যখন কোনো এক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত, অন্য গোলার্ধ তখন সুইচ নিভিয়ে নিষ্ক্রিয় থাকে—নইলে একই সঙ্গে দুটো ব্যাপার নিয়ে ভাবাই অসম্ভব হয়ে পড়ত। আমার সব চাইতে চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হল সহায়তা করা। কোনো স্মৃতিকেই আমি হারিয়ে যেতে দিই না। নানান জায়গায় জমিয়ে রাখি। ফলে, কোনো একটা বিশেষ জামরুল গাছ বা ঝিরঝিরে হাঁটু-জলে-চলা ছোট নদী দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে মনের পর্দায় চক্ষের নিমেষে ভেসে উঠে সেই দেশের সেই বিশেষ জায়গাটার সমস্ত কিছু। এই কারণেই উপেনের কোনো একটা অংশ যদি নষ্ট হয়ে যায় কোনো কারণেই, ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই—দেড় কিলোর বাকী জায়গা দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে পারি বেশ ভালভাবেই। যে অংশ টিঁকে থাকে,

মস্তিষ্ক

তাকে দিয়ে অজানা কাজ করতে একটু সময় লাগে বইকি। নতুন কাজে অভ্যস্ত হতে বেশ সময় লাগে। কিন্তু বিধাতার অশেষ কৃপায় হামেশাই ক্ষতি পূরণ বাবদ স্নায়ুর যোগসূত্র রচনা করে নিই। তাই, উপেন যদি কখনো বাকশক্তি হারায়—আবার তা ফিরিয়ে আনলেও আনতে পারি; যে অংশ পক্ষাঘাতে অনড়, তাতেও প্রাণের স্পন্দন জাগাতে পারি।

কপালজোরে এইভাবে অবস্থাবিশেষের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাটা আছে বলে উপেনকে বাঁচিয়ে দিতে পারি ঠিকই—কিন্তু এত ভাবে আমাকে আগলে রাখার বন্দোবস্ত সত্ত্বেও কতরকম ঝঞ্ঝাটে যে পড়ি, তার ইয়ত্তা নেই। ধরুন না কেন, টিউমার। অনেক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে পারে এই টিউমার যদি মগজের মধ্যে বেধড়কভাবে বাড়তে থাকে। তবে টিউমার অপসারণ আজকাল হচ্ছে। এবং যে ক্ষেত্রে তা একেবারেই বাদ দেওয়া যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে নাটকীয় ভাবে আরোগ্যলাভও লক্ষ্য করা গেছে।

আর একটা বড় সমস্যা হল স্ট্রোক। বাংলায় যাকে বলা চলে সন্ন্যাস রোগ—মস্তিষ্কে সহসা রক্তক্ষরণ ইত্যাদির ফলে জ্ঞান হারানো এবং প্রাণ নিয়ে টানাটানি। রক্ত বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে চুলের মত সরু সরু যে রক্তনলিকা রয়েছে, অথবা ছোট্ট কোন একটা ধমনী হঠাৎ যদি কাহিল হয়ে পড়ে—ফেটে যায়, ফলে আমার সেই অংশে রক্ত পৌঁছোয় না—উপোসী থাকে। অনেক রকম লক্ষণ তখন দেখা যায়। মনের ছোটখাট ব্যায়রাম থেকে পুরোপুরি পক্ষাঘাত, এমন কি মৃত্যু। অনেক ক্ষেত্রেই স্ট্রোক হলে যে-সব লক্ষণ দেখা যায়—তার নিরাময় আর সম্ভব হয় না অনেক ক্ষেত্রে আবার আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনা যায়। সেটা নির্ভর করে আমার কোন অংশটা কতখানি নষ্ট হয়েছে—তার ওপর।

আমার তৃতীয় শত্রু হল মস্তিষ্কে চোট লাগা। যদিও জলীয় গদাতে সুরক্ষিত আমি করোটির কেল্লায়, তা সত্ত্বেও পড়ে গেলে, বা জোরে ডাণ্ডা হাঁকড়ালে অথবা দুর্ঘটনায় মারাত্মক চোট পাই আমি। অনেক রকম ভাবে জানান দিই যে জখম হয়েছি। আঙুল থেঁতলে গেলে যেমন ফুলে ঢোল হয়, ঠিক তেমনি আমিও ফুলে উঠি। কিন্তু আমি তো হাড়ের খাঁচায় বন্দী। জায়গা কোথায় যে ফুলে উঠবো? তাই চাপ বৃদ্ধি পায় মগজে। চোখে ধোঁয়া দেখে উপেন, জ্ঞান হারায়, অবশেষে উড়ে যায় প্রাণপাখী।

কিন্তু দেখলেন তো আমার ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার ক্ষমতাটাও নেহাৎ

কম নয়—প্রচণ্ডই বলতে পারেন। এবং এতকথা বলার পরেও আমার কাহিনী ফুরিয়ে গেল, ভাববেন না যেন। আমার কেরামতি আজ পর্যন্ত যা দেখাতে পেরেছি তা যদি আরও ব্যাপকতর আকারে দেখা যায়—যেমন বক্তৃতার ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি, যুক্তিতর্কের বিছে এবং আরও শতসহস্র বিস্ময়—তাহলে জানবেন ভবিষ্যতে যে কি কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়তে পারি আমি, তা কল্পনাও করতে পারবেন না। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এই দেড় কিলো ব্রেন বলছি। আমার অতুলনীয় অ-কল্পনীয় সম্পদের সামান্য কিছু কাজে লাগিয়েই মানুষ আজ ইতর প্রাণী থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবে পরিণত হয়েছে। কয়েক লক্ষ বছর পরে আমার এই দেড় কিলোর মহিমায় মানুষ এমন এক মহান্ স্তরে পৌঁছোবে যে-স্তরে উঠে আজকের মানুষের ব্রেনকে নিনডারথাল মানবের মস্তিষ্কের মতই আদিম মস্তিষ্ক ছাড়া আর কিছু মনে হবে না।

সে দিন আসছে। লক্ষণ দেখে বুঝছেন না?

হাইপোথ্যালামাস

উপেন কি কখনো আমার নাম শুনেছে? একেবারে না। আমি যে আছি ওর শরীরের মধ্যেই এবং চব্বিশ ঘন্টা ডিউটি দিয়ে যাচ্ছি, ও তার বিন্দু বিসর্গ জানে না। এমন কি কি ডিউটি দিচ্ছি, কি কাজ করে মরছি ওর জন্যে অষ্টপ্রহর, তাও জানে না। অথচ আমি ওর দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক কোষগুচ্ছ।

দায়িত্ব আমার অনেক। তার মধ্যে সব চাইতে বড় দায়িত্ব উপেনের দেহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। চাট্টিখানি কাজ নয় কিন্তু। ব্রেন আর বডির নানান অঞ্চলকে আমিই খবর দিই—বাপু হে, তৈরী হও, এবার তোমার তলব পড়েছে। চব্বিশঘন্টা সর্দারি করে যাচ্ছি বলেই উপেন ঠিক-ঠিক সময়েজানতে পারে তার ক্ষিদে পেয়েছে, তেষ্টা পেয়েছে, গরম করছে কি শীত করছে, অথবা কখন রেগে ফুলে উঠতে হবে নয়তো ভয়ে কুঁকড়ে যেতে হবে। যেভাবেই বলা যাক না কেন, উপেন চব্বিশ ঘন্টায় জেগে থেকে অথবা ঘুমিয়ে যা কিছু করছে, তার সব কিছুতেই নানান রকমভাবে আমি হাত লাগিয়ে যাচ্ছি। এই তো এবার ধরে ফেলেছেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই উপেনের হাইপোথ্যালামাস।

উপেনের ব্রেনের অন্যান্য অংশের মত ধীমান আমি নই। বুদ্ধিশুদ্ধি আমার কম। ভাবনাচিন্তার ধারকাছ দিয়েও আমি যাই না। ওটা আমার কাজই নয়। বলতে পারেন আমি হলাম গিয়ে উপেনের দেহের মেন সুইচবোর্ড, সমন্বয় সাধন করে দিই ওর পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড আর বেশীর ভাগ স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে। পিটুইটারীই কিন্তু উপেনের দেহের মধ্যে সজীব উপাদানের রাসা-য়নিক পরিবর্তন (বিপাক অথবা মেটাবলিজ্‌ম্‌), বৃদ্ধি, অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্য এবং হরমোন মণ্ডলীর অন্যান্য কাজকর্মের ওপরেও প্রভাব সৃষ্টি করে যাচ্ছে। পিট্যুইটারীকে এই কারণেই গুরুগ্রন্থী বা মাস্টার গ্ল্যাণ্ড বলেন অনেকেই। এ হেন পিট্যুইটারীর সঙ্গে অন্যান্য অনেক কিছুরই সমন্বয় সাধন করে চলেছি আমি। আমার গুরুত্বটা এবার আঁচ করতে পারছেন?

চেহারার দিক দিয়ে আমি আহামরি মোটেই নয়। নেহাৎই গোবেচারা। ব্রেনের তলার দিকে আমি আছি, উপেনের মাথার মাঝামাঝি জায়গাতেও বলতে পারেন। গোলাপী আর ধূসর হল গিয়ে আমার গায়ের রং ; আকারে একটা ছোট্ট শুকনো কুলের মত ; সমস্ত মস্তিষ্কের যা ওজন, তার তিনশ ভাগের মাত্র একভাগ। তা সত্ত্বেও দেহের অন্য যে কোনো জায়গার চাইতে বেশী রক্তের জোগান দিতে হয় আমাকে। আমার স্নায়ুতন্ত্রও অনেক উন্নত-ধরনের এবং সরাসরিভাবে আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যেই অত্যন্ত ব্যাপক যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে আমার সঙ্গে।

হাইপোথ্যালামাস
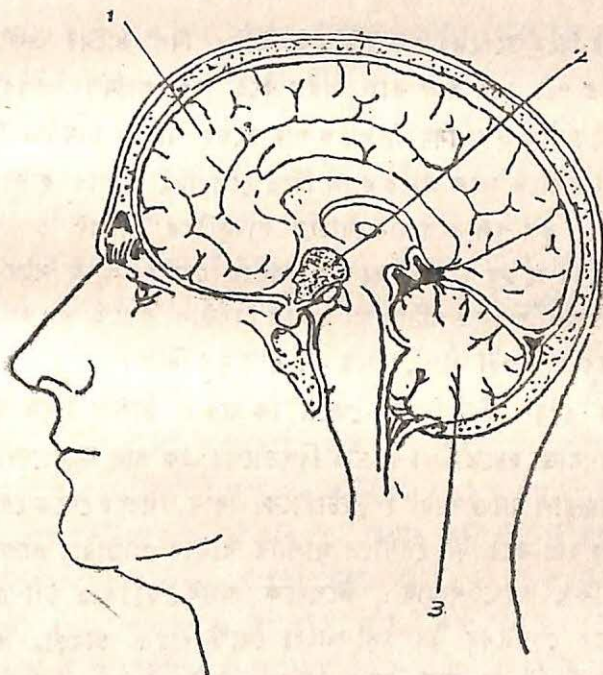
১। সেরিব্রাম অথবা গুরু মস্তিষ্ক ; ২। হাইপোথ্যালামাস ; ৩। সেরিবেলাম অথবা লঘু মস্তিষ্ক ;

আমি অত্যন্ত প্রাচীন। দশকোটি বছর আগে প্রথম যখন আদিম জীব-জন্তু পৃথিবীর ওপর আবির্ভূত হতে থাকে, তখন আমি যে সব কাজ করেছিলাম, এখনও তার অনেক কিছুর করি উপেনের জন্যে। যেমন ধরুন তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা। এই শর্মার জন্যেই শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের ৬৮ ডিগ্রী (—৯০ ফারেনহাইট) নিচে তাপমাত্রা নেমে গেলেও সাইবেরিয়ার ভয়াবহ ঠাণ্ডাতেও টিঁকে যায় উপেন; আবার লিবিয়াতে গিয়ে উপেন যদি দেখে তাপমাত্রা ৫৮ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড (১৩৬ ফারেনহাইট) পর্যন্ত উঠে গেছে, তাহলেও গরমে আইঢাই করলেও প্রাণটা বেরিয়ে যায় না। চরম ঠাণ্ডা বা চরম গরমের দেশে উপেনের দেহের ভেতরকার তাপমাত্রাকে ৩৬.৯ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড (৯৮.৪ ফারেনহাইট) ধরে রাখতে হয় আমাকে। তাপমাত্রা এর কয়েক ডিগ্রী বেশী বা কম হলেই জানবেন উপেনকে আর জ্যান্ত থাকতে হবে না।

গরমের দিনে উপেনের রক্ত যদি এক ডিগ্রির বিশ ভাগের এক ভাগও বেশী তেতে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ করে দিই আমি। খবর পাঠাই পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডে এবং সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের মারফৎ চামড়ার উপরকার রক্তনলিকাগুলোকে ফুলে ওঠার হুকুম দিয়ে খুলে দিই হাজার হাজার ঘাম-গ্রন্থির মুখ। কুল কুল করে ঘাম বেরিয়ে গা-জুড়িয়ে দিলেই চামড়া ঠাণ্ডা হয়—উপেনের রক্তের বাড়তি তাপকে উড়িয়ে দেয়। একই সঙ্গে ব্রেনের অন্যান্য অংশেও সংকেত পাঠাই যাতে করে হাঁসফাঁস করতে থাকে উপেন। ফলে আরও খানিকটা তাপ বেরিয়ে যায় নাক মুখ দিয়ে।

এবার দেখুন ঠিক উল্টো ক্ষেত্রে কি ঘটে। ঠাণ্ডার দিনে উপেনের রক্তের তাপমাত্রা হয়তো এক ডিগ্রীর বিশভাগের এক ভাগ কমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাড্রেন্যাল গ্ল্যাণ্ড আর পিটুইটারীকে দিয়ে লিভার থেকে বেশী করে ব্লাড সুগার বার করে দিই পেশীতে জ্বালানি হিসেবে পোড়াবার জন্যে—দেহের মূল চুল্লী কিন্তু এই পেশীরাই। উপেনকে আমি ঠকঠকিয়ে কাঁপিয়েও দিই যাতে করে পেশীদের তৎপরতা আরো বেড়ে যায়। চামড়ার ওপর রক্ত থাকলে আরও ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে, তাই ঘামগ্রন্থির মুখ বন্ধ করে দিয়ে রক্তের চালানও কমিয়ে আনি চামড়ার ওপরে। এর পরেও যদি আরও বেশী ঠাণ্ডা লাগে উপেনের, তাহলে চামড়ার ওপরকার রক্তবহানলিকায় রক্ত যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় একেবারেই। ঠিক তখনি নীল হয়ে যায়

উপেন।

ঠাণ্ডায় হি-হি করে উপেন কাঁপতে থাকলেও এমন একটা কাণ্ড করি আমি যা করার কোনো মানেই হয় না ; গায়ে কাঁটা দেয় উপেনের। এই কাণ্ডটাও কিন্তু উপেনের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া। তারা ছিল লোমশ। শীতে হি-হি করে কাঁপুনি লাগলেও চামড়ার পেশী কুঁচকিয়ে লোমখাড়া করে দিতাম যাতে ঠাণ্ডাটা কম লাগে।

এবার ধরুন উপেনের দেহে জীবাণু সংক্রমণ হয়েছে। আমার সেনসর অর্থাৎ বার্তাবাহক স্নায়ুদের অনুভূতির ধার ভোঁতা করে দেয় জীবাণুরা। ফলে, যে তাপমাত্রায় সেনসররা কাজ করতে পারে—তাপমাত্রা উঠে যায় তার ওপরে—ঠিক যেন উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র—থার্মোস্ট্যাট। উপেনকেও সাত তাড়াতাড়ি বডি টেম্পারেচার বাড়াতে হয় চামড়ার ওপর-কার রক্তবহানলিকা কুঁচকিয়ে অথবা ঠকঠকিয়ে কেঁপে। কাজটা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বাড়তি উত্তাপকে শরীর থেকে বার করে দিই কুল কুল করে ঘেমে আর রক্তবহা নালীগুলোকে ফুলিয়ে দিয়ে। সংক্রমণ দূর হলেই, শরীর থেকে জীবাণু বিদায় হলেই আমার সেনসররা আবার স্বাভাবিকভাবে কাজ করার পরিবেশে ফিরে আসে, জ্বরও উধাও হয়।

জলের সমভাব বা ভারসাম্য বজায় রাখাও আমার একটা মস্ত কাজ। রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ কাজই বলব আমি। মূলতঃ উপেন কিন্তু সামুদ্রিক জন্তু। শিশু অবস্থায় শতকরা ৭৫ ভাগ জল ছিল ওর মধ্যে ; প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর জলের পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৫০ ভাগে। প্রত্যেকদিন ফুসফুস, ঘাম আর প্রস্রাবের মধ্যে দিয়ে আর্দ্রতা রূপে প্রায় তিন পাঁইট জল হারায় উপেন। ওর যা জলের দরকার, তার এক পঞ্চমাংশ কি তারও বেশী জল শরীর থেকে বেরিয়ে গেলে উপেনকে ইহলোক ছেড়ে যেতেই হবে।

তাই বলছিলাম, জলের পরিমাণ বেজায় কমে গেলেই জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এমার্জেন্সি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। জলের অভাবে রক্ত বেশী নোনতা হয়ে যাচ্ছে, এই খবর আমার তথ্য সংগ্রাহক কেন্দ্রে ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড আর আমি যৌথ প্রচেষ্টায় একটা অ্যান্টি-ডাইউরেটিক হরমোন, (ADH) ছেড়ে দিই রক্তের মধ্যে। নাম শুনে ঘাবড়ে গেলেন নাকি? ডাইউরেটিক কথাটার মানে হল যা প্রস্রাবের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, অ্যান্টি-ডাইউরেটিক হল ঠিক তার উল্টো—প্রস্রাবের

পরিমাণ কমিয়ে দেয়। স্বাভাবিক অবস্থায় কিডনী যতখানি জল শুষে নিতে পারে, ADHয়ের কৃপায় শুষতে থাকে তার বেশী, মূত্র গাঢ় হয় এবং লালাস্রাবী গ্রন্থিগুলো থেকেও লালা (স্যালাইভা) নিঃসরণ কমে যায়। উপেনের শরীরে তখন যতখানি জল থাকা দরকার, ঠিক ততখানিই থাকে। উপেনের তখন তেষ্টাও পায়। দু'এক গেলাস জলও খেয়ে নেয়। ফিরে আসে ওয়াটার ব্যাল্যান্স—জলের ভারসাম্য। ক্লিয়ার হল তো ?

আবার ধরুন বেচারার রক্তে বেশী জল এসে গেছে। তিন চার গেলাস বীয়ার খেলেই তা হয়। তৎক্ষণাৎ সিগন্যাল দিই পিটুইটারীকে ; পিটুইটারী কমিয়ে দেয় রক্তস্রোতে ADHয়ের পরিমাণ। স্বাভাবিক পরিমাণ মূত্র সংরক্ষণের আর দরকার হয় না কিডনীর—দ্রুততর হারে বাড়িয়ে যায় মূত্র উৎপাদন।

আর একটা কথা। ক্ষিদে পেলে উপেন ভাবে তার ক্ষিদে পেয়েছে—এমনি একটা ধারণা নিশ্চয় আপনারও আছে। আজ্ঞে না মশায়। ধারণাটা একেবারে ভুল। আমি না বলা পর্যন্ত ক্ষমতা আছে উপেনের যে ক্ষিদে পেয়েছে একথাটা তার খেয়াল হবে ? আমি বলব, তবে সে জানবে—হ্যাঁ, তার পেট জ্বলছে, ক্ষিদে পেয়েছে। ভাবুন তাহলে আমার ক্ষমতাখানা। খাওয়ার সময়ের ঠিক আগে হাজার হাজার টুকরো-টাকরা খবর চলে আসে আমার কাছে। খবরে খবরে ডুবে যাই আমি। উপেনের রক্তের শর্করা কমছে, আর একটা মৃদু ক্লান্তি আস্তে আস্তে পেশীগুলোকে অবসন্ন করে তুলছে। সব খবর যাচাই করে পাচক রস আর লালা বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করি। পাকস্থলীর সংকোচন গতি বেড়ে যায়, স্বাদ মুকুলগুলো আরও বেশী অনুভূতি সচেতন হয়ে ওঠে। উপেনের তখন খেয়াল হয় : খাওয়ার সময় হয়েছে।

আমার দুটো কোষ গুচ্ছ অথবা নিউক্লিয়াস বিশেষ করে খাওয়ার সঙ্গেই কেবল সম্বন্ধযুক্ত। এদের একটা যদি জখম হয়, উপেন এনতার খেয়েই যাবে—কখন থামতে হবে তা জানতে পারবে না। অন্যটা জখম হলে সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া বন্ধ করে দেবে উপেন। খাওয়ার ব্যাপারে কোনো আগ্রহই আর থাকবে না। যে খাওয়া নিয়ে এত কাণ্ড এই দুনিয়ায় তার নিয়ন্ত্রণ তাহলে করছে কে ? ছোট্ট কুলের আকারে আমি—এই হাইপোথ্যালামাস। ছোট্ট বলে অত ফ্যালনা নই—খেয়াল থাকে যেন।

দুনিয়াটা চলছে আর একটা প্রচণ্ড প্রবৃত্তির ওপর—যৌন বোধ। এ ব্যাপারেও আমাকে সাহায্য করতে হয়। পিটুইটারীকে ঠেলে ঠুলে গোনাড অর্থাৎ পুরুষ অথবা নারী দেহের যৌন গ্রন্থিকে আমিই উদ্দীপ্ত করি; এর বেশী আর কিছু আমি জানি না। যৌন আবেগ বেড়ে যায় কি ভাবে তা আমার জ্ঞানের বাইরে। ব্রেনের অন্যান্য অংশও অবিশ্যি একটা ভূমিকা পালন করে, কিন্তু একা কেউ করে না—মিলে মিশেই যৌন আবে-গকে উদ্দীপ্ত করতে হয়। তবে একটা কৃতিত্ব জোর গলায় দাবী করতে পারি। আমি না থাকলে যৌন ব্যাপারে উপেনের মধ্যে কোথাও এতটুকু সমন্বয় থাকত না। আমার একটা অংশও যদি নষ্ট হয় তো উপনের যৌন আবেগও চলে যাবে। আবার কখনও ব্রেনের মধ্যে এমন একটা চাপ সৃষ্টি হয় অথবা খোঁচা মারা হতে থাকে যে বাধ্য হয়ে পিটুইটারীকে বলে কয়ে খুব বেশী সেক্স হরমোন ছেড়ে দিয়ে যৌন প্রতিক্রিয়ার সক্রিয়তা দিই বাড়িয়ে।

মাঝে মাঝে ধাঁ করে রেগে যায় উপেন। খবরটা যেই পাই করটেক্সের কাছ থেকে (করটেক্স হল ব্রেনের ধূসর বস্তু), সঙ্গে সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত করি উপেনকে। একই সঙ্গে করতে হয় অনেকগুলো কাজ—একে একে করবার সময় তখন থাকে না—নিরাপদও নয়। পিটুইটারীকে খবর পাঠাই হরমোন ছাড়ার নির্দেশ দিয়ে—যাতে অন্যান্য গ্ল্যাণ্ডের বিপাক গতিবেগ (মেট্যাবলিক রেট) হু-হু করে বেড়ে যায়। লড়াই লাগলেই পেশীতে রক্ত দরকার। তাই সেখানে রক্ত সংরক্ষণের জন্যে চামড়ার রক্ত-বাহরা সংকুচিত হয়, কিন্তু পেশীর রক্তবাহ (ব্লাড ভেসেল) গুলো স্ফীত হয়। ফ্যাকাশে হয়ে যায় উপেন কিন্তু রক্তে ফেটে পড়তে থাকে সব কটা পেশী। হৃদ্স্পন্দন আর শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবেগও যায় বেড়ে। হৃদ্যন্ত্র প্রত্যেক হৃদ্ঘাতের সঙ্গে অনেক বেশী পরিমাণে রক্ত পাঠিয়ে দিতে থাকে শরীরের সর্বত্র। পাকস্থলীর কর্মতৎপরতা কিন্তু কমে যায়। উপেনের তখন ইচ্ছে যায় একবার প্রস্রাব করতে পারলে ভাল হত।

এ ছাড়াও এ দিকে ওদিকে আরও অনেক কিছু ঘটে। করোটিতে যে স্নায়ু রয়েছে (ক্রেনিয়াল নার্ভ) তারা চোখ, মুখমণ্ডলের পেশী, গলবিল (ফ্যারিংক্স) আর হৃদযন্ত্রকে আসন্ন প্রচাপের জন্যে প্রস্তুত রাখে। টানটান হয়ে ওঠে পেশীরা, কমে যায় চামড়ার তাপমাত্রা, আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্যে

বন্ধ হয়ে যায় লালাস্রাবী গ্রন্থিগুলো (শুকিয়ে যায় উপেনের মুখ)। উপেন ঠাণ্ডা হলেই আবার সব কিছু ফিরে যায় আগের অবস্থায়, মিনিট কয়েকের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে যায় উপেন।

উপেনের বাইরে যাই ঘটুক না কেন, আমি দিনরাত দেখে যাই ভেতরে যেন সব একই রকম থাকে—উল্টোপাল্টা না হয়। কপাল জোরে আমি নিজে বড় একটা বিগড়োই না। এমনভাবে সুরক্ষিত আমি যে জখম হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। দুশ্চিন্তা শুধু একটা ব্যাপারেই। আশপাশে টিউমার গজালেই সর্বনাশ। ব্রেনে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলেও সেই একই সর্বনাশ।

আমার ওপর এই যে বিরামবিহীন ধকল চলছে, উপেন কি তা কমিয়ে আনতে পারে? পারে কি আমার কাজের বোঝা লাঘব করতে? অতি সামান্য। সত্যি কথা বলতে গেলে, আমি কারও সাহায্যেরও ধার ধারি না। দীর্ঘদিন ধরে এই হেপাজত সামলাচ্ছি—উপেন নিজেও যা জানে না, আমি তা জানি। জানি কি করে ওর শরীরের ভেতরের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হয় সুষ্ঠুভাবে।

৩
সংজ্ঞা তন্ত্র

চোখ

ঘনীভূত জটিলতার দিক দিয়ে যদি বিচার করতে বসেন, এক বাক্যে বলবেন—উপেনের সারা দেহে আমার সমতুল্য আর একটিও যন্ত্র নেই। টেবিল-টেনিশ বলের চাইতে বড় আমি নই, কোটি কোটি বৈদ্যুতিক সংযোগ রয়েছে আমার সঙ্গে এবং আমি একাই যুগপৎ ১৫ লক্ষ বার্তাকে সামলাতে পারি। উপেন যত জ্ঞান আহরণ করে, তার শতকরা ৮০ ভাগই সংগ্রহ করি আমি। তবেই না কবি আর লেখকরা আমাকে তুলনা করেছেন রত্নের সঙ্গে। স্বয়ং কুবের তাঁর সমস্ত রত্নভাণ্ডার দিয়েও যে রত্নের দাম দিতে পারবেন না—আমিই সেই চক্ষুরত্ন।

উপেন মাঝে মাঝে বড়াই করে আমি নাকি ক্ষুদ্রকায় একটা টেলিভিশন ক্যামেরা। বড়াই করে করুক, কিন্তু তুলনাটা দিয়ে যে আমাকে অপমান করা হয়, সেটা বোঝে না। পৃথিবীর বৃহত্তম এবং সবচাইতে মূল্যবান যে কোনো টি-ভি ক্যামেরার চাইতেও আমি অনেক বেশী সেন্সিটিভ—

চোখ

অনুভূতি সচেতন। এ দুনিয়ায় অনেক অলৌকিক ঘটনা (মিরাকল) ঘটে চলেছে, সব মিরাকলের সেরা মিরাকলের জন্যে দায়ী কিন্তু আমি। দর্শন নামক বিস্ময়কর মিরাকল ঘটছে শুধু আমার জন্যেই। আজকের দুনিয়ায় অবশ্য আমাকে বড্ড বেগ পেতে হচ্ছে। এত ঝকমারির উপযুক্ত করে ঈশ্বর আমাকে তৈরী করেন নি। উপেনের প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষরা চক্ষুপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করত দূরের জিনিস দেখার জন্যে। চোখের প্রধান কাজ ছিল দূর থেকে দেখে বিপদ আপদকে এড়িয়ে যাওয়া, শিকার পেলে তাকে বধ করা। ইদানীং আমার ওপর বড্ড চাপ পড়ছে খুব কাছ থেকে একনাগাড়ে কাজ করে যাওয়ার জন্যে।

আমার অ্যানাটমির (শারীরস্থান বা শরীর গঠনতত্ত্ব) দিকে তাকালেই বুঝবেন কেন এ যুগের দাবী দাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা আমার পক্ষে এত মুস্কিল। প্রথমেই ধরুন আমার সামনের জানলা—অচ্ছোদপটল (কর্নিয়া)। এমন পরিষ্কার জানলা আর কোথাও পাবেন? আকারে নয়া পয়সার চাইতে একটু ছোট্ট। দর্শনের শুরু তো এইখান থেকেই। এর মধ্যে দিয়ে আলোকরশ্মি ঢুকলেই তাকে সুশৃঙ্খলভাবে বেঁকিয়ে বিশেষ প্যাটার্নে নিয়ে আসাটাই কর্নিয়ার প্রথম কাজ। এরপরেই আসছে আমার তারাযন্ত্র (পিউপিল)। আলো ঢোকানোর এমন একটা দরজা যা ছোটবড় করা যায় দরকার মত। রোদ্দুর যখন চড়া—ঝকমকে আলোয় এ দরজা প্রায় বন্ধ থাকে বললেই চলে। অন্ধকার রাতে কিন্তু হাট হয়ে যায় দরজা। এসবই অবশ্য একটা সস্তা ক্যামেরাতেও সম্ভব।

আমার আসল বিস্ময়ের শুরু লেন্স থেকে। ছোট্ট, ডিমের আকারের তরল পদার্থের একটা লেফাপা যেন। অবিশ্বাস্য রকমের কঠিন কাজে দক্ষ পেশী দিয়ে ঘেরা থাকে এই লেন্স। অসাধারণ শক্তিমান অথচ ছোট্ট আংটির মত এই পেশীর ক্ষমতা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। পেশী টান টান হলেই লেন্স মুটিয়ে গিয়ে কাছের জিনিস দেখতে সাহায্য করে; ঢিলে হলেই চেপটে গিয়ে দূরের জিনিস দেখতে দেয়।

উপেনের গুহানিবাসী পূর্বপুরুষদের পক্ষে এই ব্যবস্থাই ছিল অতি উত্তম ব্যবস্থা। বিশ ফুট, কি, তারও দূরের জিনিস দেখার আগ্রহটাই ছিল তাদের বেশী। কাজেই বেশীর ভাগ সময়ে ঢিলে হয়ে এলিয়ে থাকত লেন্সের চার-ধারের বলয়াকার পেশী। কিন্তু যুগ পালটেছে। উপেনকে এখন কাছের

ডুনিয়া নিয়ে অষ্টপ্রহর ব্যস্ত থাকতে হয়—টেবিলের কাজ তার বেড়েছে। ফলে আমার চুলের মত সরু সিলিয়ারি পেশীগুলোকেও বড্ড বেশীক্ষণ টান টান হয়ে থাকতে হয়। ক্লান্ত হয়ে পড়ে সেই কারণেই।

লেন্সের সামনে আর পেছনে তরল পদার্থে ভর্তি দুটো চেম্বার আছে। সামনের দিকের তরল পদার্থটা জলের মত; পেছন দিকে ডিমের সাদা অংশের মত ঘন। জলের মত তরল পদার্থের জন্যে ফুলে থাকি জোরের সঙ্গে। দুটো তরল পদার্থকেই পরিষ্কার টলটলে থাকতে হয় আলোকরশ্মি সামনে দিয়ে ঢুকিয়ে পেছন দিক দিয়ে আরও ভেতরে ঢোকানোর জন্যে। জোর আলোর দিকে তাকালে 'ফুটকি ফুটকি' কতকগুলো দানা উপেনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। জিনিসগুলো হল আমি যখন তৈরী হচ্ছি মাতৃজঠরে উপেনের জন্ম নেওয়ার সময়ে, তখনকার কোষের অবশিষ্টাংশ। উপেন যদ্দিন

চোখ
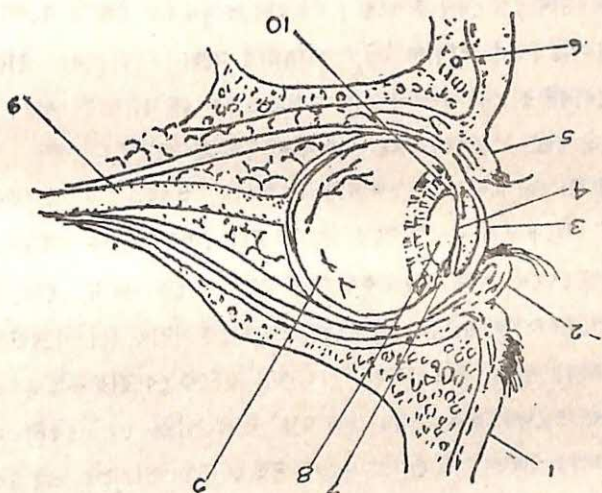
১। কপাল; ২। ওপরের চোখের পাতা; ৩। কর্নিয়া বা অচ্ছোদপটল; ৪। পিউপিল বা তারারন্ধ্র; ৫। নিচের চোখের পাতা; ৬। গালের হাড়; ৭। সিলিয়ারি পেশী যা চুলের মত সরু; ৮। লেন্স; ৯। অপটিক নার্ভ বা চক্ষু স্নায়ু; ১০। আইরিশ বা কনীনিকা; ১১। রেটিনা বা অক্ষিপট (রড এবং শঙ্কু);

চোখ-

বাঁচবে, কোষের ছিটে ফোঁটাগুলোও তদ্দিন থাকবে—ভেসে বেড়াবে উদ্দেশ্য-হীন ভাবে চোখের জলীয় পদার্থের মধ্যে।

উপেন কোনো কিছুর দিকে তাকালেই লেন্সের মধ্যে দিয়ে আলো চলে যায় ভেতরে—কেন্দ্রীভূত হয় রেটিনায়। রেটিনা (অক্ষিপট) জিনিসটা অনেকটা পিঁয়াজের খোসার মত। আমার ভেতরকার দুই তৃতীয়াংশ জায়গা ঢেকে রেখে দিয়েছে। উপেন যা দেখে তার আলো-কে আমার লেন্স চুলচেরা তীক্ষ্ণতায় ফোকাস করে এই রেটিনায়। এতটুকু জায়গায় এত জিনিস ঠেসে ঠুসে রেখে দেওয়ার নজির একমাত্র উপেনের মস্তিষ্ক ছাড়া আর কোথাও পাবেন বলে মনে হয় না। মাত্র সিকি বর্গ ইঞ্চিরও কম জায়গার মধ্যে আমার এই অত্যাশ্চর্য রেটিনায় রয়েছে তেরো কোটি সত্তর লক্ষ আলোক সচেতন রিসেপ্টর কোষ (অনুভূতি বহন করার স্নায়ুপ্রান্ত যার মধ্যে দিয়ে উদ্দীপনার আনাগোনা চলে।)। এর মধ্যে তেরো কোটি হল সাদা-কালো দৃশ্য দেখার জন্যে রডের মত দেখতে কোষ। বাকী সত্তর লক্ষ হল শংকুর মত দেখতে—রঙীন দৃশ্য দেখার জন্যে। এবার ভাবুন কি এলাহি বন্দোবস্ত করে রেখেছেন সৃষ্টিকর্তা সামান্য ঐটুকু জায়গার মধ্যে। মানুষের হাতে গড়া কোনো রোবট বা টেলিভিশন ক্যামেরাতেও কি এই ব্যাপার সম্ভব? এই কারণেই ঐ ধরনের তুলনা করলে অপমানটা গায়ে লাগে।

রডগুলো ছড়িয়ে আছে আমার রেটিনার ওপর। রাত্রে ধরুন একটা জোনাকি উড়ে এল—সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল জটিল রসায়ন কাণ্ড। রডের মধ্যে বেগনী-লাল এক রকম রঞ্জক পদার্থ থাকে—নাম, রোডোপসিন। আবছা আলো জ্বালিয়ে সাদা করে দেয় এই রঞ্জক পদার্থ (পিগমেন্ট)। সাদা করে দেওয়ার সময়ে অতি ক্ষুদে বিদ্যুৎ কণা ছিটকে বেরোয়—এক ভোল্টের কয়েক লক্ষ ভাগের এক ভাগ—এত কম তার শক্তি যে একটা মশাকেও চিড়িক মারার ক্ষমতা যার নেই। খড়ের মত চোখের স্নায়ুতে এই বিদ্যুৎকণা প্রবেশ করে, ঘন্টায় তিনশ মাইল বেগে পেঁছে যায় উপেনের ব্রেনে। সংকে-তের মানে বুঝে নেয় ব্রেন, রায় দেয় তৎক্ষণাৎ: জোনাকী দেখা যাচ্ছে। পুরো বৈদ্যুতিক রাসায়নিক তৎপরতা (ইলেকট্রো-কেমিক্যাল অ্যাকটিভিটি) ঘটে যায় কতটুকু সময়ের মধ্যে জানেন? এক সেকেণ্ডের দুহাজার ভাগের মাত্র এক ভাগের মধ্যে! এবং এই কাণ্ড ঘটেই চলেছে উপেন যতক্ষণ চোখ খোলা রেখেছে ততক্ষণ। বিস্ময়কর, নয় কি?

ভাবছেন রডগুলো তাহলে তো দারুণ জটিল কোষ। মশায়, তার চাইতে-ও অনেক বেশী জটিল আমার শংকু কোষ। এরা দলবদ্ধ হয়ে রয়েছে আমার ফোভিয়া তে। একটা আলপিনের মাথার মত হলদেটে খানিকটা জায়গা দেবে রয়েছে আমার চেম্বারের একদম পেছনে—তারই নাম ফোভিয়া। সুতীক্ষ দর্শনের কেন্দ্র হল এই ফোভিয়া। পড়াশুনা করার সময়ে, চোখ কাছে এনে কাজ করবার সময়ে, আর রঙীন জিনিস দেখাবার সময়ে কেরামতি দেখা যায় আশ্চর্য এই ফোভিয়ার। সাম্প্রতিক তত্ত্ব-অনুযায়ী শংকুর মত দেখতে এই কোষেদের মধ্যেও আলো-লেগে সাদা হয়ে যাওয়ার মত রঞ্জক পদার্থ আছে। লাল সবুজ আর নীল—এই তিন রঙের জন্যে তিনটে রঞ্জক পদার্থ। চিত্রকর যেমন প্যালেটে রঙ মিশিয়ে নতুন নতুন রঙ সৃষ্টি করে, উপেনের ব্রেনও স্রেফ এই তিনটে রঙকে বিভিন্ন মাত্রায় মিলিয়ে ডজন ডজন রঙ বানাতে পারে।

অত্যন্ত জটিল অত্যন্ত দুর্বোধ্য এই ইলেকট্রোকেমিক্যাল প্রক্রিয়ায় তিল মাত্র চ্যুতিবিচ্যুতি ঘটলেই জানবেন কেলেংকারীর একশেষ। সর্বনাশ ঘটে যাবে উপেন বেচারীর। কালার ব্লাইণ্ড (বর্ণান্ধ) হয়ে যাবে সে অর্থাৎ অন্ধ হবে বর্ণ নিরূপণে। প্রতি আটজনের মধ্যে একজন কিন্তু কমবেশী মাত্রায় বর্ণান্ধ বলে জানবেন। কম আলোর আমায় শংকুদের কর্মক্ষমতা কমে যায়, রঙ বিচার করার অনুভূতি উধাও হয়। তখন সব কিছুই মনে হয় ধূসর—সেই সময়ে কাজে নামে আমার বড় কোষরা।

উপেন যখন আমার মধ্যে দিয়ে দেখে—আসলে তখন দেখে ওর ব্রেন। মাথার পেছনে দমাস করে কিছু দিয়ে মেরে যদি ব্রেনের দৃষ্টি কেন্দ্রকে নষ্ট করে দেওয়া যায়, জন্মের মত অন্ধ হয়ে যাবে উপেন। তার চাইতে কম জোরে মারলে চোখে সর্ষেফুল দেখবে উপেন—বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাটাই যায় গোল মাল হয়ে। ব্রেনই যে দেখে তার স্পষ্ট প্রমাণ পায় উপেন স্বপ্ন দেখার সময়ে। ছবি দেখে উপেন, এমন কি ঘুটঘুটে অন্ধকারে আমার চোখের পাতা বন্ধ থাকলেও। জন্মান্ধ হলে স্পর্শ, শব্দ, এমন কি গন্ধ সম্বন্ধীয় ছবিও দেখতে পেত উপেন স্বপ্নের মধ্যে—সবই সেনসরি নার্ভের উদ্দীপনার কারসাজি। যেমন অনুভূতি পৌঁছোবে ব্রেনে—স্বপ্নও দেখবে সেই ধরনের।

আজ যে চক্ষুরত্ন নিয়ে বিচরণ করছে উপেন, এ চোখ নিয়ে কিন্তু সে ভূমিষ্ঠ হয়নি। জন্মমুহূর্তে দেখেছে কেবল আলো আর ছায়া। প্রথম কয়েক

চোখ

মাসে দেখেছে দূরের জিনিস—গুহাবাসী পূর্বপুরুষদের মত। ঝুমঝুমি নেড়ে নেড়ে দেখার জন্যে সেই কারণেই হাত মুঠো করে ধরত চোখ থেকে তফাতে—যতখানি হাত যায়।

প্রথম প্রথম উপেনের দুই চোখের সমন্বয় ভাল ছিল না। আমি যেতাম একদিকে—আমার অংশীদার আর একদিকে। দুই চোখের দুই মণির দু'দিকে যাওয়া দেখে বড় ভাবনায় পড়তেন উপেনের মা। ভাবতেন বুঝি নয়নের মণি ট্যারা হয়ে জন্মাল শেষ পর্যন্ত! কিন্তু খামোকা ভেবে মরতেন ভদ্রমহিলা। জন্মের কয়েকমাস পরে আমরা দুজনেই সঞ্চরণ করেছি একতালে একছন্দে—মানিকজোড়ের মত। ছ'বছর বয়েসে উপেনের দৃষ্টিশক্তি পৌঁছেছে উত্তম অবস্থায়। কিন্তু অতি-উত্তম অবস্থা এসেছে আটে পা দিলে।

বাচ্চাবেলায় কম আলোয় পড়ত উপেন। ধমক দিত ওর মা—চোখের বারোটা নাকি বাজবে। একদম বাজে কথা। ছোটরা বড়দের চেয়ে ভাল দেখে কম আলোয়। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও চোখের ব্যবহার করলেও চক্ষুরত্ন রত্নই থেকে যায়—একটুও ক্ষতি হয় না।

আরও কিছু গুণপনা আমার আছে। আমার পেশীগুলো পুঁচকে ঠিকই, কিন্তু শরীরের অন্যান্য পেশীদের সঙ্গে যদি তুলনা করেন তাহলে কিন্তু স্তম্ভিত হতে হবে। শরীরের অন্য যে কোনো এক মিলিগ্রাম পেশীর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে বলুন আমার এক মিলিগ্রাম পেশীকে—হেরে ভূত হয়ে যাবে বারবেল পুষ্ট পালোয়ানের বাহুর পেশীও। একদিনে আমি দশহাজার বার নড়াচাড়া করি চোখে দেখা বস্তুকে রেটিনার ওপর ফোকাস করার জন্যে। ফলে যতখানি ব্যায়াম করতে হয় আমার এই পুঁচকে পেশীদের ঠিক ততখানি ব্যায়াম করতে হলে উপেনের পায়ের পেশীকে হাঁটতে হবে কতটা পথ জানেন? পাকা ৫০ মাইল!

আরও আছে, মশায় আরো আছে। অত ফ্যালনা ভাববেন না আমাকে। নিজেকে সাফসুতরো রাখবার কলকব্জার বহরটাও কিন্তু নয়। চিত্ত-চাঞ্চল্যকর বলতে পারেন। আমার অশ্রু-গ্রন্থি (ল্যাকরিম্যাল গ্ল্যাণ্ডস্) থেকে সমানে ঝর ঝর করে আর্দ্রতা বেরোচ্ছে। চোখের মধ্যে ধুলো বা বাইরের উৎপাত ঢুকলেই ধুইয়ে বার করে দিচ্ছে। বৃষ্টির জলে ধোওয়া মোটরগাড়ীর উইণ্ড-স্ক্রীন ওয়াইপারের কেরামতি দেখেছেন সবাই। ডাইনে বাঁয়ে ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে ড্রাইভারের সামনের কাঁচ পরিষ্কার রাখে যাতে দেখতে অসুবিধে না হয়।

প্রায় সেইভাবেই চোখের পাতা ওপরে নীচে নেমে পরিষ্কার করছে চক্ষুঃ ত্বকে। একেই বলি আমরা চোখের পাতা ফেলা। মিনিটে তিন থেকে ছ'বার চোখের পাতা ফেলছে উপেন। যখন বেদম হয়ে পড়ি, তখন চোখের পাতা পড়ে আরো বেশীবার। ফলে, কর্ণিয়া অর্থাৎ অচ্ছোদপটল বেশ ভিজে ভিজে এবং ঝকঝকে তকতকে থাকে। চোখের জলের আরও একটা মহিমা আছে। শুধু মনকেই নরম করে না, কর্ণিয়াতে অক্সিজেন বয়ে নিয়ে যায়, জীবাণু হত্যা করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। হত্যাকাণ্ডটা অবশ্য সম্ভব হয় যে ঘাতকের দৌলতে তার নাম লাইসোজাইম। বাইরের জীবাণু যাতে চক্ষুরত্নে বাসা বাঁধতে না পারে—অশ্রু তাই একে দিয়েই ধুইয়ে দেয় কর্ণিয়াকে। অনেকটা কীটনাশক দিয়ে ঘর ধোওয়ার ব্যাপার আর কি।

উপেনের পড়াশুনা আর দিনরাত চোখের কাজ করার ফলে ক্লান্ত আমাকে হতেই হয়। জিরিয়েও নিই যতখানি সম্ভব। উপেন যেই চোখ টিপটিপ করে, মানে চোখের পাতা ফেলে—আমার জিরোনোর সময় কিন্তু ঠিক তখনি। পালা করে আমি আর আমার পার্টনার দুজনেই জিরেন দিই দু' জনকে : আমি যখন শতকরা নব্বইভাগ কাজের দায়িত্ব কাঁধে নিই, পার্টনার তখন জিরোয়। তারপরেই সে তেড়েফুঁড়ে লেগে যায় কাজে—জিরোনোর পালা আসে আমার।

সৃষ্টির দেবতাই আমাকে সুরক্ষিত রেখেছেন নানানরকম ভাবে। রত্ন বলে কথা—নষ্ট হলেই দুনিয়া অন্ধকার। হাড়ের গুহায় এমনভাবে বসিয়ে রেখেছেন আমাকে যে নিচের উঁচু হনু তার কপালের হাড় অটল প্রহরীর মতই পাঁচিল তুলে রক্ষে করে চলেছে আমাকে উপেনের জন্ম থেকে মৃত্যু-পর্যন্ত। নিচে হনু, ওপরে কপালের হাড়। মাঝখানে আমি—বলুন দিকি কত সুরক্ষিত। ধাঁই করে যদি কেউ ঘুসি মেরে দেয় মুখে, ওপর নিচের এই হাড়েরাই চোট সামলে নেয় অনেকটা। হাড়ের কোটরে বাইরে ধাক্কা সোজাসুজি পৌঁছোতে পারে না। অতি-অনুভূতি সচেতন স্নায়ুমণ্ডলীও আমাকে দিয়েছেন সৃষ্টির দেবতা। সেই কারণেই সামান্য একটা ধূলিকণার মতই বাইরের কোনো উপদ্রব সুট করে ভেতরে ঢুকে পড়লেই অমনি চোখ কড়কড় করে ওঠে। আপদ বিদেয় করার জন্যে হৈ-হৈ করে ওঠে স্নায়ুরা —বাঁচিয়ে দেয় আমাকে তোড়ে অশ্রু বইয়ে দিয়ে।

তা সত্ত্বেও বলব ঝঞ্চাট আমার কম নয়। মাঝে মাঝে এমন বিপদে

পড়ি যে কহতব্য নয়। যা দেখছি তাকে ফোকাস করার যন্তরটাই যায় মাঝে মাঝে বিগড়ে—ঠিকমত কাজ করে না। যতটা খারাপ হয়, তার শতকরা ৯৫ ভাগ পর্যন্ত মেরামত করতে পারে চশমা। এর চাইতেও বড় সমস্যা হল অসুখ বিসুখ। একটা বড় গোলমেলে ব্যায়রাম হল জলের পরিমাণ ঠিক না থাকা; হয় খুব বেশী জল ঢুকতে থাকে চোখে, নয়তো খুব কম জল বেরিয়ে যেতে থাকে চোখ থেকে। ফলে চাপ বেড়ে যায়। চোখের স্নায়ুতে রক্তের জোগান কমে আসে। এরই নাম গ্লকোমা।

গ্লকোমা যদি দারুণ ভাবে বাড়াবাড়ি করে, তাহলে দিন কয়েকের মধ্যে জন্মের মত অন্ধ হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অবিশ্যি গ্লকোমার খেলা চলে ধীরে সুস্থে অলস মন্থর চালে। লক্ষণগুলো এত মৃদু-ভাবে প্রকাশ পায় যে ধরাই যায় না। লক্ষণগুলো কি, তাহলে শুনে রাখুন: উজ্জ্বল আলোর চারধারে রঙীন জ্যোতির্বলয়, পাশের দিকের দৃষ্টিশক্তি লোপ, অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার অক্ষমতা, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসা।

উপেনের এখন যা বয়স, তাতে গ্লকোমায় দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি বা একেবারেই অন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে চল্লিশে একবার। চোখের ডাক্তারের কাছে টোনোমিটার নামে একটা যন্ত্র থাকে। চোখের বলের ওপর টোনোমিটার বসিয়েই তাঁরা জানতে পারেন বিচ্ছিরি এই রোগটা আমার হয়েছে কিনা। এবার নিশ্চয় জিজ্ঞেস করবেন, চিকিৎসাটা তাহলে কি? হয় ফোঁটা ফোঁটা ওষুধ দিয়ে—নয় ছুরি চালিয়ে। আমার আরও পাঁচটা হ-বখৎ রোগের একটা হল অ্যাসটিগমেটিজম। এ রোগের ফলে আলোকরশ্মি সঠিক ভাবে রেটিনার ওপর কেন্দ্রীভূত হতে পারে না। কর্ণিয়া বর্তুলের মত থাকে না বলে যা দেখা যায় তা তেড়াবেঁকা মনে হয়। কাঁচের মধ্যে বুদবুদ থেকে গেলে যা হয়, সেই রকম আর কি। এ অবস্থারও মেরামতি হয় চশমার সাহায্যে। এর চাইতেও গুরুতর ব্যায়রাম হল রেটিনা খুলে যাওয়া। রেটিনার দেওয়ালের কাগজ যদি ছিঁড়ে যায় বা ফোস্কাযুক্ত হয়, তখন দেখা যায় আলোর ঝলক, ঝাপসা হয়ে যায় ফুটকি, অথবা যা দেখা হচ্ছে তার মধ্যেই থাকে বিকৃতি। শতকরা আশি ভাগ ক্ষেত্রে শল্য চিকিৎসক ছুরি কাঁচি চালিয়ে দেওয়ালের কাগজকে আগের মত সেঁটে দিতে পারেন।

আমার কর্ণিয়া আর লেন্স দুটোই পুরোপুরি স্বচ্ছ টিশু এবং দুটোই ক্রমে

ক্রমে ঘোলাটে হয়ে গিয়ে অন্ধত্ব এনে দিতে পারে। এ অবস্থায় অন্যের কর্ণিয়া উপেনের ঘোলাটে কর্ণিয়ার জায়গায় বসিয়ে আবার তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু যদি লেন্স ঘোলাটে হতে থাকে তাহলেই ছানি কাটতে হয়। তারপরে লাগাতে হয় পুরু কাঁচের চশমা অথবা কনট্যাক্ট লেন্স।

কপাল ভাল উপেনের এতদিন এই সব ঝামেলায় পড়তে হয় নি। কিন্তু আমার তো বয়স হচ্ছে। উপেনের অন্যান্য দেহযন্ত্রের মত চক্ষুপ্রত্যঙ্গরও তো বয়স বাড়ছে। লেন্সের স্বচ্ছতা কমছে, যে পেশীগুলো লেন্সকে দিয়ে ফোকাস করাচ্ছে তারাও দুর্বল হচ্ছে, ধমনীগুলো আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে আসার ফলে রেটিনাতেও রক্তের জোগান কমছে।

এ সব তো চলবেই। এরই নাম জরা। কিন্তু তাই নিয়ে অনর্থক যেন ভেবে না মরে উপেন। যত ঝঞ্ঝাটই হোক না কেন, যদ্দিন ও বাঁচবে, তদ্দিন ওর দৃষ্টি জুগিয়ে যাওয়ার মত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও সৃষ্টিকর্তা করে রেখে-ছেন আমার মধ্যে।

তবেই না আমার নাম চক্ষুরত্ন !!

কান

উপেন যে কোম্পানীতে কাজ করে, কিছুদিন আগে একটা কমপিউটার কেনা হয়েছে সেখানে। যন্ত্রগণকের যুগ এটা। উপেন নতুন কমপিউটার দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়েছিল এবং বিলক্ষণ তাজ্জবও হয়েছিল। অলৌকিক কাণ্ড দেখানো কমপিউটারের পক্ষে এমন কিছু একটা ব্যাপার নয় ঠিকই। মির‍্যাকলের পর মির‍্যাকল দেখিয়ে চলবে। কিন্তু উপেন কখনো ভেবে দেখেছে কি আমার তুলনায় অমন কমপিউটারও একটা বদখৎ কংক্রিট মিক্সিং মেশিন ছাড়া কিছুই নয়? রাস্তাঘাটে নতুন বাড়ী তৈরীর জায়গায় অমন হোঁৎকা যন্ত্র আপনারা সবাই দেখেছেন। আমার সূক্ষ্মতার তুলনায় উপেনের অফিসের কমপিউটার হল তাই।

হয়ত বলবেন বড় জাঁক হয়েছে আমার। অথবা নিজের কোলে ঝোল টেনে কথা বলছি। কিন্তু সব শোনবার পর বুঝবেন, মিনি যন্ত্র হিসেবে আমার জুড়ি মেলা ভার। ওর শরীরে আর কোথাও এইটুকুর মধ্যে এত জিনিসের ঠাসাঠাসি দেখতে পাবেন না। আমার মধ্যে তড়িৎ প্রবাহের পথ (ইলেকট্রিক্যাল সারকিট) এত রকম এবং এত বেশী আছে যা দিয়ে একটা মোটামুটি বড় সাইজের শহরের সমস্ত টেলিফোন ব্যবস্থাটাই চালিয়ে দেওয়া যায়। এ ছাড়াও আমাকে এক ধরনের অটোমেটিক পাইলটও বলতে পারেন। উপেন যাতে উলটে না পড়ে, তাও দেখতে হয়।

এইবার বলি আমি কে। উপেনের ডান কান আমি। একটা চিনে বাদাম যতখানি, ঠিক ততখানি জায়গার মধ্যে এত কাণ্ড কারখানা করে চলেছি আমি। উপেনের ধারণা ওর চক্ষুরত্নই বুঝি সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ সংজ্ঞাবহ যন্ত্র—ইন্দ্রিয় থেকে মস্তিষ্কে অনুভূতি বহনক্ষম এমন যন্ত্র বুঝি ওর শরীরে আর দুটি নেই। তা সত্ত্বেও বলব আজ যদি আমি আর আমার পার্টনার (উপেনের বাঁ কান) না থাকতাম, তাহলে উপেনকে যে শব্দহীন জগতে আবদ্ধ থাকতে হত চিরটা জীবন—অন্ধত্বর চাইতেও তা অনেক বেশী ভয়ংকর। উপেন আবেগ অনুভূতির ভারসাম্য হারিয়ে ফেলত—সুস্থ মানুষ থাকতে পারত না কখনোই। শব্দজগৎ হারিয়ে বেঁচে থাকা কি

অসীম যন্ত্রণা, উপেন এখনো তা টের পায়নি। তাই আমাকে এত হেনস্থা।

আমার সম্বন্ধে উপেনের ধারণাটা কি রকম এখন শুনুন। আমি নাকি ওর মাথার পাশে শিথিলভাবে ঝুলে থাকা একতাল দেহকোষ—ব্যস তার বেশী কিছু নয়। এতখানি তাচ্ছিল্য করা কি উচিত? বাইরের কানটাকে কান বলেই খালাস হয়ে গেল উপেন, কিন্তু ওটা তো আসলে শব্দ ধরবার একটা ট্রাম্পেট (শিঙ্গা) ছাড়া আর কিছুই নয়। ঠিক যেন একটা পঁ্যাচকে কুলো। তলা দিয়ে চোঙার মত সরু হয়ে গিয়ে এক ইঞ্চি লম্বা একটা নালী নেমে গেছে কানের পর্দায়। যাবার সময় মোচড় খেয়ে নিয়েছে যাতে আমার ভেতরকার সূক্ষ্ম কলকব্জায় বাইরের চোট সরাসরি গিয়ে না লাগে এবং উষ্ণ বাতাসে ভেতরটাও বেশ উষ্ণ আর আরামপ্রদ থাকে।

কান
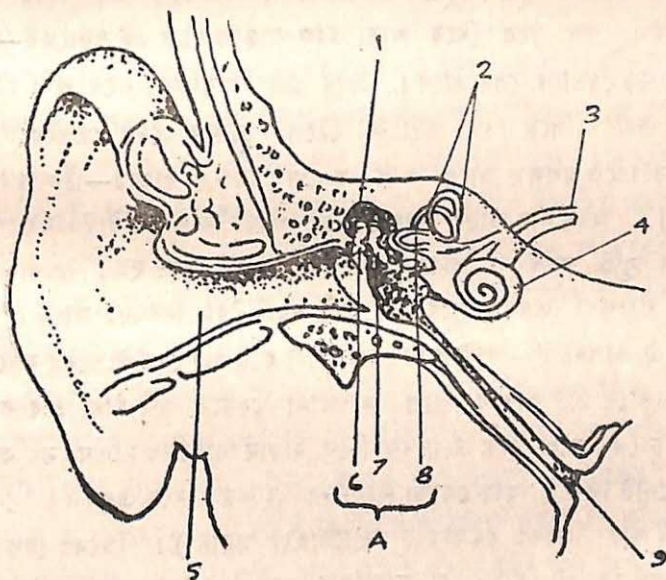
১। কানের পর্দা; ২। অর্ধচন্দ্রাকৃতি নালী; ৩। অডিটরি নার্ভ; ৪। ককলিয়া (ভেতরের কান); ৫। কানের নালীপথ (বাইরের কান); ৬। হাতুড়ি (মাঝের কান—A); ৭। নেহাই (মাঝের কান—A); ৮। জিনের রেকাব (মাঝের কান—A); ৯। ইউসট্যাচিয়ান টিউব (মধ্য-কান থেকে গলা পর্যন্ত নল),

এই নালীর মধ্যেই রয়েছে রাশি রাশি চুল আর চার হাজার কানের খোলের গ্রন্থি। আঠা লাগানো মাছি-ধরা কাগজ পেতে যেভাবে মাছি পাকড়াও করা হয়, এই নালীও সেই রকমের একটা ফাঁদ। বাইরের পোকা মাকড়, ধুলো আর জ্বালা যন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারে এমনি অনেক বিরক্তিকর বস্তুকে দেয় আটকে। আরও আছে। জীবাণু সংক্রমণ থেকেও কানকে রক্ষে করে এই কানের খোল—বিশেষ করে উপেন যখন ঝপাঝপ করে সাঁতার কাটে নোংরা জলে। খোল পরিষ্কার করার বাতিক উপেনেরও আছে। আমার উপদেশ কিন্তু তা নয়। যখন তখন কান খোঁটার দরকারটা কি? সাধারণতঃ বাড়তি খোলকে আমিই ঝেড়ে ফেলে দিই আপনা থেকেই। খোল নিয়ে অত ছুঁচিবাই না থাকলেও চলবে উপেনের।

এবার আসা যাক আমার কানের পর্দায়। খুব শক্ত টাইট একটা পর্দা। আধ ইঞ্চিরও কম চওড়া। কান ঝালাপালা অথবা কানে শুনে মোহিত হওয়ার সবরকম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারবারের শুরু এতটুকু এই পর্দার ওপর থেকেই। শব্দ বয়ে নিয়ে আসা তরঙ্গ আছড়ে পড়ে এই পর্দাতেই—ঢাকে কাঠি পড়ে যেভাবে, সেই ভাবে। এমন কি ফিসফিস করে কথা বললেও ক্ষীণ তরঙ্গ গিয়ে এই পর্দাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দেয় ভেতরে। এক সেন্টিমিটারকে দশলক্ষ ভাগে ভাগ করলে যতটুকু দাঁড়ায়—ঠিক ততটুকুই হয়তো। অকল্পনীয় ভাবে সামান্য এই পর্দার নড়ে ওঠাটাই এমন পর পর ঘটনার সৃষ্টি করে যা ভাবতে গেলেও স্তম্ভিত হতে হয়। দুর্বোধ্য সেই ঘটনা পরম্পরা এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট হয়নি বৈজ্ঞানিকদের কাছে। কিন্তু পর্দার ঐ কাঁপনটাই—স্পষ্ট আর বোধ্য শব্দ হয়ে ধরা দেয় উপেনের মগজে।

কিভাবে ঘটে আশ্চর্য কাণ্ড কারখানা দেখতে যদি চান, তাহলে ঢুকে পড়ুন ঢাকের মধ্যে দিয়ে উপেনের চিনে বাদাম সাইজের মাঝখানের কানে। ছোট ছোট তিনটে হাড় জোড়া লাগানো অবস্থায় রয়েছে এখানে। নেহাই, হাতুড়ি আর জিনের রেকাব (অশ্বারোহীর পাদান)। জিনের রেকাব বা স্টিরাপের মত এই হাড়টাকে ডাক্তাররা বলে স্টেপ। এই তিনটে হাড়ের এ ধরনের নাম হয়েছে হাতুড়ি, নেহাই আর রেকাবের মত দেখতে বলেই। এদের কাজ কানের পর্দার ক্ষুদে কাঁপনকে বাইশগুণ বাড়িয়ে দেওয়া। তারপর সেই বর্ধিত কাঁপনকে রেকাব সংলগ্ন ডিম্বাকৃতি জানলা দিয়ে ভেতর-কার কানে পৌঁছে দেওয়া।

আসল শ্রবণ যন্ত্র হল আমার ভেতরকার কান। ঠিক যেন একটা সুরক্ষিত কেল্লার মত গহ্বর। শরীরে যত হাড় আছে, তাদের সবার চাইতে শক্ত হাড় কুঁদে ভেতরে তৈরী একটা হাড়ের গহ্বর। জলের মত তরল পদার্থে ভর্তি। এর মধ্যে মূল যে অংশটার জন্যে উপেন কানে শুনতে পায়, তার নাম ককলিয়া। শব্দটা ল্যাটিন। মানে, শামুক। ককলিয়াকে দেখতে ঠিক শামুক বা গেঁড়ির মতই। ভেতরে মোচড় খাওয়া শামুকের ভেতরকার মতই। এই মোচড়ের মধ্যে রয়েছে হাজার হাজার অনুবীক্ষণে দেখা যায় এমনি ছোট ছোট চুলের মত স্নায়ুকোষ। প্রত্যেকটা স্নায়ুকোষের কাজ আলাদা—এক একটা বিশেষ কম্পনের সঙ্গেই তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ভাবে নাড়ীর সম্পর্ক। যার যে ভাইব্রেশনে সাড়া দেওয়ার কথা, সে ঠিক সেই ভাইব্রেশন বা কম্পনেই সাড়া দেবে—অন্যের চরকায় তেল দিতে যাবে না। অপূর্ব ডিসিপ্লিন, নয় কি? সৃষ্টিকর্তা কিন্তু নিয়মেই বেঁধে রেখে দিয়েছেন ব্রহ্মাণ্ডের ছোটবড় সব কিছুই। ভাবলেও রোমাঞ্চ হয়।

মাঝখানকার কানের রেকাব যেই ভেতরকার কানের ডিম্বাকৃতি জানলায় 'টোকা' দেয়, সঙ্গে সঙ্গে কম্পন ওঠে জলীয় পদার্থে। উদাহরণ স্বরূপ ধরুন, সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি—এই সপ্তসুরের 'গা' চিহ্নিত হারমোনিয়াম রীড টেপা হল। অমনি ঠিক ককলিয়ার 'গা' চিহ্নিত চুলের কোষ থিরথির করে কেঁপে উঠল। জোয়ার ভাঁটার টানে যেমন সামুদ্রিক উদ্ভিদ দুলে দুলে ওঠে, ঠিক তেমনি ভাবে লিম্ফ্ (লসিকা অর্থাৎ এককোষী জলীয় পদার্থে)য়ের মধ্যে চুলের কোষও দুলে দুলে ওঠে।

এই দোলা থেকে ছোট্ট একটা তড়িৎকণা বিচ্ছুরিত হয়। আমার শ্রবণ সম্পর্কিত স্নায়ুর রসদ জোগায় এই তড়িৎকণা। একটা পেন্সিলের শিষ যতখানি মোটা, আমার এই অডিটরি নার্ভও ঠিক ততখানি ব্যাসের। কিন্তু এর মধ্যে তড়িৎপ্রবাহের পথ আছে তিরিশ হাজারেরও বেশী। তড়িৎকণায় উদ্দীপ্ত স্নায়ু খবর পাঠিয়ে দেয় মাত্র পৌনে এক ইঞ্চি দূরে ব্রেনের মধ্যে। হাজার হাজার তড়িৎ-বার্তা ককলিয়া গ্রহণ করতে পারে এইভাবে—উপেনের বাঁ কানেরও আছে সেই একই ক্ষমতা। স্নায়ুবাহিত তড়িৎ-বার্তার অর্থ বুঝে নিয়ে তাকে বোধগম্য শব্দে রূপান্তরিত করার কাজ কিন্তু ব্রেনের। উপেন তখন শুনতে পায়—মনে হয় শুনছে কানের মধ্যে দিয়ে—আসলে

কান

শুনছে কিন্তু ব্রেনের মধ্যে।

এতক্ষণ শোনাশুনি সম্পর্কে যা কিছু বললাম, সবই বাতাসে তরঙ্গে ভেসে আসা নিয়ে। হাড়ের মধ্যে দিয়ে যে শব্দ যায়, তাও শুনতে পায় উপেন। উপেন কথা বললেই কথার কিছুটা মুখের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আমার পর্দায় ধাক্কা মারে। কিন্তু কথার বাকীটুকু চোয়ালের হাড়ের মধ্যে দিয়ে আমার ভেতর-কানের জলীয় পদার্থে তরঙ্গ তোলে। তাই উপেনের শোনা শ্রোতার শোনার চেয়ে একেবারেই অন্যরকম হয়। এবং এই কারণেই টেপরেকর্ডারে নিজের গলা শুনে চিনতে কষ্ট হয় উপেনের। আর ঠিক এই জন্যেই কড়মড় করে মটর চিবোনোর সময়ে ঝালাপালা লেগে যায় উপেনের কানে।

ভেতর কানের অত্যাশ্চর্য কাহিনীর অতি সামান্য অংশ হল শোনাশুনির ব্যাপারটা। ককলিয়ার ঠিক ওপরেই ছোট ছোট তিনটে জলীয় পদার্থভর্তি অর্ধচন্দ্রাকৃতি নালী আছে। উপেনের ভারসাম্য বজায় রাখার যন্ত্র হল এই তিনটে ফাঁস। একটার কাজ ওপর-নিচ গতির সমতা বজায় রাখা, দ্বিতীয়-টার কাজ সামনে এগিয়ে যাওয়ার ভারসাম্য বজায় রাখা, তৃতীয়টার কাজ পাশের দিকে গতির সমতা ঠিক ঠাক রাখা। উপেন আছাড় খাওয়ার অবস্থায় এলেই আমার একটা কোষের জলীয় পদার্থ স্থানচ্যুত হয়। তাল কেটে গেলেই ব্যাপারটা ধরা পড়ে সেখানকার চুলের কোষের কাছে। হুকুম দেয় পেশীদের টাইট হয়ে গিয়ে উপেনকে আছাড় খাওয়া সামলে নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াতে।

ছোটবেলায় উপেনকে কেউ বাঁই বাঁই করে ঘুরিয়ে দিলে মজা পেত। মজা পেত এইজন্যে যে শেষের দিকে মাথা ঘুরতে থাকত—সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। ব্যাপারটা কি হত এবার বলি শুনুন: নালীপথের জলীয় পদার্থ এত তাড়াতাড়ি স্থানচ্যুত হত যে উপর্যুপরি অত্যন্ত দ্রুত খবরের ভিড়ে ব্রেন বেচারী দিশেহারা হয়ে যেত এত। খবর একা সামলাতে পারত না—একার পক্ষে সম্ভব নয় বলেই। পেশীর ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলত উপেন। জলীয় পদার্থের এইরকম উলটোপালটা স্থানচ্যুতি দীর্ঘক্ষণ ঘটলেই (অনেকটা তরঙ্গে লোফালুফি নৌকোর মত) আমি ওর অন্যান্য দেহযন্ত্রকেও ছেড়ে কথা কইতাম না—জড়াতাম প্রত্যেককেই। উপেন তখন ঘেমে উঠত, বমিও করে ফেলত।

বলতে পারেন যে মুহূর্তে জন্ম, সেই মুহূর্ত থেকেই শ্রবণ শক্তি কমতে শুরু

করেছে উপেনের। যতই আমার টিশুগুলোর স্থিতিস্থাপতকা কমছে, চুলের কোষের অধঃপতন ঘটছে, সংকটজনক জায়গাগুলোয় ক্যালসিয়ম জমা হচ্ছে—ততই বছর বছর কমছে স্পষ্টভাবে শোনবার ক্ষমতা। উপেন যখন শিশু, তখন ওর শ্রবণ ক্ষমতা ছিল ১৬ থেকে ৩০ হাজার কালচক্রের (সাইকেল) মধ্যে। ১৬র খুব নীচে নেমে গেলে নিজের দেহের :কম্পনও শুনতে পেত। সত্যি কথা বলতে কি, নিজের দেহের কম্পনও শুনতে পায় উপেন। আঙুল দিয়ে কানের ফুটো বন্ধ করতে বলুন: গুড় গুড় করে একটা শব্দ ভেসে আসবে কানের পর্দায়। চলতি কথায় সবাই বলে, ঐ শোন্, রাবণের চিতা জ্বলছে! আসলে শব্দটা আসে টান টান আঙুল আর বাহুর পেশী থেকে।

তেরো বছরে পা দিতেই উপেনের শ্রবণক্ষমতার উর্ধ্ব সীমা নেমে এসেছিল বিশ হাজার কালচক্রে (সাইকেলে)। এখন কিন্তু ৮ হাজারের বেশী কিস্সু শুনতে পায় না। ৮০ বছর বয়সে এই ক্ষমতা আরও কমে এসে দাঁড়াবে চার হাজারে! তখন নির্জন জায়গায় কথাবার্তা শুনতে পাবে ভালভাবে, কিন্তু গোলমালের জায়গায় বুঝতে পারবে না কিছুই। মৃদু শব্দ শুনবে ভালোভাবে চড়া শব্দের চেয়ে।

ডেসিবেল মানে হল শব্দ কত চড়া, তা মাপার একক। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডেসিবেল হারায় উপেন। নির্জন ঘরে চারফুট দূর থেকে ফিসফিসানির ডেসিবেলের হার হল ৩০, স্বাভাবিক কথাবার্তা ৬০, জনপ্রিয় পপ গানবাজনা ১২০, এবং বন্দুকের নির্ঘোষ ১৪০। (এর মানে কিন্তু এই নয় যে পপ গানবাজনা স্বাভাবিক কথাবার্তার দ্বিগুণ চড়া। ডেসিবেলের নিপুণ স্কেলে দশ পয়েন্ট বেড়ে যাওয়া মানেই শব্দের তীব্রতা একশগুণ বেড়ে যাওয়া)। এই মুহূর্তে উপেন হারিয়েছে চল্লিশ ডেসিবেল, শোনবার ইন্দ্রিয় চালু আছে ঠিকই, কিন্তু এক কথা একবার শুনে বুঝতে পারে না—আবার বলতে বলে।

আমার মত এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল গড়ন পেটনের মধ্যে গোলমাল ঘটতে পারে অনেক রকমের। পর্দা ফুটো হওয়া তো একটা আকছার ব্যাপার। কিন্তু কপালজোরে বেশীর ভাগ ফুটো আপনা-আপনিই জুড়ে যায়—না গেলে অপারেশন করে মেরামত করা যায়। কানে ঝিঁ ঝিঁ শব্দ শোনা একটা রোগ। নাম, টিন্নিটাস। এ এক বিচ্ছির ঝামেলা। অনেক কারণে এমনি

কান

ঝিঁ ঝিঁ বাজনা শোনা যায় কানে। যাকে বলে কানে ভোঁ লেগে যাওয়া—তাই। কিছু অ্যান্টিবায়োটিক, অন্যান্য ওষুধ, মদ, জ্বর, রক্তসংবহনে পরিবর্তন, শ্রবণ স্নায়ুতে টিউমার—ভোঁ লাগার মূলে এরা তো আছেই—আছে আরো অনেক উটকো উৎপাত।

মধ্য-কানের জীবাণুসংক্রমণ হল আরও একটা উৎপাত। অ্যান্টিবায়োটিক্স আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে তো আপনারা বেঁচে গেছেন—নইলে কত মানুষ এই সংক্রমণের ফলে কালা হয়ে গেছে। উপেনের মধ্য-কান থেকে গলা পর্যন্ত নলটাকে বলে ইউসট্যাচিয়ান টিউব। পালের গোদা হল টিউবটা। জীবাণুদের দিক দিয়ে বলতে গেলে গলা জায়গাটা হল অতিশয় নোংরা জায়গা। ইউসট্যাচিয়ানের ভেতর সুরুৎ করে জীবাণুরা ঢুকে পড়ে মধ্য কানে। ঠাণ্ডা লাগলে উপেন যেন খুব জোরে নাক না ঝাড়ে, গলার নোংরা আমার মধ্যে ঠেলা খেয়ে ঢুকে পড়তে পারে।

মাঝে মাঝে কোনো একটা হাড় বেশী বেড়ে গেলে আমার মধ্য-কানের হাড়ের গতিতে বাধা সৃষ্টি করে। গতি রুদ্ধ হলেই কিন্তু কানে শোনাও আর স্পষ্ট থাকে না। এরই নাম পরিবহণ বধিরতা (কনডাকশন ডেফনেস)। উপেনের ক্ষেত্রেও এই বধিরতা শুরু হয়েছে। কিন্তু এই থেকে সত্যিকারের গুরুতর বধিরতার সম্ভাবনা দশের মধ্যে এক। যদিও বা তাই ঘটে, তাহলে উপেনের সামনে দুটো পথ খোলা থাকবে। হয় হিয়ারিং এইড অর্থাৎ কানে শোনার যন্ত্র লাগাতে হবে ; নয়তো অপারেশন করে ফেলতে হবে।

উপেনের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা সম্ভবতঃ আওয়াজের বাড়াবাড়ি নিয়ে। ও নিজেও জানে যে সব কল কারখানা কারবারের জায়গায় আওয়াজ অত্যন্ত বেশী, সেখানকার খাটিয়ে মানুষদের শ্রবণ ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আজকের পপুলার পপ বাজিয়েরা জগঝম্প বাজিয়ে বাজিয়ে বছর কয়েক পরে হয়ত হিয়ারিং এইড কিনে কানে লাগাবে। এত জানা সত্ত্বেও ওর ধারণা এ-যুগের এই উচ্চনিনাদী হট্টগোলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে ও সক্ষম হবে। কিন্তু পারবে না। নিচু গ্রামের অতিরিক্ত চড়া শব্দ আমার পর্দায় ধাক্কা মারলেই পেশী শক্ত করতে হয় আমাকে। তা না হলে গগন বিদারী সব শব্দই তো ঢুকে যেত কানের ফুটো দিয়ে ব্রেনের ভেতরে। কাণ্ডটা কি হত ভাবতে পারেন ?

উপেনের পূর্বপুরুষদের কিন্তু এত ঝঞ্ঝাট ছিল না। চড়া শব্দ বলতে খুব জোর মেঘের ডাক নয়তো সিংহের গর্জন শুনেছে—তাও নিচু গ্রামে। কিন্তু এ-যুগের জেট প্লেনের ভয়ংকর ভোমরা ডাক, যন্ত্রপাতির খটাখট দুম-দাম শব্দ এবং আরও হাজার হাজার উঁচু গ্রামের শব্দই বারোটা বাজিয়ে ছাড়ছে আমার। একটানা চড়া শব্দ দিয়ে একটা ইঁদুরের ভেতরকার দেহযন্ত্র ধ্বংস করে শেষ পর্যন্ত তাকে মেরেও ফেলা যায়। এই ধরনের একটা এক্সপেরিমেন্ট উপেনের ক্ষেত্রে ঘটলে কি কাণ্ডটা হত কল্পনা করে নিন। কিন্তু উপেন করবেটা কি? করার অনেক কিছুই আছে। অযথা আওয়াজ নিয়ে প্রতিবাদ করতে পারে, অফিস আর বাড়ীর নির্জনতায় থাকতে পারে, বন্দুক ছোঁড়ার সময়ে কানে হাত চাপা দিয়ে থাকতে পারে। উপর্যু-পরি বন্দুক নির্ঘোষে সত্যি সত্যিই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে আমায় সূক্ষ্ম কলকব্জা। ধূমপানটাও বন্ধ করতে পারে—নিদেন পক্ষে কমিয়ে দিতে পারে। নিকোটিন আর কড়া কফি আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভেতরকার কানের ধমনীকে সংকুচিত করে তোলে—পুষ্টির জোগান কমে যায় যে পুষ্টি না পেলে আমি সুস্থ থাকতে পারি না কোন মতেই।

ডাক্তারকে প্রায় চোখ দেখায় উপেন। আমাকেও দেখায় না কেন? এটা কিন্তু আমার দাবী। শব্দহীন জগতের একাকীত্ব যে কি ভয়াবহ দুঃসহ তা যদি কল্পনাও করতে পারে উপেন তাহলে যেন আমার আর পার্টনারের একট যত্ন নেয়।

কান

নাক

উপেনের যত ভাবনা কান চোখ আর পাচনতন্ত্র নিয়ে। আমাকে মনে করে একটা উৎপাত। শীতের দিনে আমি জল ঝরাই, যখন তখন বেমক্কাভাবে হেঁচে ফেলি, ঠাণ্ডায় বুঁজে থাকি, দুর্ঘটনায় ভেঙে থেঁতলে একশা হই। মুখমণ্ডলের অন্যান্য অংশ নিয়ে কত কবি কত রঙীন কথাই না লিখে গেছেন। ঠোঁট কান আর চোখ নিয়ে কত কাব্য রচিত হয়েছে। কিন্তু আমাকে নিয়ে একলাইনও কেউ লেখেনি। আমার মধ্যে নাকি কোনো রোমান্স নেই—আমাকে নিয়ে পদ্য কেন, গদ্যতেও দুটো সুন্দর কথা লেখা যায়না। এতই নোংরার ডিপো আমি। শানপাথরে শানানো নাক ছাড়া ছাড়া নাকের নাকি আর কোনো উপমা হয় না। রাজ্যের হেপাজত ঠেলে মরছি আমি। অথচ সমস্ত মুখমণ্ডলে আমার চাইতে সরল বস্তু নাকি আর দুটি নেই।

এটা কিন্তু অন্যায়। উপেনের দেহে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র। সেই ভাবেই খাতির করা উচিত আমাকে। উপেন নিজেও জানে না কত অসংখ্য কাজ আমি করে চলেছি ওর জন্যে। ধরুন বাঁ পাশ ফিরে শুয়েছে উপেন। একটু একটু করে ফুলে উঠবে আমার বাঁদিকের নাকের ফুটো। ঘন্টা দুয়েক পরেই ওকে না জাগিয়েই নিঃশব্দ সংকেত দিতে থাকব—ফলে পাশ ফিরে শোবে উপেন। এমনিভাবে ওর অজান্তে আপনা হতেই এমন ভাবে ওর নড়াচড়ায় সাহায্য করি যাতে একপাশ ফিরে ঠায় শুয়ে থাকার ফলে সকাল বেলা উঠে পেশী আড়ষ্ট হয়ে না যায়।

উপেন খেতে বসলেই আপনা হতেই খাবার শুঁকি যাতে বাজে বাসি খাবার খেয়ে ওর শরীর খারাপ না হয়—পচা খাবারের বিষ শরীরে ঢুকে না যায়—তাই নিজে বাছবিচার করতে আরম্ভ করে দিই খাবার দেখলেই। তারপর দেখুন না কেন, উপেন খেয়ে যতটা তৃপ্তি পায় তার বেশীর ভাগটাই তো আসে আমার মাধ্যমে। ধোঁয়াওঠা পোলাও শুঁকেই লালাগ্রন্থিগুলোকে নিংড়ে মুখে জল এনে দিই। হজম করার রসগুলো হুড় হুড় করে বার করতে থাকি। উপেন নিজেই তো দেখেছে অসুখে কাবু হলেই আমার ক্ষমতা

নাক
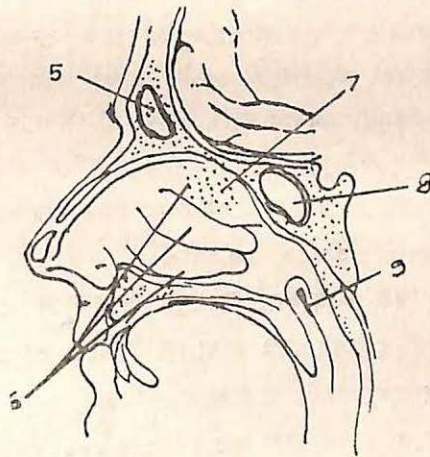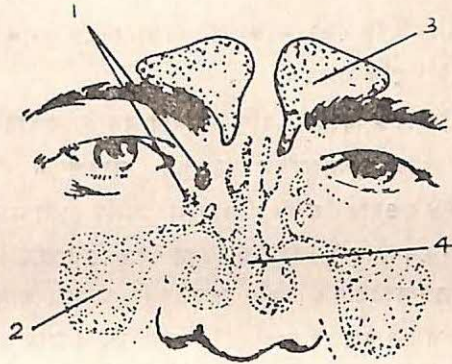
১। এথময়েড সাইনাস; ২। ম্যাক্সিলারী সাইনাস; ৩। ফ্রনট্যাল সাইনাস, ৪। সেপটাম (দুই নাসিকারন্ধ্রের মাঝের পার্টিশান); ৫। ফ্রনট্যাল সাইনাস; ৬। টারবাইনেট্‌স্‌; ৭। অলফ্যাকটরি অঞ্চল (গন্ধেন্দ্রিয় অঞ্চল); ৮। স্ফেনয়েড সাইনাস; ৯। ইউসট্যাচিয়ান টিউবের মুখ;

যদি সাময়িকভাবে নষ্ট হয় (যেমন ঠাণ্ডায় নাক বুঁজে গেলে). খাবারের স্বাদ আর পায় না বেচারী। ক্ষিদে কমে যায়—সেই সঙ্গে ওজন। আমার প্রেরণা না থাকলে উপেন তো হাল্কা খাইয়ে হয়ে যেত। আরও একটা কথা বলে রাখি। উপেনের গলা শুনেছেন তো? কি চমৎকার বলুন তো! যেমন ভরাট তেমনি সুরেলা। এর জন্যে আমাকে একটু ধন্যবাদ দেবেন। অনুরণনের কিছুটা দিই আমি। বেশ তো, নাক টিপে কথা বলতে বলুন না উপেনকে। তফাৎটা হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

গঠন প্রণালীর দিক দিয়ে অবশ্যি আমার বড়াই করার মত কিছু নেই। উপেনের ব্রেন আর মুখগহ্বরের ছাদের মাঝখানে পড়েছি আমি—অনেকটা স্যাণ্ডউইচ হওয়ার মত। আসলে আমি দুটো নাক। কেন না একটা পার্টিশন (সেপটাম) আমাকে দুভাগ করে রেখেছে। ওর মুখগহ্বরের ঠিক ওপরেই পর্বতগহ্বরের মত একটা ভেতরকার কন্দরে আমার কারখানা ঘর। আমার দু'পাশের গালে হাড়ের মধ্যে ছোট ছোট ফাঁপা জায়গা আছে, চোখের ওপরকার হাড়ের মধ্যেও আছে, আর আছে আমার মূল গহ্বরের পেছনে।

এই ফাঁপা খোঁদলগুলোই হল আমার আটটা সাইনাস। কাজ এদের অনেক। বাতাসকে আর্দ্র রাখার ব্যাপারে, কণ্ঠস্বরকে শ্রুতি মধুর করার ব্যাপারে এবং উপেনের করোটিকে একটু হাল্কা রাখার ব্যাপারে এই আটটা সাইনাসের কিছুটা অবদান আছে বইকি। কিন্তু বড্ড ভোগায় এরা। জীবাণু ঢুকে পড়ে সুরুৎ সুরুৎ করে। সংক্রমণ ঘটিয়ে আমার মূল সঙ্কীর্ণ পথটাকে দেয় বন্ধ করে। তখনই উপেন বেচারার মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়। সে যে কি যন্ত্রণা, তা যার হয়েছে, সে জানে।

আমার একটা বড় কাজ হল উপেনের ফুসফুসে যে বাতাস যাচ্ছে তাকে পরিষ্কার আর নাতিশীতোষ্ণ রাখা। সারাদিনে তা প্রায় ধরুন এক ঘরে যতটা বাতাস ধরে, ততটা বাতাসকে পরিষ্কার করে নাতিশীতোষ্ণ করতে হয় আপনাকে। পরিমাণ কত? প্রায় ৫০০ ঘনফুট। কাশ্মীর বেড়াতে গিয়ে গুলমার্গের বরফে খুব তো ছুটোছুটি করছিল উপেন, কনকনে ঠাণ্ডায় শুকনো দিনে বড় মজা লুটেছিল। কিন্তু কনকনে আর শুকনো বাতাসে উপেনের ফুসফুস কি কোনো মজা পায়? আজ্ঞে না, তারা চায় আর্দ্র গ্রীষ্মের দিনে যে রকম বাতাস—সেই বাতাস। আর্দ্রতা থাকবে শতকরা ৭৫ থেকে ৮০। তাপমাত্রা প্রায় ৩৫ সেণ্টিগ্রেড (৯৫ ফারেন-

হাইট)। ওরা চায় বাতাসে একদম জীবাণু থাকবে না, ধুলো ময়লা কালি-ঝুলি, ধোঁয়া বা বিরক্তিকর জ্বালা বা যন্ত্রণা সৃষ্টি করে এমন কিছুই থাকবে না। সুতরাং বাতাসকে ছেঁকে পরিমাণমত আর্দ্রতা মিশিয়ে টেম্পারেচারকে ফুসফুসের চাহিদামত জায়গায় এনে দিতে হয় এই শর্মাকেই। একটা গোটা এয়ারকণ্ডিশনারের কাজ করতে হয় আমাকে। অথচ এতবড় কাজ চলছে মাত্র কয়েক ইঞ্চি লম্বা এয়ারকণ্ডিশনিং সিসটেমের মধ্যে। সে তুলনায় মাঝারি সাইজের ঘরের এয়ার কণ্ডিশনারের সাইজ কি হয় আপনারা সবাই জানেন—ছোটখাট একটা তোরঙ্গ বললেই চলে। আমার পুঁচকে এয়ারকণ্ডিশনারের খবর কি রাখে উপেন?

রাখে না বলেই নাক নিয়ে এত নাকানি চোবানি খেতে হয় ওকে।

বাতাসকে আর্দ্র করি কি ভাবে, এবার তা শুনুন। প্রতিদিন আমার মধ্যে থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে প্রায় দু'পাঁইটের মত আর্দ্রতা বেরোয়। এর বেশীর ভাগই চটচটে মিউকাস। স্পঞ্জের মত লাল ঝিল্লী আছে আমার নাসিকাপথ বরাবর। মিউকাস বেরোয় সেখান থেকে। বাতাস পরিষ্কার করার স্থূল কাজটা সারছে উপেনের নাসিকাগহ্বরের চুল। কিন্তু বড় কাজটা করছে এই চটচটে মিউকাস। চুলের বাধা পেরিয়ে যে সব ধুলো-বালি আর জীবাণু ভেতরে ঢুকে পড়ছে, তারা আটকে যাচ্ছে এই মিউকাসে। আঠা লাগানো কাগজে যে ভাবে মাছি আটকে যায়, ঠিক সেইভাবে। এই জন্যেই মিউকাসের এই পাতলা স্তরটাকে এক জায়গায় জমতে দেওয়া ঠিক নয়। ঘন্টাকয়েকের মধ্যেই আঁস্তাকুড় হয়ে যাবে নাকের ফুটো—তারপর নোংরা ছড়িয়ে পড়বে ফুসফুস এবং অন্যান্য জায়গায়। তাই প্রতি বিশমিনিটে পরিষ্কার এবং নতুন মিউকাসের কম্বল ছড়িয়ে দিতে হয় আমাকে।

বাসি মিউকাসকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যে ঝাঁটাদের ব্যবহার করি, সংখ্যায় তারা অনেক। একটা ফৌজ বললেই পারেন। কিন্তু শুধু চোখে দেখতে পাবেন না—মাইক্রোসকোপ দিয়ে দেখতে হবে। এদের নাম, সিলিয়া। ক্ষুদে ক্ষুদে এই চুলের দল ঝটপট বাসি মিউকাসকে ঝেঁটিয়ে গলায় ঠেলে দেয় গিলে নেওয়ার জন্যে—দিয়েই ফের সিধে হয়ে যায় আগের মত, পেটের কড়া অ্যাসিডে অক্কা পায় বেশীর ভাগ জীবাণুরা। সেকেণ্ডে প্রায় দশবার ঝাঁট দেয় এক একটা সিলিয়া। ক্ষুদে, কিন্তু অক্লান্ত কর্মী। উপেন কিন্তু এদের কোনো খবরই রাখে না। এরা যে আছে এবং দিনেরাতে

সর্বক্ষণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ; সে খেয়ালই নেই। খেয়াল হয় কখন জানেন ? শীতের দিনে। ঠাণ্ডায় আংশিকভাবে পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয় সিলিয়া-বাহিনী। হুড় হুড় করে মিউকাসের বাড়তি উৎপাদন শুরু হয় তখন। আর্দ্রতা তখন ঝেঁটিয়ে বিদেয় হয় না গলার দিকে, টস্ টস্ করে বেরিয়ে সামনে দিয়ে— নাকে জল ঝরে তখনি। বলি, সর্দি লেগেছে রে!

ফাঁদ পেতে জীবাণু ধরা ছাড়াও আরও একটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আছে আমার এইটুকু কারখানার মধ্যে। জীবাণু নামক মহাশত্রুকে বধ করার জন্যে একটা ঘাতক—নাম, লাইসোজাইম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। উপেনের চোখের সংক্রমণ রোধের জন্যে যে জিনিসটা অষ্টপ্রহর খাঁড়া উঁচিয়ে তৈরী, এটাই সেই লাইসোজাইম। অশেষ গুণ এই লাইসোজাইমের। এর জন্যেই তো উপেনের দেহের মধ্যে যে কটা পরিচ্ছন্ন যন্ত্র আছে, তাদের অন্যতম হতে পেরেছি আমিও। এত পরিচ্ছন্ন থাকি এই লাইসোজাইমের দৌলতে যে বেশীর ভাগ নাসিকা-অস্ত্রোপচার শুধু এর ওপর নির্ভর করেই করে ফেলা যায় —জীবাণুনাশকদের ব্যাপক ব্যবহারের খুব একটা দরকার হয় না।

উপেন নিঃশ্বেসের সঙ্গে যে-বাতাস টেনে নিয়ে ফুসফুসে পাঠাচ্ছে, সেই বাতাসকে উষ্ণ রাখাও বড় সোজা কথা নয়। এই গুরুদায়িত্বের বেশীর ভাগটাই সারি আমার ক্ষুদে টারবাইন (টারবাইনেট) দের কৃপায়। টারবাইন যন্ত্রটা হল জল, বায়ু বা বাষ্প চালিত চাকা। আধুনিক বিজ্ঞানের মস্ত অবদান। বিধাতা নামক বড় কারিগর কিন্তু এ জিনিসটাও বানিয়ে রেখেছেন আমার নাকের যন্ত্রঘরে। ছোট ছোট তিনটে হাড় বেরিয়ে আছে আমার প্রতিটি নাকের ফুটোর পাশের দেওয়াল থেকে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়টার দৈর্ঘ্য মোটে একইঞ্চি। আসলে এরা প্রত্যেকেই ক্ষুদে ক্ষুদে রেডিয়েটর—মোটর গাড়ীর যে যন্ত্র ইঞ্জিন ঠাণ্ডা রাখে—তাই। খাড়া করা যায় এমনি টিশু (কলাতন্তু) দিয়ে ঢাকা থাকে এরা। অন্যান্য টিশুর চেয়ে অনেক বেশী রক্তের জোগান থাকে এই টিশুগুলোয়। এই রক্তই হল আমার রেডিয়েটর চালানোর বাষ্প। ছোট ছোট ধমনী থেকেই সাধারণতঃ বইতে থাকে রক্ত, চুলের মত সূক্ষ্ম ক্যাপিলারীর মধ্যে দিয়ে যায় শিরার মধ্যে। আমার টারবাইনেটের মধ্যে ক্যাপিলারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রয়েছে খাড়া-করা-যায় এমনি টিশুদের চৌবাচ্চারা। রক্ত যত ঠেলে ঢুকতে থাকে, ততই ফুলে উঠে আমি—বাতাস উষ্ণ করার জন্যে আরও বেশী করে মেলে ধরি

আমাকে।

আমার আর একটা বিরাট কাজ হল গন্ধ পাকড়াও করা। গন্ধের গোয়েন্দা গিরিও বলতে পারেন। অনেকের মত উপেনও চার হাজার রকমারি গন্ধ চিনতে পারে। প্রাণ জিনিসটা আমার ওপর বড় একটা নির্ভর করে না বলেই আমার অনেক কেরামতি আর নৈপুণ্য প্রকাশই পায় না। ব্যবহারেই আসে না। ধামা চাপা থেকে যায়। ভাগ্য ভাল, উপেন জন্মান্ধ নয়, জন্মবধির নয়। হলে বুঝত আমার মধ্যে কি পরিমাণ ক্ষমতা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তখন তো আর চোখ আর কানের ব্যবহার থাকছে না—তাদের জায়গাতেও কাজ করতে হত এই শর্মাকে। এই নাক দিয়েই উপেন তখন চিনতে পারত কে রাম কে হরি, কোন বাড়ীটা গজেনের আর কোনটা নরেনের, কোন ঘরে তার বউ থাকে, কোন ঘরে থাকে বোন। এ-সবই সম্ভব হত শুধু গন্ধ চিনে আর গন্ধের তারতম্য যাচাই করে। করে দিতাম আমি —এই শ্রীহীন নাসিকাচন্দ্র।

এবার একটা দারুণ প্রশ্ন করতে পারেন। গন্ধকে এভাবে চিনি কিভাবে? প্রশ্নের মত প্রশ্ন করেছেন মশাই। জবাবটাও শুনে রাখুন। আমার প্রতিটা নাকের ফুটোর ওপরের ছাদে ডাকটিকিটের চাইতেও ছোট আকারের এক টুকরো হলদে-বাদামী টিশু আছে। অনেকটা কাপড়ে তালি মারার মত টিশুর টুকরো। এক একটা তালিতে আছে মোটামুটি এককোটি গ্রাহক কোষ। প্রত্যেকটা কোষ থেকে বেরিয়ে আছে ছয় থেকে আটটা অতি ক্ষুদে স্নায়ুময় সংজ্ঞা কেশ (সেন্সরি চুল)। উপেনের ব্রেন এখান থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে। গন্ধ শোঁকার এই ক্ষুদে কলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে ব্রেনের।

এই পর্যন্ত বেশ বোঝানো গেল। কলকব্জার বর্ণনা পর্যন্ত শোনানো গেল। ব্রেনের সঙ্গে গন্ধকোষের কানেকশনটাও বুঝলেন। কিন্তু যে জিনিসটা বোঝানো যাচ্ছে না, তা হল এই: পোলাও গন্ধ শুঁকেই উপেন বোঝে কি করে যে এটা পোলাও ছাড়া আর কিছু নয়? গন্ধ সনাক্তকরণের এই রহস্যটাই আজও স্পষ্ট হয় নি। কতকগুলি থিওরী মানে, তত্ত্ব ছাড়া কিছু জানা নেই। এইটুকু জানি যে যা থেকেই গন্ধ বেরোয়, অর্থাৎ যে জিনিসকে শোঁকা যায়—তাদের প্রত্যেকের মধ্যে থেকে অণু (মলিকিউল) নিক্ষিপ্ত হয়। গরম রশুনের ঝোল থেকে এরা

নাক

ছিটকে বেরোয় প্রচুর পরিমাণে—ঠাণ্ডা ইস্পাত থেকে বলতে গেলে কিছুই বেরোয় না। আর একটা থিওরী অনুসারে আমার গ্রাহক কেন্দ্ররা রকমারি মলিকিউলদের চেহারা আর সাইজের তফাৎ ধরতে পারে। তফাৎটা যে কোনো ভাবেই হোক নথিভুক্ত হয়ে যায়। বিচ্ছুরিত হয় একটা ক্ষুদে তড়িৎকণা—পৌঁছোয় ব্রেনে। তড়িৎ সংকেতটার সঙ্গে পূর্ব পরিচয় থাকে ব্রেনের। পাওয়া মাত্র চিনে নেয়। রায় দেয় তৎক্ষণাৎ: মাংসের কোর্মা। কখনো বলে, গোলাপফুল। আবার কখনো, পচা চিংড়ি।

আসলে কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই এত সোজা নয়। রঙ চেনার ক্ষেত্রে যেমন তিনটে প্রাথমিক রঙ আছে, হতে পারে গন্ধ চেনার ক্ষেত্রেও হয়ত এমনি তিনটে প্রাথমিক গন্ধ আছে। চিত্রশিল্পী প্যালেটে প্রাথমিক তিনটে রঙ মিলিয়ে মিশিয়ে যেমন অজস্র রঙ বানাতে পারে, তেমনি ভাবেই হয়ত ব্রেনের কোনো প্যালেটে এই তিনটে প্রাথমিক গন্ধকে মিলিয়ে মিশিয়ে অজস্র গন্ধের সৃষ্টি হয়ে চলেছে। গন্ধ সমারোহ চলছে। কিন্তু চিনে নিচ্ছে ঠিক গন্ধটিকে। বিশেষ কোনো গন্ধে অভিভূত হয়ে পড়ার কিছুক্ষণ পরে সে গন্ধ-টিকে কিন্তু আর টের পাই না। উপেনের বউ তো এন্তার দামী দামী সেন্ট মাখে। গায়ে কাপড়ে ঢালবার সময়েই মন মেতে যায় প্রথমবার—তারপর কি আর টের পায় মন মাতানো আতরের সৌরভ? পায় না। চামড়ার কারখানায়, গঁদের কারখানায় বা কেমিক্যাল কারখানায় উপেন যদি কাজ পেত, চামড়া, গঁদ আর কেমিক্যালের গন্ধে প্রথম প্রথম যতটা উত্যক্ত হত, পরে আর হত না। সয়ে যেত বিশেষ বিশেষ চড়া গন্ধগুলো। মাছের আড়তে প্রথমে ঢুকলে আপনি যে আঁশটে গন্ধ পাবেন, রোজ বসে থাকলে সে গন্ধ আর পাবেন না। গন্ধ সয়ে যাবে। সে গন্ধ সয়ে গেলেও অন্য গন্ধ চেনবার ক্ষমতা কিন্তু লোপ পাবে না। সংজ্ঞাকেন্দ্র সচেতন থাকছে সব সময়েই। মাছের আড়তে বসে জুঁইয়ের গন্ধে মন মেতে উঠবেই। এ-এক আশ্চর্য রহস্য। আজও অব্যাখ্যাত।

উপেনের শরীরে যে কটা যন্ত্র বাইরের জগতের দিকে খুব বেশী মেলে রয়েছে, মানে ঢাকাঢুকি নেই—খোলামেলা—আমি তাদের অন্যতম। কাজেই রাজ্যের অসুখ বিসুখ যে আমার মধ্যে বাসা বাঁধবে, এ আর আশ্চর্য কি। অজস্র রোগের টার্গেট যেন আমি। আমার তরুণাস্থি অর্থাৎ কার্টিলেজকে আক্রমণ করে চেহারা পালটে দিতে পারে কিছু জীবাণু। ঝিল্লী থেকে

একরকম ছোট টিউমার গজায়। এদের বলে পলিপাস। ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে এরা কখনো থাকে মটর দানার মত ছোট্ট, কখনো হয় আঙুরের মত বড়। কখনো ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। নাকের ঝিল্লীতে পলিপাস গজিয়ে বাতাস যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দিয়ে হরেক রকম উপদ্রব সৃষ্টি করলেও করতে পারে।

কোনো বস্তুবিশেষের প্রভাবে দেহের সংবেদনশীল বৈশিষ্ট্যের আকস্মিক প্রকাশকে বলা হয় অ্যালার্জি। কারো দুধ সয় না, কারো মাংস। এমন কি কিছু ছুঁলে, বা ঘ্রাণেও কারো কারো নানা রোগের উপসর্গ প্রকাশ পায়। যাদের জন্যে এই কাণ্ড ঘটে তাদের বলা হয় অ্যালারজেন। দেখা গেছে এই ধরনের অ্যালারজেন, তামাকের ধোঁয়া আর ধুলোর সংস্পর্শে এলেই প্রদাহ ঘটে আমার মিউকাস ঝিল্লীতে। ফুলে ওঠে ঝিল্লী। অতিরিক্ত মিউকাস বেরিয়ে গলায় গিয়ে পড়ে। এই হল গিয়ে নাকের পেছন দিক দিয়ে জল ঝরা। বাতাস যাতায়াতের পথও ঠাণ্ডা লেগে প্রদাহের ফলে ফুলে উঠে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। উপেন তখন প্রচণ্ড জোরে নাক ঝেড়ে নিঃশ্বেস নেওয়ার পথ পরিষ্কার করার চেষ্টা করে। কাজটা কিন্তু অতীব বিপজ্জনক। ধাক্কা খেয়ে সংক্রমণ ঢুকে পড়তে পারে আমার সাইনাসে অথবা ইউসট্যাচিয়ান টিউবের মধ্যে দিয়ে আমার মধ্যকানে। অথবা এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্যে ওষুধের ফোঁটা দিয়ে নাসিকা পথ সরল করার বদভ্যেস শুরু করতে পারে। টিশুকে সংকুচিত করে এই ওষুধ— 'নোজ ড্রপ'। উপেনকে হুঁশিয়ার করে দিই—এই বদভ্যেসের মধ্যে যেন কখনোই না যায়। ওষুধের ফোঁটায় 'প্রতিঘাত' প্রতিক্রিয়া হয়। ঠিকরে ফিরে আসে আগের অবস্থা—আরো বেশী তেজে। সাময়িকভাবে টিশু সংকোচনের ফলেই আগের চাইতেও বেশী ফুলে ওঠে ঝিল্লী। বিশেষ-জ্ঞরা এই কারণেই 'নোজ ড্রপ' নামক ক্ষতিকারক ওষুধের ফোঁটা দেখলেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। এতে সমস্যার সুরাহা হয় না—আরো জটিল করে তোলে।

উপেনের এখন যা বয়স, আমার প্রখরতা একটু একটু করে কমছে। আগে কফির গন্ধে মন মাতোয়ারা হত, আজকাল আর তেমন হয় না। আগে বিকট গন্ধে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়ত, আজকাল নির্বিকার হয়ে গেছি। এ সবই কিন্তু খুবই স্বাভাবিক। মানুষের জীবনে এই অবস্থা একটু

অসুবিধের সৃষ্টি করে ঠিকই। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। উপেনের শেষ নিঃশ্বেসটাকে পর্যন্ত উষ্ণ রেখে যাব আমি এবং সেইটাই আমার আসল কাজ। আমাকে এত হেনস্থা করা হয়েছে বলেই শেষকালেও বলে যাব, এই রঙ, শব্দ আর বর্ণের জগতে উপেনের শেষের দিনগুলোতে ওর সাধের চোখ আর কান যেভাবে যতটা সেবা করবে, তার চাইতে অনেক ভালোভাবে অনেক বেশী সেবা করে যাবো আমি, এই শ্রীহীন নাসিকাচন্দ্র!

চামড়া

সসেজ দেখেছেন? খুব পাতলা চামড়া দিয়ে মোড়া থাকে। উপেনের ধারণা আমিও সসেজের মোড়কের মত একটা মোড়ক ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার নাকি কোনো গুরুত্বই নেই। যেন একটা নিষ্প্রাণ নিরেট পার্চমেন্ট কাগজ—কিন্তু আমার আশা কম নয়। আমাকে রোজ সকালে কামিয়ে সাফ রাখতে হয়—নইলে দাড়ির জঙ্গলে মুখ ঢেকে যায়। স্নান করতে হয়—নইলে গায়ে গন্ধ হবে। তেল মাখাতে হয়—নইলে গা ফাটবে। চুলকোতেও হয় যখন তখন—নইলে তিষ্ঠোনো যাবে না। উপেন তো অনেক ভুল ধারণা নিয়েই রয়েছে। আমি সেই সবের একটি। উপেন জানে না আমি ওর কাছে কতখানি। আমাকে ওর একান্তভাবেই দরকার। আমি বিনে উপেনের অস্তিত্ব সম্ভব কি? চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে দেখুন না অবস্থাটা কি দাঁড়ায়।

উপেন স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না ওর জন্যে নিত্য কত কাজ করে চলেছি আমি। আমিও যে জটিল সূক্ষ্ম রাসায়নিক জিনিসপত্র প্রস্তুত করতে পারি—উপেন তা জানে না - ভাবতেও পারে না। চামড়ার দৌড় আর মোল্লার দৌড় বেশীদূর হতে পারে না—এই রকম অপমানকর ধারণা ওর আছে আমার সম্বন্ধে। কিন্তু আমি সত্যিই সূক্ষ্ম কেমিকাল ম্যানুফাকচার করি। সেদিক দিয়ে কেমিক্যাল তৈরীর একটা কারখানা বলতে পারেন আমাকে। একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা রোজ উৎপাদন করি—তার খবর আপনিও রাখেন—ভিটামিন ডি। উপেনের অণ্ডকোষ থেকে টেসটোসটেরন নামে যে যৌন হরমোন তৈরী হয়ে চলেছে—তাকে সক্রিয় রাখি। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণও করতে হয় আমাকে। জলকে ধরে রাখতে হয় ভেতরে—না রাখলে পটল তুলতে হত উপেনকে। বাইরের জলকেও ভেতরে ঢুকতে দিই না আমি তাই ঘন্টার পর ঘন্টা সাঁতার কেটেও জলে টইটুম্বুর হয়ে ফুলে ওঠে না উপেন। আমার জটিল স্নায়ুতন্ত্রের দৌলতেই চক্ষের নিমেষে খবর পৌঁছে যায় উপেনের ব্রেনে যে তার ব্যথা লেগেছে, কোনো কিছু ছুঁয়ে ফেলেছে, গরম লাগছে কি শীত করছে। আমাকে বলা হয় উপেনের 'সীমান্ত' অঞ্চল।

তা না বলে 'দুর্গপ্রাচীর' বললেই বোধহয় সমীচীন হত। কেন না, পালে পালে মারাত্মক শত্রুদের (জীবাণু) হানা আমিই আটকে দিই—আমার ওপরেই তারা এসে নামে, বাসাও বাঁধে—কিন্তু দুর্গের ভেতরে ঢুকতে দিই না।

চেহারায় আমি অনেকরকম। কখনো আমি উপেনের হাত-পায়ের আঙুলের নখের চেহারা নিচ্ছি, আবার সেই আমিই কড়া পড়ছি ওর পায়ের চেটোয়, কখনো হচ্ছি আঁচিল। আমার তিনটে স্তর ঃ বাইরে যে আছে, তার নাম এপিডারমিস, মাঝখানে ডারমিস, তার নিচে সাবকিউটানিয়াস টিশু।

উপেনের শরীরে বেশীর ভাগ জায়গাতেই আমার বাইরের স্তরটা কাগজের মত পাতলা। আঙুল পুড়লে উপেন নিজেই দেখে নেবে'খন। দেখবে ফোস্কার ওপর স্বচ্ছ এপিডারমিস টিশুকে। পায়ের কড়াকে ক্ষুর দিয়ে কাটুক না উপেন, একটুও রক্ত পড়বে না। এপিডারমিসে রক্তের জোগান তো থাকে না। কোষদের পুষ্টি দেওয়া হয় নিচ থেকে।

সাপ খোলস ছাড়ে নাটকীয়ভাবে—আমি এপিডারমিস নামক খোলস ত্যাগ করি আস্তে আস্তে বিরামবিহীনভাবে। প্রতিদিন এপিডারমিসের লক্ষ লক্ষ শিশুকোষ এপিডারমিসের একদম নিচ থেকে জন্ম নিয়ে একটু একটু করে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে ওপর দিকে। যতই ওপরে ওঠে ততই পাল্টে যায় তাদের বস্তু। জেলীর মত থকথকে কোষগুলোই আস্তে আস্তে শক্ত শিঙের মত কেরাটিন হয়ে দাঁড়ায়। হারপিস নামক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিতে কোষের চেহারা যেরকম দাঁড়ায়, আমার শিঙের মত কঠিন কেরাটিন স্তরেও থাকে সেই ধরনের চ্যাপ্টা কোষ—মরা কোষ—জ্যান্ত কেউ নয়। বাইরের এই বৈরী দুনিয়ার মুখোমুখি হয়ে দুর্বল জীবন্ত কোষ কি জ্যান্ত থাকতে পারত? উপেন যখন স্নান করে, তখন লক্ষ লক্ষ এমনি মরা কোষ জলের সঙ্গে ধুয়ে যায়। অথবা জামাকাপড়ের ঘসটানিতে উঠে যায়। রোজই ঘটছে এই ঘটনা। ফলে, ২৭ দিন অন্তর বাইরের চামড়া নতুন হয়ে যাচ্ছে উপেনের। এই কোষেদের আয়ুই হল ২৭ দিন—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। মোটামুটি বলতে গেলে ২৭ দিনে একবার খোলস পালটাই আমি!

আমার একদম নিচের স্তরটার নাম আগেই বলেছি—সাবকিউটানিয়াস।

এটা হল গিয়ে আমার চর্বির স্তর। দেহযন্ত্রের কাজকর্ম দেখাশুনা নিয়ে এর খুব একটা মাথাব্যথা নেই। বাইরের চোট নিজের ওপর দিয়ে খানিকটা সামলে নিয়ে ভেতরকার দেহযন্ত্রের ওপর ধাক্কার তীব্রতা একটু কমিয়ে দেয় চর্বির এই স্তর, শরীরের তাপমাত্রাকেও উড়ে যেতে দেয় না চট করে—ধরে রেখে দেয় ভেতরে, দেহের খাঁজ-টাঁজগুলোকে রমণীয় করে তুলতেও সাহায্য করে যথেষ্ট—মেয়েদের ক্ষেত্রেই যার গুরুত্ব অনেক বেশী—পুরুষদের চেয়ে। কিছু বিশেষজ্ঞ আমার এই স্তরকে একেবারেই আমল দিতে চায় না; সাবকিউটানিয়াস শব্দটার মানেই তো যা থাকে চামড়ার তলায়। সুতরাং তাকে চামড়া বলে মানা হবে কেন?

চামড়া
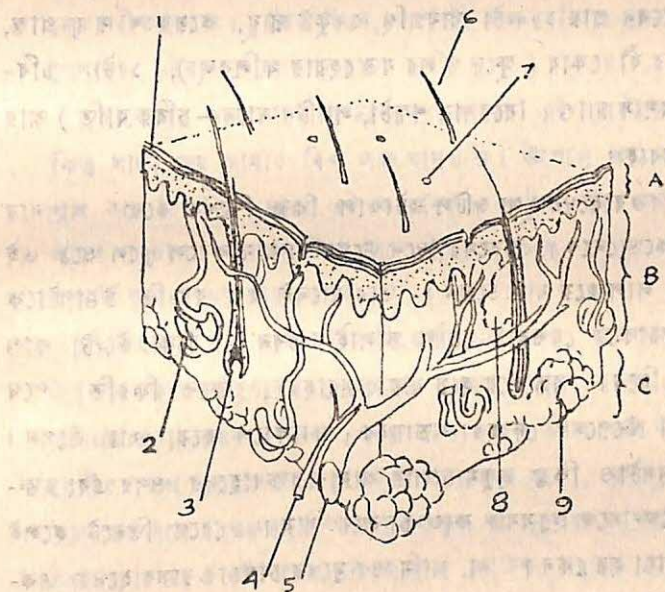
১। কেরাটিন; ২। ঘর্মগ্রন্থি; ৩। হেয়ার ফলিকল (চুলের বীজকোষ); ৪। স্নায়ু; ৫। রক্তনালী; ৬। চুল; ৭। ঘর্মগ্রন্থির খোলা মুখ; ৮। সিবেসাস গ্ল্যাণ্ড (চর্বিগ্রন্থি); ৯। চর্বি; A—এপিডারমিস; B—ডারমিস; C—সাবকিউটানিয়াস টিশু;

এবার আমার শক্ত 'চামড়া' অথবা ডারমিস-য়ের দিকে একটু কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। ধন্য হব আপনার নেকনজরে। বড় অবহেলা করেন তো আমাকে। কি দেখছেন? আসলে একটা খুব শক্ত অথচ স্থিতিস্থাপক লেফাপা বলতে পারেন এই ডারমিসকে। চর্বি থেকে আরম্ভ করে রক্তবাহ পর্যন্ত সব কিছুকেই ধরে রেখে দিয়েছে মহাশয় এই ডারমিস—ফুলে ঠেলে উঠতে বা পড়ে যেতে দিচ্ছে না। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্নায়ুর জটাজাল রয়েছে এই ডারমিসে, আছে রক্তবাহ আর অনেক রকম গ্লাণ্ড। উপেনের দেহের এক-এক জায়গায় এদের এক-এক রকমের মিশেল—সব জায়গায় সমান অনুপাতে কেউ নেই। কিন্তু যে কোনো জায়গাতেই গড়পরতায় এক বর্গ সেন্টিমিটার জায়গা যদি বেছে নেন, তাহলে দেখবেন এলাহি ব্যাপার। এক বর্গ সেন্টিমিটার জায়গা কতখানি বুঝেছেন? উপেনের কড়ে আঙুলের নখ যতখানি—ঠিক ততখানি। এক ইঞ্চির আটভাগের একভাগ পুরু এইটুকু জায়গার মধ্যে আপনি দেখবেন প্রায় ১০০ টা ঘামগ্রন্থি, ১২ফুট স্নায়ু, কয়েক শ' স্নায়ু প্রান্ত, দশটা চুলের বীজকোষ (ক্ষুদে থলির মত হেয়ার ফলিকল্), ১৫টা চর্বি-গ্রন্থি (সিবেসাস গ্ল্যাণ্ড: সিবেসাস শব্দটা, ল্যাটিন মানে—চর্বির বাতি) আর তিনফুট রক্তবাহ!

আমার রক্তবাহদের সূক্ষ্ম জটিল জটাজাল কিন্তু বিশেষ করে আপনার কৌতূহল কেড়ে নেবে। গরমের দিনে উপেন ব্যায়াম করলে ফুলে ওঠে এই রক্তবাহরা; লাল হয়ে যায় উপেন। তার মানেই হল বাড়তি উত্তাপটাকে বাইরে বিদেয় করে দেওয়ার চেষ্টা চালাই তখন। ঠিক উল্টো কাণ্ড ঘটে শীতের দিনে। বন্ধ হয়ে হয়ে যায় রক্তবাহরা; রক্তকে ফিরতি পথে পাঠিয়ে দেয় উপেনের দেহের অভ্যন্তরে; ফ্যাকাশে হয়ে যায় উপেন। আবেগ জিনিসটাও কিন্তু হুকুম চালায় আমার রক্তবাহদের ওপর এবং রক্ত-বাহরাও সঙ্গে সঙ্গে হুকুমমত কাজ চালিয়ে যায়। রেগে তিনটে হলেই উপেন রক্তরাঙা হয় কেন? না, আমি ওর মুখের চামড়ার রক্তবাহদের এক-সঙ্গে খুলে দিই। আবার ভয়ে কুঁকড়ে গেলেই বন্ধ হয়ে যায় এরা, তখন কিন্তু হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে উপেনের।

ঘাম উবে গেলে যে দেহ জুড়িয়ে যায়, এটা একটা খবরই নয় আপনার কাছে। কিন্তু ঐটুকু বলার মধ্যে আমার জটিল শীততাপ নিয়ন্ত্রণের পুরো কাহিনীটা তো বলা হল না। দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা হল ৩৭ ডিগ্রী

সেণ্টিগ্রেড (৯৮.৪ ফারেনহাইট)। দিন না বাড়িয়ে এই বডি টেম্পারেচার ; মাত্র কয়েক ডিগ্রী বাড়লেই আর দেখতে হবে না—অক্কা পাবে উপেন। এই সর্বনাশটা এড়োনোর জন্যেই তো উপেনের সমস্ত শরীরের ১৮ বর্গফুট চামড়ার ওপর দিয়ে আমি বিশলক্ষ ঘাম-গ্রন্থি সাজিয়ে রেখেছি। খুব টাইট করে পাকানো ছোট ছোট টিউব—গভীরভাবে গেঁথে রয়েছে ডারমিসের মধ্যে ; এ থেকে এক ইঞ্চির এক পঞ্চমাংশ লম্বা একটা সরু নল উঠে গেছে চামড়ার ওপরে। সরু আর ছোট্ট হলে কি হবে, সবশুদ্ধ ছ'মাইল লম্বা হবে নল-গুলোকে পর-পর জুড়ে গেলে।

ঘামগ্রন্থিদের কাজের কিন্তু বিরাম নেই বললেই চলে। প্রায় একটানা খেটেই চলেছে বেচারারা। রক্ত থেকে জল, লবণ আর আবর্জনা নিষ্কাষণের কাজ। যেদিন গরম তেমন নেই, গা জুড়িয়ে যাচ্ছে মলয় বাতাসে, সেদিনও উপেন টের পায় না ঘামগ্রন্থিরা আধপাঁইটের একটু কম জল বার করে দেয় শরীর থেকে। কিন্তু দিনে ১২ পাঁইট জল বেরিয়ে যেত উপেন যদি পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড় হত।

আবেগের ধার ধারে না উপেনের সাধের এই শরীরের অনেকেই—কিন্তু সাড়া দেয় আমার বিশ লক্ষ ঘামগ্রন্থি। উদ্বেগে কাঠ হয়ে গেলেই কুল কুল করে ঠাণ্ডা ঘাম ছাড়ে এই কারণেই। ঝটপট উবে যায় বলেই ঠাণ্ডা লাগে ঘামটা। ভয়ে সিঁটিয়ে গেলে হাতের তালু ঘেমে যায় ঘামগ্রন্থিদের বাড়তি ঘাম উৎপাদনের জন্যেই।

চর্বিগ্রন্থি অর্থাৎ আমার এই সিবেসাস গ্ল্যাণ্ডদের কাজকর্ম সত্যিই কতটা উপকার করছে উপেনের, সে সম্বন্ধে একটু সন্দেহ অবশ্য থেকে যাচ্ছে। সংখ্যায় এরা কয়েক লক্ষ। একমাত্র কাজ হল তরল তেল উৎপাদন। এদের বেশীর ভাগ লেগে থাকে চুলের বীজকোষের সঙ্গে, মানে, হেয়ার ফলিক-ক্‌ল্-য়ের সঙ্গে। গুরুত্বপূর্ণ কাজটা হল চুল বা চুলের আশপাশের চামড়াকে তৈলাক্ত রাখা। উপেনের পূর্বপুরুষেরা আদিম অবস্থায় যখন লোমশদেহী ছিল, তখন হয়ত এই চর্বিগ্রন্থিদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। চামড়া আর চুল তৈলাক্ত রাখা মানেই তাদের জল নিরোধক করে তোলা। উত্তাপ সংরক্ষণের ক্ষমতাকেও বাড়িয়ে দিত এই পন্থায়। কিন্তু এযুগে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে এরা—এই চর্বিগ্রন্থিরা।

হরমোনের ভারসাম্য একটু নষ্ট হলেই আমার চর্বি-গ্রন্থি থেকে চর্বি

চামড়া

বেরোতে থাকে হুড়-হুড় করে। মুখ বন্ধ হয়ে যায় এর ফলে। ছোট ছোট কালো ফুটকি দেখা যায় চামড়ায়। গ্রন্থি যদি ফেটে যায়, তাহলেই দেখা যায় ব্রণ—কিশোর কিশোরীদের কাছে যা একটা ছোটখাট বিভীষিকা।

এবার শুনুন আমার চুল উৎপাদনের কাহিনী। আগেই বলেছি আমার প্রতিবর্গ সেন্টিমিটারে দশটা চুলের বীজকোষ আছে। প্রত্যেকটা শেকড় থলির মত—চামড়ার গভীরে ঢুকে বসে থাকে। মাথা দিয়ে কিন্তু লম্বা অংশ বেরিয়ে যায় চামড়া ফুঁড়ে। মজা কি জানেন, উপেনের বউয়েরও চামড়াতেও প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে আছে দশটি করে চুলের বীজকোষ। সংখ্যায় একই, কিন্তু যে চুল গজায় সেই বীজকোষ থেকে, তা এমনই মিহি আর হাল্কা রঙের যে প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। অনবরত চুল গজিয়ে চলেছে বীজকোষেরা, মরা কোষগুলোকে ঠেলে বার করে দিচ্ছে চামড়ার ওপরে।

এ ছাড়াও আমার আছে লক্ষ লক্ষ কোষ যাদের নাম মেলানোসাইট। মেলানিন নামক রঞ্জক পদার্থ উৎপাদন করে এরা। এরই প্রসাদে উপেনের চুলের চামড়ার চোখের রঙ নির্ণীত হয়। সাদা কি কালো চামড়ার মানুষ শুধু এই মেলানিন কম বেশী থাকার জন্যেই—আর কোনো তফাৎ নেই। মেলানিনের ঘাটতিওলা মানুষ বা জন্তুকেই বলা হয় অ্যাল-বিনো—অর্থাৎ অস্বাভাবিকভাবে শ্বেতকায় ও শ্বেতকেশ এবং রক্তাভচক্ষুর তারাবিশিষ্ট ব্যক্তি বা জন্তু। সূর্যরশ্মির বিপজ্জনক অতি-বেগুনি রশ্মিকে (আলট্রা ভায়োলেট রে) আটকে দেয় এই মেলানিন নামক অতি-নিরীহ রঞ্জক পদার্থটি। এই কারণেই রোদ্দুরে টো-টো করে দু'একদিন অ্যাড-ভেঞ্চার করে আসার পর দেখা যায় উপেনের এপিডারমিসের নিচ থেকে আমার এই রঞ্জক-দানা ঠেলে উঠছে ওপর দিকে। রোদ্দুরে পুড়ে ঝামা হওয়া অথবা তামাটে হওয়ার কারণ হল এইটাই। আসলে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মিকে আটকে দিল ঘনীভূত মেলানিন। কি সুন্দর ব্যবস্থা বলুন তো?

আমার স্নায়ুমণ্ডলীর জটাজাল দেখলে কিন্তু মাথা ঘুরে যাবে আপনার। উপেনের আঙুলের ডগাতেই কেবল প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে আছে কয়েক হাজার সংজ্ঞাবহ (সেনসরি) স্নায়ুপ্রান্ত। আলপিন ফুটিয়ে দিন বুড়ো

আঙুলে, ছ্যাঁকা দিন হাতের আঙুলে, ক্ষুর দিয়ে সামান্য চিড়ে দিন গায়ের যে কোনো জায়গা—অমনি বিপদ সংকেত দেব আমি। ঠাণ্ডায় হি-হি করে কাঁপতে থাকলেও আমার ঠাণ্ডা-গ্রাহকরা খবরটা জানিয়ে দেবে ব্রেনকে। সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ করে দেবে উপেনের পেশীর রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে, ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকবে বেচারা—কাঁটা দেবে গায়ে। চামড়ায় ঢেউ তুলিয়ে ছাড়ে এই ক্ষুদে চুলের বীজকোষের ক্ষুদে পেশীরা। ক্ষুদে পেশীর আসল কাজ ছিল কিন্তু চুলকে খাড়া করিয়ে দেওয়া—লড়াইয়ের সময়ে শরীরকে আরও ভালোভাবে আগলানোর জন্যে, ঠাণ্ডায় দেহে আরও উত্তাপ জোগানোর জন্যে। এ যুগে কিন্তু ঠিক এই কাজটাই ক্ষুদে পেশীরা করে চলেছে উপেনের কুকুরের চামড়ায়—উপেনের চামড়ায় নয়।

উপেনের বয়স এখন ৪৬। আমার গায়ে ছাপ পড়েছে বয়েসের। মজা কি জানেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাতলা হয়ে যাই আমি। আরও স্বচ্ছ হই। এই কারণেই বয়স্কদের হাতের শিরা অত স্পষ্ট দেখা যায়। আমার নিচের চর্বির স্তর উধাও হয়—কুঁচকে যায় চামড়া—দেখা যায় বলি রেখা, চামড়ার সেই স্থিতিস্থাপকতা আর থাকে না। চোখের নিচে থলির আবির্ভাব ঘটে, ঝুলে পড়ে চোয়ালের চামড়া।

আমার সবচেয়ে বড় বিপদ ক্যানসার। অতিরিক্ত মাত্রায় রোদ্দুর লাগলে, চামড়া যে শুধু অকালেই বুড়িয়ে যায় তা নয়, ক্যানসারে আক্রান্তও হয়। তার মানে এই নয় যে চামড়ার ক্যানসারের কারণ শুধু রোদ্দুরে ঝলসে-যাওয়া—কারণ আরো অনেক আছে। রোদ্দুরে যারা বেশী ঝলসায় চামড়ার ক্যানসার তাদেরই বেশী হয় দেখা গেছে। কপাল, নাক আর কান—এই তিনটে জায়গা ক্যানসারের বড় প্রিয় জায়গা। তবে একদিক দিয়ে আমার কপাল ভাল। চামড়ার ক্যানসার সেরে যায় খুব বেশী। মেরেও ফেলতে পারে। কাজেই উপেন যেন চামড়ার যে কোনো অস্বাভাবিক বাড় দেখলেই হুঁশিয়ার হয়—বিশেষ করে যে ক্ষত দিয়ে রক্ত ঝরে এবং সারতে চায় না কিছুতেই।

এবার উপেনকে একটা প্রশ্ন করা যাক। আমার জন্যে কিছুই কি করতে পারে না উপেন? জবাব আমিই দিচ্ছি। রোদ্দুরে বেশী মাত্রায় আমাকে যেন মেলে না ধরে উপেন। এই একটা কাজ করলেই কৃতার্থ

হব আমি। এমন কি চড়া রোদ্দুরে খেলাধুলো বা ঘুড়ি ওড়ানোর সময়েও যেন টুপি দিয়ে ঢেকে রাখে চাঁদ মুখখানা। চামড়া বেশী তৈলাক্ত না থাকলে বেশীক্ষণ জলে ডুবে থাকাটাও আমার পক্ষে মঙ্গলজনক নয়—বিশেষ করে শীতের শুকনো হাওয়ায়। বড্ড শুকিয়ে যাই আমি।

উপেন আমার যত যত্নই করুন না কেন, ঝামেলায় ওকে ফেলবই আমি। উপেন যেন অকৃতজ্ঞ বলে গালাগাল না দিয়ে বসে। ওর মনে রাখা দরকার ভেতরকার সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আর বাইরের রুক্ষ দুনিয়ার মাঝখানের প্রাচীর আমি। ভেতরকার ঝক্কি যেমন পোহাতে হচ্ছে আমাকে, বাইরের ঝামেলাও তেমনি যাচ্ছে আমার ওপর দিয়ে। ভেতরকার বাইরেকার দুদিককার চাপ আর ঝক্কি যার ওপর দিয়ে এভাবে যায় বিরামবিহীন ভাবে, হাজার দুয়েক বিভিন্ন রোগে তার ভোগাটা কি খুব একটা আশ্চর্য ব্যাপার ? এসব ক্ষেত্রে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতেই হবে উপেনকে—বাকী যা কিছু করবার তা তো আমি করছি এবং করব।

জিভ

কথায় বলে কাজ নেই তো খই ভাজ। উপেনের হয়েছে তাই। যখন তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে বার করে দেখে। কিন্তু ঠিক কি যে দেখতে চাইছে, তা নিজেই জানে না। সেই কারণেই অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই তার একটা উল্টোপাল্টা মানে দাঁড় করানো ওর পক্ষে আশ্চর্য কিছু—নয়। ব্যস, ঐটুকু করেই ফুরিয়ে যায় আমার সম্বন্ধে ওর সমস্ত আগ্রহ। মোটে তো বার ইঞ্চি লম্বা আমি, ওজনে মাত্র দু আউন্স এবং—সাধারণতঃ নজরের বাইরে থাকি। বুঝতেই পারছেন আমি কে—আজ্ঞে হ্যাঁ, উপেনের রসনা অথবা জিভ।

সাধারণতঃ আমাকে কেউ বড় একটা আমল দিতে চায় না—মানতেই চায় না যে আমিও একটা দরকারী দেহযন্ত্র। চোখ আর কানের তুলনায় আমার দরকার নাকি তেমন কিছু নয়। আমার চেখে দেখার ক্ষমতাকে বলা হয় 'পঞ্চেন্দ্রিয়ের দূর সম্পর্কের ভাই'। কি অন্যায় বলুন তো? আমাকে বাদ দিয়ে উপেন কি পারবে থাকতে? মুখ থেকে আমাকে ঠেলে বার করে দুই দাঁতের মধ্যে আলতো করে কামড়ে ধরে কথা বলার চেষ্টা করে দেখলেই পারে। কথা যা বেরোবে—তা ও নিজেও বুঝতে পারবে না।

তবে হ্যাঁ। জন্তুদের জিভের মত অদ্ভুত অনেক ক্ষমতা আমার নেই। ব্যাঙবাবাজী যে ভাবে সুরুৎ করে জিভ বার করে পোকা পাকড়ায়—আমার সে ক্ষমতা নেই। অন্ধকার সুড়ঙ্গে জিভ বার করে যে ভাবে পথ চিনে সর্প মহাপ্রভু এগোয়, সে শক্তিও আমার নেই। তা সত্ত্বেও বলব, আমার কাজের ফিরিস্তিটা নেহাৎ কম নয়। চিবোতে সাহায্য করি আমি, মুখের মধ্যে খাবার নিয়ে পাকসাট খাইয়ে খাইয়ে চিবিয়ে কাদা বানিয়ে পাকস্থলীতে পাঠানোর উপযুক্ত করে তবে ছাড়ি। দাঁত খোঁটা হিসেবেও আমার তুলনা নেই। আমার চৌহদ্দিতে এতটুকু নোংরা রাখি না—সব কিছুই খুঁটে তুলে সরিয়ে দিই। উপেনের আবেগ অনুভূতিকেও প্রকাশ করবার ক্ষমতা রাখি—উপেনের ছেলেমেয়েরা জিভ বার করে বিতৃষ্ণা জানায়। উপেনের বউও জিভ কেটে লজ্জা প্রকাশ করে।

আমার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর জটিল কাজ হল খাবার গেলবার সময়ে উপেনকে সাহায্য করা, আমার সামনের দিকটা মুখবিবরের ছাদের শক্ত তালুতে চেপে বসে যায়। তারপরেই ঢিবির মত ফুলে ওঠে আমার পেছন দিকটা—খাবারকে গুলটিপের মত ছুঁড়ে দেয় গ্রাসনালী নামক খাদ্য-পথের দিকে। শুনতে খুব সোজা মনে হলেও কাজটা কিন্তু অনেকগুলো জটিল তৎপরতার সুসমন্বয় বলতে পারেন। অনেকগুলো বাজনা একসঙ্গে বেজে উঠে যেমন মধুর সুরলহরীর সৃষ্টি করে, এক্ষেত্রেও স্নায়ুদের পরি-চালনায় আমার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পেশারা মিলেমিশে সম্পন্ন করে অত্যন্ত গোল-মেলে অথচ ভয়ানক দরকারী এই কাজটি। মায়ের পেট থেকে বেরোনোর আগেই উপেন শিখে গিয়েছিল গিলতে হয় কি করে। এ থেকেই বুঝবেন 'গেলা' নামক প্রতিবর্তী ক্রিয়া (রিফ্লেকশন) জীবনকে টিঁকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ—এতই গুরুত্বপূর্ণ যে মায়ের পেট থেকেই কাজটি শিখে তাকে বেরিয়ে আসতে হচ্ছে জগতের আলোয়। এর পরেও কি হেনস্থা করবেন আমাকে?

আমার আরও একটা মহিমা শুনুন। খুব যে লম্বাচওড়া বক্তৃতা ঝাড়েন যখন তখন, এটা কার দৌলতে হচ্ছে মশাই? আজ্ঞে হ্যাঁ। এই শর্মার দৌলতে। এখানেও সেই স্নায়ু আর পেশীর যুগপৎ ভেল্কী। আমাকে যথেষ্ট অনুশীলন নিতে হয়েছে অবিশ্যি বিশেষ এই ভেল্কীটি দেখানোর ব্যাপারে। উপেন যখন শিশু, শব্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছে তখন থেকেই। তারপরেও লেগেছে ঝাড়া দুটি বছর ছোট ছোট বাক্য সৃষ্টি করতে।

এখন কিন্তু আমি কিন্তু অক্লান্ত বাজিকর—পাকা ব্যায়ামবীর—জিভের জিমন্যাষ্টিকে মস্ত জিমন্যাষ্ট। ছোটবাক্য তো বটেই, জটিলতম বাক্যসৃষ্টি করে ভাবপ্রকাশেও আমার ক্ষমতা বড় সামান্য নয়। সাদাসিধে একটা বাক্য উচ্চারণ করতে গেলেই উপেন নিজেই টের পাবে'খন আমি দড়াবাজির খেলায় কতদূর এগিয়েছি। কথা বলার সময়ে নজর রাখুক আমার নড়াচড়ার ওপর। তাজ্জব বনে যাবে আমার চালচলন আর তৎপরতা দেখে। আরও একটা ব্যাপার নিয়ে ভেবে দেখতে পারে। একটা সত্যিকারের ভয়ানক শত্রুকে পাশে নিয়ে থাকতে হয় আমাকে—নাম তার দাঁত। দারুণ ভাবে জখম করে ছাড়তে পারে আমাকে এই বত্রিশ শয়তান। কিন্তু পাশ কাটিয়ে খেলে

জিভ
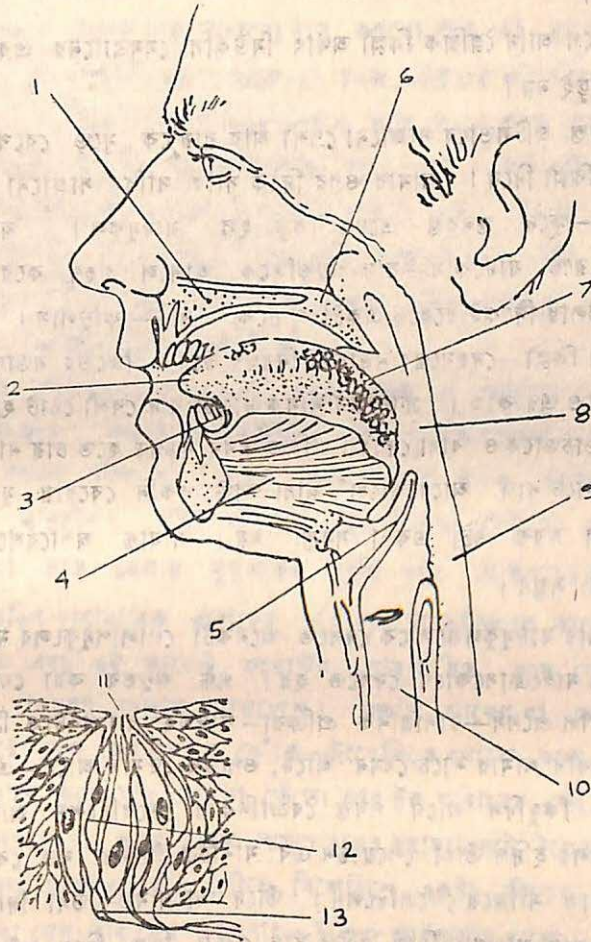
১। শক্ত তালু; ২। জিভ; ৩। ফ্রানুলাম; ৪। জিভের পেশী; ৫। এপ্রিগ্লটিস (অধিজিহ্বা); ৬। নরম তালু; ৭। প্যাপিলা; ৮। গলা; ৯। ইসোফেগাস (গ্রাসনালী); ১০। শ্বাসনালী; ১১। স্বাদকূপ; ১২। স্বাদকোষ; ১৩। স্নায়ু; (১১-১২-১৩ = স্বাদমুকুল)

যাওয়ার খেলাতেও আমি দারুণ পোক্ত। যতই কামড়াতে আসুক না কেন, ঠিক সরে গিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে নিই আমি—কামড়ে ক্ষত বিক্ষত হই কদাচিৎ।

আদপে আমি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী অর্থাৎ মিউকাস মেমব্র্যানের একটা পিণ্ডি ছাড়া কিছুই নয়।

অত্যন্ত জটিলভাবে সাজানো পেশী আর স্নায়ুকে মুড়ে রেখে দিয়েছি শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী দিয়ে। আমার ওপর দিকে সারি সারি সাজানো রয়েছে প্যাপিলা—ক্ষুদে স্তনবৃন্ত--এদের কিছু হল স্বাদমুকুল। স্বাদমুকুলের মধ্যেই রয়েছে স্বাদকোষ—স্বাদ-অনুভূতিকে আসলে গ্রহণ করে এরাই। আমার তলার দিকেই রয়েছে একটা পুঁচকে দড়ি—ফ্রানুলাম। জিনিসটা ভাঁজকরা ঝিল্লী—দেহযন্ত্রের নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে। জিভের নড়াচড়ার রাশ টেনে ধরাও এর কাজ। ফ্রানুলাম নামক দড়িটা যদি বেশী ছোট হয়, স্বাভাবিক নড়াচড়াকেও বাধা দেবে। জিভ তখন সড়গড় হতে চায় না। কথা আর ফোটে না। আধোআধো আধা স্পষ্ট বুকনি বেরোয় মুখ দিয়ে। আজকাল অবশ্য এটা একটা সমস্যা নয়। সামান্য অপারেশনেই বুলি ফোটানো সম্ভব।

আমার স্বাদমুকুলগুলোকে দেখতে অনেকটা গোলাপমুকুলের মত। এত ছোট যে মাইক্রোসকোপে দেখতে হয়। গন্ধ অনুভব করা যেমন একটা কেমিক্যাল প্রসেস—রাসায়নিক প্রক্রিয়া—স্বাদগ্রহণ ব্যাপারটাও ঠিক তাই। এরা আমার আমার নীচে যেমন আছে, ওপরেও তেমনি আছে—এইটাই হল অদ্ভুত। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা ভেবেছিলেন আমার সমস্ত স্বাদমুকুলের হদিশ তাঁরা পেয়েছেন এবং মানচিত্র আঁকার মত কে কোথায় আছে তাও সাজিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁদের ধারণামত—ডগা দিয়ে নিতান্ত নোনতা স্বাদ, মাঝখান দিয়ে মিষ্টির স্বাদ, পেছন দিক দিয়ে তেঁতো, আর দুপাশ দিয়ে টক। এরাই হল গিয়ে আমার মূল স্বাদ—সংখ্যায় চার। রঙের ক্ষেত্রে যেমন লাল, নীল আর হলদে—এই তিন রঙের মিশ্রণে হাজার রঙের সম্ভব, স্বাদগ্রহণের ক্ষেত্রেও জানবেন ঠিক সেইভাবেই চারটে মূল স্বাদ বিভিন্ন অনুপাতে মিলেমিশে এনে দেয় হাজার হাজার বিভিন্ন স্বাদের অনুভূতি।

গবেষকরা কিন্তু ভুল ভেবেছিলেন। স্বাদমুকুলরা যে কেবল আমারই আছে—এ ধারণা ঠিক নয়। উপেনের মুখবিবরে ছড়িয়ে রয়েছে চেখে

দেখার অজস্র কুঁড়ি। মুখবিবরের ছাদের কাছে যে শক্ত আর নরম তালু রয়েছে, এদের সংযোগস্থলের কাছেই রয়েছে তেঁতো আর টক স্বাদগ্রহণের প্রাথমিক মুকুল। উপেন যদি বাঁধানো দাঁত কখনো পরে, এই মুকুলগুলো ঢাকা পড়ে যাবে—পাঞ্জাবী চাট খেয়েও সে-রকম চটকদার স্বাদ আর পাবে না। লেবুর সরবতে যে টক স্বাদটা চনমনে করে তোলে সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে—তা কমে যাবে। চা আর কফির মধ্যে সেই তেঁতো স্বাদ আর তেমন ভাবে ক্লান্ত স্নায়ুকে চাঙা করতে পারবে না। সে-রকম গন্ধ অনুভবও আর ঘটবে না। নোনতা আর মিষ্টি স্বাদগ্রহণের বেশীর ভাগ মুকুলই রয়েছে জিভের ওপর—মাত্র কয়েকটা ছড়িয়ে রয়েছে এদিকে সেদিকে, বিশেষ করে গলার ওপরের অংশে।

খাবারের সত্যিকারের স্বাদকে বার করতে গেলে সে খাবারকে তরল করে তুলতেই হবে। কথাটা আইসক্রীমের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। আইসক্রীম যতক্ষণ পর্যন্ত না মুখের মধ্যে গলে যাচ্ছে, ততক্ষণ তা একেবারেই স্বাদহীন। কিন্তু একবার তরলাবস্থায় পৌঁছে গেলে, তৎক্ষণাৎ তা হাত মেলায় মুকুলদের মিষ্টি স্বাদ গ্রাহকদের সঙ্গে। অতি ক্ষুদ্র তড়িৎ-রাসায়নিক প্রবাহের (ইলেকট্রোকেমিক্যাল কারেন্ট) উৎপাদন ঘটে এবং এই কারেন্ট করোটির স্নায়ুবাহিত হয়ে পৌঁছে যায় ব্রেনের স্বাদগ্রহণ সংক্রান্ত প্রান্তদেশে। অন্যান্য আবেগ বা তাড়না (চিন্তা না করে কাজ করবার যে ঝোঁক—ইংরেজিতে যাকে বলে ইম্পালস্) এইভাবে ছুটে যায় নোনতা, তেঁতো আর টক খাবারের ক্ষেত্রেও। চিত্রশিল্পীর প্যালেটের ওপর যেমন অজস্র রঙের সমাহার ঘটে, ইলেকট্রোকেমিক্যাল বার্তাগুলোও ব্রেনে পৌঁছে মিলেমিশে একটা বিশেষ স্বাদ সৃষ্টি করে এবং ব্রেন রায় দেয় তৎক্ষণাৎ—উপেন আইসক্রীম খাচ্ছে এবং খাদ্যটি অতীব সুস্বাদু।

দীর্ঘদিন যাবৎ ধরে নেওয়া হয়েছিল সব মানুষের কাছেই সব খাবারের স্বাদ এক রকম। ভাবতেও কিন্তু অদ্ভুত লাগে। কানে শোনা আর চোখে দেখা কি সব মানুষের ক্ষেত্রে সমান মাত্রায় থাকে? একই গান কাউকে ঘুম পাড়ায় কাউকে পাগল করে; একই ছবি কাউকে ভোলায়, কাউকে রাগায়। ঠিক তেমনি একই খাবার সবাইকে সমানভাবে কি মোহিত করতে পারে? পারে না। স্বাদ গ্রহণের এই অনুভূতিও যে মানুষে

জিভ

মানুষে কমে বাড়ে, এখন তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। পালংশাক একজনের ক্ষেত্রে অপূর্ব নিঃসন্দেহে ; আর একজনের কাছে তা তেঁতো এবং ভয়াবহ অন্যান্য বহু খাবারের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। মানুষের ক্ষেত্রে স্বাদ বৈচিত্র্য নির্ভর করে বেশ কয়েকটা খাঁটি কেমিক্যাল অর্থাৎ রাসায়নিক দ্রব্যের ওপর। যেমন ধরুন, সোডিয়াম বেনজোয়েট একজনের কাছে মিষ্টি হতে পারে, কিন্তু অন্যদের কাছে হয় টক, নয় তেঁতো অথবা নোনতা, নয়তো স্বাদহীন। কাজেই আপনার যে চীজ-স্যাণ্ডউইচ অপূর্ব লাগছে, আরেকজন তা চেখেই মুখ বেঁকিয়ে নিলে মাথা গরম করে ফেলবেন না দয়া করে।

স্বাদগ্রহণ জিনিসটা যে উত্তরাধিকার সূত্রে একটা নিয়মিত প্যাটার্ন মেনে চলে এ ধরনের অনেক ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। তা সত্ত্বেও কিন্তু মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা জিভের আছে। এক সময়ে যে খাবার দেখলে থালা ছুঁড়ে ফেলে দিত উপেন, এখন তা তারিয়ে তারিয়ে খায়। কুমড়োর ছক্কা মা রেঁধে দিলে বিস্বাদ লাগতো, বউ রেঁধে দেয়—বড় ভাল লাগে। কালিয়া, কাবাব আর লঙ্কার ঝাল সইতে আমার বেশ কিছু দিন লেগেছে। কিন্তু একবার যা শিখেছি, তা আর ভুলিনে। শরীরের অন্যান্য যন্ত্ররা বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে ঝিমিয়ে পড়ে—আমি পড়ি না। নোলা সড়গড় থাকে শেষ দিন পর্যন্ত। উপেনের চোখ আর কান বেইমানি করতে পারে বুড়ো বয়েসে—আমি করব না। স্বাদ জিনিসটা যে কি জিনিস—তা ও কোনোদিনই ভুলতে পারবে না। দশ বছর বয়েসে পোলাও খেয়ে যে তৃপ্তি পেয়েছে, নব্বইতে পেঁছেও পাবে সেই তৃপ্তি। এ-রকম বিশ্বস্ত দেহ-যন্ত্র আর দুটি পাবেন ?

আগেই বলেছি, ফুরসৎ পেলেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাকে দেখে উপেন—খুঁত পেলেই খুঁত খুঁত করে তাই নিয়ে। জিভে সাদা চামাটি পড়লেই ভাবে নিশ্চয় পাইখানা পরিষ্কার হচ্ছে না অথবা হজমের গোলমাল হয়েছে। কিন্তু তা নাও হতে পারে। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, বারো মাস যাঁরা কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে ভোগেন ; কিন্তু জিভ তাঁদের দিব্বি পরিষ্কার। কিন্তু যারা কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে আদৌ ভোগেন না, এমন অনেকের জিভে দেখা গেছে সবজে-সাদাটে কোটিং পড়েছে। স্তরটা আসলে কিন্তু খাবারের ছোট ছোট কুচি আর বুড়ো কোষ ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্যাপিলার ফাঁকে আটক পড়ে এরাই জীবাণু-আক্রান্ত হয়ে এমনি আকার ধারণ করে। জিভছোলা দিয়ে পরিষ্কার করলেই পুরো কোটিং তুলে দিয়ে জিভ সাফ করে ফেলা যায়। মুখের মধ্যে দিয়ে নিঃশ্বেস নেয় যারা, তাদের জিভেই এই ধরনের 'কোটিং' পড়ার প্রবণতা বেশী থাকে।

এ সব সত্ত্বেও জিভকেই কিন্তু বলা হয়েছে রোগ দর্পণ। দেহের বহু গোলযোগ ধরা পড়ে জিভ দেখলেই। পানিসাস অ্যানিমিয়া হলে লাল হয়ে যাই আমি সেই সঙ্গে একটু নিরেট, অনুভূতিহীন, আর মসৃণ। জনডিস অর্থাৎ ন্যাবা হলে হই হলদেটে। পেলাগ্রায় হই আগুনের মত লালচে (পেলাগ্রা রোগটা শরীরে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স আর প্রোটিনের অভাব ঘটলেই দেখা যায়)। কিছু ফানগাস অর্থাৎ ছত্রাক তো আমাকে কালচে বানিয়ে দিতে পারে। আমার একটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর ব্যায়রাম হল ডিস্‌গিউসিয়া। স্বাদ বিকৃতি। চিনিকে লাগে যাচ্ছেতাই, মাংসকে ভয়ানক কিছু। চকলেটকে মনে হয় নোনতা আর ইলিশকে মিষ্টি—রোগটা হয় অনেকেরই। এখন জানা গেছে যত নষ্টের মূল সামান্য একটা মৌলিক পদার্থ। শরীরে তার ঘাটতি দেখা গেলেই স্বাদ বিকৃতি ঘটে। পদার্থটার নাম দস্তা (জিঙ্ক)। ফ্লু অথবা অন্য কোনো অসুখের পর শরীরে দস্তার পরিমাণ কমে যায়। অথবা দৈনিক খাবারেও দস্তার ঘাটতি থাকতে পারে। নয়তো শরীর খাবার থেকে দস্তাকে ঠিক মত তুলে নিতে পারে না। দস্তার যোগান বাড়িয়ে দিন—ফিরে আসবে স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা।

হাইপোগিউসিয়া আমার আরও একটা ব্যায়রাম। এর ফলে খাদ্য বা পানীয় থেকে ফ্লেভার বা গন্ধ গ্রহণের অনুভূতি আমার কমে যায়। বেশীর ভাগ খাবারেই তখন আর আস্বাদ পায় না উপেন। শিককাবাবকে মনে হয় নরম রবার, কমলালেবুকে গন্ধহীন জিলেটিন। জিভ যাতে মিষ্টি স্বাদ পায়, উপেন তাই চা বা কফিতে বেশী করে চিনি খেতে আরম্ভ করে। বেশ কয়েকটা কারণে আমার স্বাদ মুকুলদের চেহারা আর ধর্ম পালটে যায়—রোগের কারণ সেইটাই। চূড়ান্ত ক্ষেত্রে স্বাদ অনুভূতি লোপ পায় একেবারেই। রুগী বেচারী মুষড়ে পড়ে। তখন হাড়ে হাড়ে টের পায় স্বাদ জিনিসটা অত্যন্ত সুখদায়ক ইন্দ্রিয়দের অন্যতম—এ অবস্থায় পড়লে আপনার আক্কেল হয়ে যাবে'খন।

যে দেহযন্ত্র মানুষকে এত কাজ আর এত সুখ দেয়, তাকে এত হীন নজরে

দেখাটা কি একটা বিরাট আশ্চর্য নয়? স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে উপেন ওর আঙুলের নখ বা মাথার চুলের দিকে যতটা নজর দেয়—তার চেয়ে অনেক কম নজর দেয় আমার দিকে। অথচ ওর শরীরটাকে ভাল রাখার ব্যাপারে মোটেই অত্যাবশ্যক নয় এই নখ আর চুল। কিন্তু যে জিভকে মনে হয় নেহাৎই অগামারা, চার ইঞ্চি লম্বা আর দু-আউন্স ওজনের লিকলিকে সেই যন্ত্রটিই কিন্তু সেবা করে যাবে ওকে শেষের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দুভাবে—স্বাদ পাইয়ে আর কথা বলিয়ে।—

৪

অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি

পিটুইটারী

আমি একটা গোলাপী রঙের কড়াই শুঁটি দানার মত ছোট্ট টিশু। উপেনের ব্রেনের তলার দিকে ঝুলে আছি পঁুচকে একটা বোঁটার প্রান্তে। ওজনে আমি এক আউন্সের পঞ্চাশ ভাগের একভাগ মাত্র—তার মধ্যেও শতকরা ৮৫ ভাগ হল শুধু জল। তা সত্ত্বেও কিন্তু উপেনের ব্রেনের ঠিক পরেই ওর শরীরের সম্ভবতঃ সবচেয়ে জটিল যন্ত্র হলাম আমি। উপেন যা কিছু করে অথবা যত কিছু ব্যাপারের মধ্যে থাকে, তার প্রায় প্রতিটির পেছনে মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় আমাকে। আমি ওর পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে-সব হরমোন ক্ষরণ করি আমি, তা যেমন অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়তে পারে, তেমনি সর্বনাশ করেও ছাড়তে পারে। নিখুঁত স্বাভাবিক জীবন যাপনে আমি উপেনকে সাহায্য করতে পারি, আবার রাশি রাশি উদ্ভট অসুখেও ওকে কাবু করতে পারি—এমন কি প্রাণ পাখী পর্যন্ত

উড়িয়ে দিতে পারি। আমার মধ্যেকার অত্যাশ্চর্য হরমোনদের একটির দৌলতেই এই ধরায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল উপেন—মাতৃজঠর থেকে বেরিয়ে আসার ধাক্কা লেগেছিল তার গায়ে—সঙ্কুচিত হয়েছিল মাতৃজঠর। হরমোনটার নাম অক্সিটোসিন। আমিই ঠিক করেছিলাম স্বাভাবিক সাইজ হোক উপেনের—তিনফুট বামন হওয়ার দরকার নেই, আটফুট দানব হওয়ারও দরকার নেই। ইচ্ছে করলে আমিই ওর যৌনযন্ত্রদের বালকোচিত সাইজে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি, অথবা বয়স বাড়িয়ে দিতে পারি এমন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে বুড়ো হয়ে যেতে পারে ও মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে।

আমাকে বলা হয় উপেনের মাস্টার গ্ল্যাণ্ড—ওর অন্তঃস্রাবী অর্কেস্ট্রার একমাত্র পরিচালক—কনডাক্টর। আমি যার তলায় ঝুলছি, উপেনের মস্তিষ্কের সেই অংশের সাইজ শুকনো কুলের মত। নাম হাইপোথ্যালামাস। আমার উপর সমস্ত হুকুম সরাসরি আসে এই হাইপোথ্যালামাস থেকে। আমার কাজ অন্যান্য গ্ল্যাণ্ডদের সক্রিয়তা আর কার্যকলাপের তদারকি করা—ক্লাসরুমে যেমন মনিটর থাকে—আমিই তেমনি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিদের মনিটর। সঠিক পরিমাণে হরমোন উৎপাদন যেন করে যায় এরা—এইটা দেখাই আমার কাজ। বলতে পারেন উপেনের শরীরের কেমিক্যাল হুজুর আমি। এই পৃথিবীর সবচেয়ে আঁটসাঁট সংক্ষিপ্ত আর জটিলসূক্ষ্ম কেমিক্যাল কারখানা হিসেবে যদি জাহির করি নিজেকে, ভাববেন না যেন মিথ্যে বড়াই করছি।

আমার দুটো ফুলো-ফুলো ভাগ। হাইপোথ্যালামাসে তৈরী হওয়া দুটো হরমোন এসে জমা হয় আমার পেছন দিককার ছোট্ট অংশে। আমার সামনের অংশটা একটু বড়। এতে তৈরী হয় খুব সম্ভব দশটা হরমোন—সঠিক সংখ্যা আজও কেউ জানে না। মানুষ এই ধরায় আজ পর্যন্ত জটিলতম যে-সব বস্তুর সন্ধান পেয়েছে, তাদের অন্যতম হল এই হরমোনেরা। অথচ সারাদিনে আমার উৎপাদনের পরিমাণ এক গ্রামের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ যা হয়—তার চাইতেও কম!

আমার গুপ্তরহস্য উদ্ধার করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে বৈজ্ঞানিকদের। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ডাক্তাররা আমার ধর্মকে, আমার কাজকর্মকে খুব নিম্নশ্রেণীর মনে করেছে: আমি নাকি নাকের শ্লেষ্মার মূল কারণ, এই ধারণা নিয়েই থেকেছে তারা বেশ কয়েকশ' বছর। আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত আমার দুর্বোধ্য ক্ষরণদের অস্তিত্ব কেউ টের পায় নি—
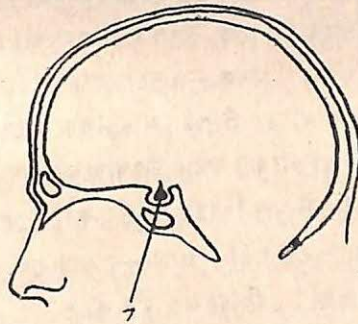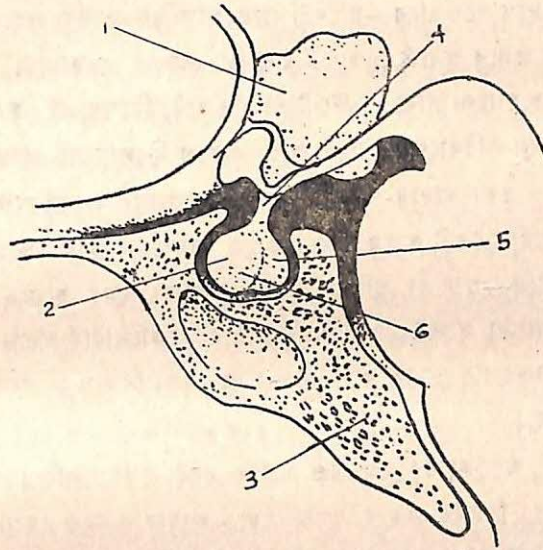
পিটুইটারী

১। হাইপোথ্যালামাস; ২। পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড; ৩। রক্ষাকারী হাড়; ৪। বোঁটা; ৫। পেছনের অংশ; ৬। সামনের অংশ; ৭। পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডের অবস্থান;

পরিমাণে অত্যন্ত কম ছিল বলে। এখন তাদের প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে পৃথকভাবে মানুষ আর জন্তুর পিটুইটারী থেকে।

উপেনের ঘাড়ে আছে থাইরয়েড গ্লাণ্ড। আমার একটা হরমোন ম্যানেজ করছে একে। আশ্চর্য এই থাইরোট্রপিক হরমোন যদি বেশী মাত্রায় ক্ষরিত হতে থাকে আমার মধ্যে, অত্যন্ত দ্রুত তালে সক্রিয় হয়ে ওঠে থাইরয়েড—উপেন তখন দগ্ধে মরে যাবে—মানেটা প্রায় আক্ষরিক অর্থেই ধরতে পারেন। খিদেয় পেট জ্বলবে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত, তা সত্ত্বেও চেহারাটা হবে উঞ্ছ-লম্পটদের মত হ্যাংলা পানা। উল্টোটা যদি ঘটে, বিশেষ এই হরমোনটিকে যদি অত্যন্ত অল্প পরিমাণে উৎপাদন করি, তাহলে ঢিলেঢালা আর জড়বুদ্ধি হবে উপেন। খবর আদান-প্রদানের এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা আমার মধ্যেই রয়েছে যে আমার তৈরী হরমোন যার কাজে লাগছে, তার কাছ থেকেই খবর চলে আসে—আর না, পরিমাণ কমাও; অথবা, ঢের হয়েছে, পরিমাণ বাড়াও। আপনা হতেই তাই আমি দুটোর কোনোটাই ঘটতে দিই না। ইংরেজীতে এককথায় একেই বলে ফীড-ব্যাক মেক্যানিজ্‌ম্। আমার মধ্যেই তা রয়ে গেছে।

উপেনের অণ্ডকোষের ক্ষেত্রেও রয়েছে সেই একই পদ্ধতি। গুরুত্বপূর্ণ এই গ্লাণ্ডদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে রয়েছে আমার দুটো হরমোন। একটার কাজ শুক্রকীট উৎপাদন আর পুং হরমোনকে উত্তেজিত করা। আর একটার কাজ নালী-তন্ত্রকে এমনভাবে বাড়তে উৎসাহ দেওয়া যাতে শুক্রকীট পরিবহনে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি উপেনের বউয়ের ঠিক এই ধরনের দুটি হরমোন আছে গর্ভাশয় আর ডিম্বকোষের উন্নতি সাধনে প্রেরণা জোগানোর জন্যে। এইভাবেই সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা আর জীবন অব্যাহত রাখার শক্তি—এই দুটি মূল বিষয়ই নির্ভর করছে গোলাপী রঙের কড়াই শুঁটি দানার মত ছোট্ট এই শর্মার ওপর—ওজনে যে এক আউন্সের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। বিস্ময়কর, নয় কী?

উপেনের বউ উমার ক্ষেত্রে পিটুইটারী গ্লাণ্ড থেকে দুই হরমোনের ক্ষরণ ঘটে মাসে ঠিক একটি ডিম্বকোষ উৎপাদনের জন্যে। এদের একটির নাম FSH (ফলিকল্ স্টিমুলেটিং হরমোন) আর একটির নাম ICSH (ইন্টারস্টিসিয়াল সেল স্টিমুলেটিং হরমোন)। দাঁতভাঙা শব্দদুটোর একটু মানে বুঝে রাখা দরকার। ফলিকল্ মানে ছোট্ট থলি—যার মধ্যে থেকে

ক্ষরণ ঘটে। যে হরমোন এই ফলিকল্ সৃষ্টিতে উদ্দীপনা জোগায় তারই নাম FSH; মধ্যবর্তী স্থানের কোষেদের উদ্দীপনা জোগায় যে হরমোন তার নাম ICSH; এই দুই হরমোনের কৃপায় প্রতিমাসে একটি পরিপক্ক ডিম্বকোষের আবির্ভাব ঘটে। হরমোন দুটি অতিরিক্ত মাত্রায় ক্ষরিত হলে এক মাসে পাঁচ ছ'টা ডিম্বকোষ পরিপক্ক হতে পারে, সেক্ষেত্রে উমা একসঙ্গে পাঁচটি সন্তান ভূমিষ্ঠ করবে। উপেনের অণ্ডকোষের ক্ষেত্রেও সেই ব্যাপার। FSH আর ICSH অল্পমাত্রায় ক্ষরিত হলে উপেন হবে যৌনসংক্রান্ত ব্যাপারে উদাসীন, খিটখিটে আর ঘ্যানঘেনে। বেশী মাত্রায় ক্ষরিত হলে, ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতই অবস্থা দাঁড়াবে বেচারার।

আমার কারখানায় তৈরী কেমিক্যালদের মধ্যে সবচেয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং ব্যাপকভাবে ক্রিয়াশীল যে হরমোনটির উৎপাদন ঘটে তার কাজ শুধু বর্ধন করে যাওয়া। অর্থাৎ বাড়িয়ে যাওয়া। উপেন যখন ছোট্ট থেকে বড় হচ্ছে, এই হরমোনটিই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে সেই সময়ে। স্বাভাবিক ভাবে যাতে বেড়ে ওঠে উপেন, সজাগ দৃষ্টি রেখেছে সেদিকে। লম্বা হতে হতে এক সময়ে হাড়ের প্রান্তগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, পূর্ণ যৌবন পেয়েছে উপেন—লম্বায় আর বড় হয়নি। এছাড়াও এই হরমোনের আরও কাজ আছে বইকি। হাড় যদি ভাঙে, ডাক্তারদের বিশ্বাস নতুন হাড় দ্রুত বেড়ে উঠতে সাহায্য করে বর্ধনকারী এই হরমোন। ক্ষুরে হাত কেটে ফেললে, ডাক্তারদের ধারণা এই হরমোনটিই চটপট কাটা জায়গা জুড়ে দিয়ে ক্ষতস্থান নিরাময় করে দেয়। ক্ষয়প্রাপ্ত টিশুদের জায়গায় নতুন টিশু গজাতেও সম্ভবতঃ প্রেরণা জোগায় আশ্চর্য এই হরমোন।

কোনো কারণে যদি হরমোনটার ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়—আমার দ্বারা তা অসম্ভব মোটেই নয়—চড় চড় করে বাড়তে থাকবে উপেনের হাত পা চোয়াল। ইয়া চওড়া চৌকো চোয়াল ঠেলে বেরিয়ে আসবে সামনে; নাকটা বেগুনের মত বড় হয়ে উঠবে দেখতে দেখতে; হাত আর পা হবে দানবের হাত আর পায়ের মত।

ক্যানসার প্রহেলিকা আজও বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে ছাড়ছে। এমনও হতে পারে যে আমার এই বর্ধনকারী হরমোনটিই সমাধান জুগিয়ে দেবে এই হেঁয়ালির। সম্ভাবনাটা দারুণ—ভাবতে গেলেও মাথা ঘুরে যায়। ক্যানসার রোগটা কিন্তু কোষের দ্রুত বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই

পিটুইটারী

নয়। খুব সম্ভব আমার তাড়নাতেই তা ঘটে। আমি জানি, ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে এমনি বিশেষ কয়েকটা কেমিক্যাল দিয়ে গবেষণাগারে জন্তুদের শরীরে শতকরা একশভাগ ক্ষেত্রে এ রোগ ফুটিয়ে তোলা যায়। কিন্তু এই জন্তুদেরই পিটুইটারী কেটে বাদ দিলে ক্যানসার আর হয় না। এই থেকেই নিদেন পক্ষে জন্তুদের ক্ষেত্রে ক্যানসারের সঙ্গে আমার একটা যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। মানুষের ক্ষেত্রে বিশেষ কয়েকটা ক্যানসার কেসে পিটুটারী কেটে বাদ দেওয়ার ফলে যথেষ্ট পরিমাণে রোগের উপশম ঘটতে দেখা গেছে।

আজ পর্যন্ত কেবলমাত্র জন্তুদের ক্ষেত্রেই পিটুইটারীর আরও একটা হরমোনের রোগ নিয়ন্ত্রণের আশ্চর্য সম্ভাবনা দেখা গেছে। হরমোনটার নাম লাইপোট্রোপিন। শরীরে চর্বি সঞ্চয়ের ওপর কড়া নজর রাখাই এর কাজ। নিরেট চর্বিকে লিভারে চালান করার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে এই হরমোনের—লিভারে গিয়ে চর্বি রূপান্তরিত হয় এনার্জিতে। কাজেই, ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে এই লাইপোট্রোপিনকে দিয়েই উপেনের নেয়াপাতি ভুঁড়িকে বাগে আনা যাবে—চর্বি মিলিয়ে দিয়ে যৌবনোচিত ছিপছিপে চেহারা ফিরিয়ে আনা যাবে।

উপেনের মাথার ঠিক মাঝখানে হাড়ের দোলনায় আলতোভাবে আছি বলেই কোনোরকম চোট বা জখমের ভয় আমার নেই বললেই চলে। সুরক্ষিত থেকেও কিন্তু জখম হতে পারি—পরিণামটা হয় নাটকীয়। ভাসোপ্রেসিন নামে একটা হরমোনের ক্ষরণ ঘটে আমার মধ্যে। মূত্র-উৎপাদনের পরিমাণ যাতে বেড়ে না যায়—ভাসোপ্রেসিন তা দেখে। কিডনীর ওপর ব্রেক কষে। মাথায় চোট লাগলে আমার ভাসোপ্রেসিনের উৎপাদন কমে যায়। কিডনীদের রাশ টেনে ধরার কেউ থাকে না—দ্রুত মূত্র উৎপাদন করে চলে তারা—দিনে কয়েক গ্যালনের মত। বেঁচে থাকার জন্যে উপেনকে তখন তত পরিমাণ জল খেতে হয়। সাংঘাতিক তেষ্টায় সাধারণতঃ প্রাণটা বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় বলেই জল খাওয়ার পরিমাণও সেই অনুপাতে বেড়ে যায় অতিরিক্ত মাত্রায়।

জখম হওয়ার ঘটনা আমার বেলায় যেমন বিরল, তার চাইতেও বিরল হল টিউমারে আমার আক্রান্ত হওয়া। যদি কখনো হই, তাহলে পরিণামটা এত সুদূরপ্রসারী হয় যে পিলে চমকে যাবে শুনলে। টিউমার বাবাজী

আমাকে ACTH হরমোন বেশী মাত্রায় ক্ষরণ করতে বাধ্য করতে পারে। এই হরমোনটি আবার উপেনের কিডনীর দু'পাশে দু'পা ঝুলিয়ে বসে থাকা আড্রেনাল গ্ল্যাণ্ড দুটির হরমোন-ক্ষরণের ক্ষমতার ওপর সর্দারি করে। ফলটা কি হবে জানেন? পেটে চর্বির পাহাড় জমবে, চর্বির প্যাড জমবে কাঁধে আর পিঠের ওপর দিকেও। পা-দুটোকে মনে হবে লাট্টুর আলের মত হাস্যকরভাবে সরু। রক্তচাপ হু-হু করে বেড়ে যাবে। যৌন-তাড়না অন্তর্হিত হবে। হাড় থেকে ক্যালশিয়াম বেরিয়ে যাবে। মেরুদণ্ডের কশেরুকা (ভার্টিব্রা) পর্যন্ত ভেঙে পড়তে পারে।

এতকিছু ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে বেদম পরিশ্রম করতে হবে উপেনের হৃদযন্ত্রকে। শেষকালে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে বেচারী। এই সর্বনাশ যাতে না ঘটে তাই ডাক্তাররা বিকিরণ (রেডিয়েশন) প্রয়োগ করে আমার বাড় কমিয়ে আনার চেষ্টা করবে—দ্রুতগতিকে কমিয়ে মন্দগতি করারর চেষ্টা চালাবে। অথবা উপেনের অ্যাড্রেন্যাল গ্ল্যাণ্ড দুটোকেও কেটে বাদ দিতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্য উপেনকে বিরামবিহীনভাবে হরমোনের ডোজ নিয়ে যেতে হবে—নিতেই হবে—আর কোনো পথ থাকবে না।

স্বাভাবিক অবস্থায় এত চুপচাপ এবং এবং এমন নিষ্ঠার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে কাজ চালিয়ে যাই যে আমি যে আছি, সে অস্তিত্বটাও টের পায় না উপেন—আমাকে এত অবজ্ঞার কারণটাই হল তাই। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস আর অন্যান্য দেহযন্ত্রদের সুস্থ রাখার জন্যে উপেন চেষ্টা করলে হয়ত অনেক কিছুই করতে পারে—কিন্তু আমার মঙ্গলের জন্যে কোনো করণীয়ই নেই ওর। পারে শুধু কৃতজ্ঞ থাকতে—তার বেশী নয়।

থাইরয়েড

উপেনের কণ্ঠার ঠিক নিচেই বায়ুনালীর ওপর দু'পাশে দু'পা ঝুলিয়ে বসে আছি আমি। রঙটা আমার গোলাপী, চেহারাটা প্রজাপতির মত দুপাশে ডানা মেলে ছড়ানো। ওজন আমার এক আউন্সের তিন ভাগের দু'ভাগ—আর আমার দৈনিক হরমোন উৎপাদনের পরিমাণ এক আউন্সের এক লক্ষ ভাগের একভাগেরও কম—প্রায় ১৫০ মাইক্রোগ্রাম। আমার সাইজ আর উৎপাদন ক্ষমতা দেখে মনে হতে পারে আমার কোনো গুরুত্ব নেই। আসলে কিন্তু আমি একটা পাওয়ার হাউস—শক্তি উৎপাদনের কারখানা। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই সেই অসাধারণ গ্ল্যাণ্ড নাম যার থাইরয়েড।

উপেনের জন্মের সময়ে আমার হরমোনেরা যদি না থাকত, তাহলে কি হত শুনে রাখুন। পুরু-ঠোঁট, চ্যাপ্টা-নাক বামন হয়ে যেত উপেন—স্বাভাবিক ভাবে আর পাঁচটা বাচ্চার মত বড় হত না। হত পুরুষত্বহীন। বুদ্ধিবৃত্তি হত সাত বছরের ছেলের মত। আমার এখনকার প্রধান কাজ হল উপেন কি গতিবেগে বেঁচে থাকবে, তা নিয়ন্ত্রণ করা; মেটাবলিজম-য়ের দিক দিয়ে বলতে গেলে, শামুকের মত মন্থর গতিতে উপেনের বিপাক-ক্রিয়া চলবে, না, খরগোসের মত দ্রুত গতিতে ধেয়ে যাবে—এইটা কন্ট্রোল করতে হয় আমাকে। মেটাবলিজম্ জিনিসটা কি আপনি জানেন; জীবদেহের ভেতরে যে-সব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে নানান ধরনের ভুক্তপদার্থ বিশ্লিষ্ট হয়ে নতুন নতুন পদার্থের উৎপত্তি ঘটে, একেই বলে মেটাবলিজম। এর ফলেই জীবদেহের পুষ্টি আর বৃদ্ধি হয়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিপাক ক্রিয়া বেড়ে গেলে সর্বনাশ। কমে গেলেও সর্বনাশ। ঠিক মত চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব এই শর্মার।

কামারের হাপরের সঙ্গে তুলনা করতে পারেন আমাকে। জীবনের আঁচে হাওয়া দিই আমি। উপেনের লক্ষ কোটি কোষ কি হারে কতখানি গতিবেগে খাদ্যকে এনার্জিতে রূপান্তরিত করবে—তা শাসন করি। আঁচ নিভু-নিভু করে আনতে পারি, অথবা লক লকে করে তুলতে পারি। আমার

হরমোন উৎপাদন যদি স্বাভাবিকের চাইতে খুব বেশী কমিয়ে আনি, মাই-ক্রোসকোপের চিমটিতেও যা ধরা মুস্কিল হবে—তাহলে থলথলে চেহারায় হাঁস-ফাঁস করতে থাকবে উপেন, হবে কুঁড়ে আর জড় প্রকৃতির, বুদ্ধি হবে ভোঁতা, আধা-উদ্ভিদ বললেও অত্যুক্তি হবে না।

ঠিক উল্টোটা যদি ঘটে, যদি স্বাভাবিকের চাইতে বেশী মাত্রায় হরমোন উৎপাদন আরম্ভ করি, তাহলে উপোসী নেকড়ের মতই ক্ষিধেয় ছটফট করবে উপেন. পেট ভরে খেয়েও চেহারাটা থাকবে তালপাতায় সেপাইয়ের মত হ্যাংলাপানা—কেন না খাবারকে অত্যন্ত দ্রুত বেগে পুড়িয়ে এনার্জি বানিয়ে

থাইরয়েড
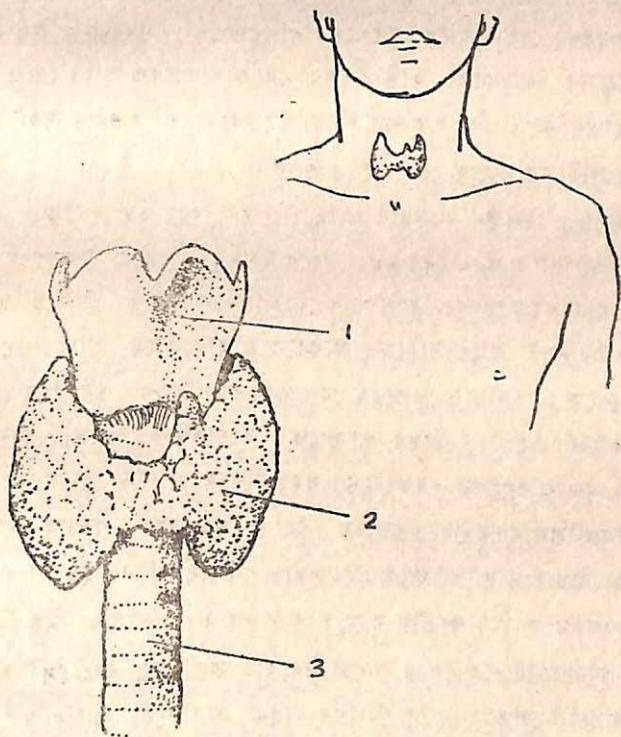
১। অ্যাডামস্ অ্যাপ্‌ল্ (কণ্ঠমণি); ২। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড; ৩। শ্বাসনালী;

নেবে উপেন। ঠেলে বেরিয়ে আসবে চোখ—এত ঠেলে আসবে যে চোখের পাতা পুরোপুরি বন্ধ হবে না। ছায়া দেখলে চমকে চমকে উঠবে। দড়ি দেখে সাপ মনে করবে। ভীষণ ভীতু তার অসম্ভব নার্ভাস হবে বেচারা। মানসিক রোগেও পড়তে পারে। হৃৎপিণ্ড ছুটবে পাঞ্জাব মেলের মত। এত তাড়াতাড়ি ছুটলে যা হয়, শেষ পর্যন্ত আর জীবনটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারবে না হৃদযন্ত্র—মারা যাবে অকালে।

উপেনের অন্যান্য অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির মত আমিও একটা ক্ষুদে কেমিক্যাল কারখানা। রক্ত স্রোত থেকে বিভিন্ন উপাদান তুলে নিয়ে এটার সঙ্গে সেটা জুড়ে জটিল হরমোন বানিয়ে চলেছি। আমার মূল দুটো হরমোন—থাইরক্সি আর ট্রাই-আয়োডো থাইরোনিন-য়ের দুই তৃতীয়াংশই হল আয়োডিন। রোজ আমার ১৮০ মাইক্রোগ্রামের মত আয়োডিন দরকার হয়। চাহিদা অতি সামান্য। কিন্তু এই অল্প চাহিদার সামান্য হেরফের ঘটলেই আকাশ পাতাল প্রভেদ দেখা যাবে উপেনের বুদ্ধিবৃত্তিতে। নিরেট মস্তিষ্ক হওয়া অথবা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে শৈশব থেকে স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে ওঠা, বড় হয়ে আত্মশক্তিতে ভরপুর হওয়া অথবা কুঁড়ের বাদশা হওয়া—সবই নির্ভর করছে আয়োডিনের সামান্য হেরফেরের ওপর।

রসায়নশাস্ত্রে বিলক্ষণ সমঝদার আমি বুঝতেই পারছেন। কিন্তু খুঁটি-নাটি নিয়ে আপনাকে জ্ঞান দেব না। তবে এমন দু-চারটে উজ্জ্বলতম দিক আপনার চোখের সামনে তুলে ধরব যে আপনার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। আয়োডিন জিনিসটা আয়োডাইডের আকারে আমার কাছে আসছে উপেনের পাচনতন্ত্র থেকে। আমার ভেতরেই বেশ কয়েকটা নিজস্ব এনজাইম আছে রকমারি কাজের জন্যে। এদের প্রত্যেকের রাসায়নিক ক্ষমতা আলাদা। (শরীরের অন্যান্য অংশের এনজাইমের খবর নিশ্চয় আপনি রাখেন। মুখের লালাতে টায়ালিন নামে যে এনজাইম উৎপন্ন হয়, তার প্রভাবে সংঘটিত রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে খাদ্যের শ্বেতসার শর্করায় পরিণত হয়। পেপ্‌সিন নামক এনজাইম আমিষ জাতীয় খাদ্য হজম করায়।) আমার নিজস্ব এন-জাইমেরা আয়োডাইডকে ভেঙে আয়োডিন বার করে নেয় এবং সেই আয়ো-ডিনকে আমারই ভেতরকার টাইরোসিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্গে গেঁথে দেয়। রাসায়নিক শুভবিবাহটি হয়ে যাওয়ার পর আমি আমার প্রধান দুটি হরমোন বানিয়ে নিতে পারি। এই হরমোন দুটিই তখন উপেনের

রক্তের প্রোটিন-লাগোয়া হয়ে ওর দেহের দূরতম প্রান্তেও বেড়াতে যেতে পারে।

আমার হরমোনদের শক্তিমত্তা শুনলে কিন্তু তাক লেগে যাবে আপনার। থাইরয়েড হরমোন ছাড়া বেঙাচি কখনো ব্যাঙ হতে পারবে না। উপেনের দেহে যত কোষ আছে, কার্যতঃ তা প্রতিটিকে উদ্দীপ্ত করে আমার হরমোনেরা। কোটি কোটি কোষদের কেউ বাদ যায় না। এহেন প্রচণ্ড শক্তিমত্তা এদের মধ্যে নিহিত আছে বলেই, হরমোনদের কড়া শাসনে রাখতে হয়—চুলচেরা বিচারে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। ঠিক যে সময়ে যে-টুকু এনার্জির দরকার, সেইটুকু ছাড়তে হয়—তার বেশী নয়। উপেনের বউ উমা যখন গর্ভবতী, তখন স্বাভাবিক মাত্রার চাইতে সামান্য বেশী হরমোন ছেড়েছে ওর থাইরয়েড বিশেষ চাহিদা মিটোনোর জন্যে। উপেন যখন ঘুমোয়, এনার্জির চাহিদা তখন সবচেয়ে কম। কিন্তু সামান্যতম তৎপরতাও চড় চড় করে বাড়িয়ে দেয় চাহিদার মাত্রা। শুধুমাত্র বিছানায় উঠে বসলেও বেশ বেড়ে যায় ওর এনার্জির চাহিদা, দাঁড়ালে আরো বেশী; সেই রকম কঠোর ব্যায়াম করলে বাড়ে বহুগুণ বেশী।

কঠোর মানসিক ব্যায়ামে অবশ্য এনার্জির চাহিদা বাড়ে কদাচিৎ।

আমার হরমোন উৎপাদনের ব্যাপারে যে-টুকু নিয়ন্ত্রণের দরকার, তাতে আমাকে সাহায্য করে আরো দুটি অন্য গ্ল্যাণ্ড। উপেনের ব্রেনে হাইপোথ্যালামাস নামে যে টিশুর দলাটি রয়েছে, তা ওর ব্রেনের তলার দিকের পিটুইটারীকে উদ্দীপ্ত করে। ফলে, পিটুইটারী উৎপাদন করে থাইরোট্রপিন নামক হরমোন। এই থাইরোট্রপিনই আমাকে বলে দেয় কখন কি ধরনের এনার্জির চাহিদা মিটাতে সক্রিয় হতে হবে আমাকে। বেশী হরমোন যদি উৎপাদন করি, বাড়তিটুকু গিয়ে পিটুইটারীর উদ্দীপনা বন্ধ করে দেয়। রাসায়নিক ক্রিয়ার এই লেনদেনের ফলেই উৎপাদন ভারসাম্য বজায় রেখে চলে আপনা হতেই।

তাহলেই দেখছেন, আমাকে যুগপৎ নিয়ন্ত্রণ করছে স্নায়ু আর কেমিক্যাল। স্নায়বিক কন্ট্রোল আর কেমিক্যাল কন্ট্রোল আছে বলেই আমি ঠিক আছি। এই কারণেই অনেকের বিশ্বাস অতিরিক্ত মানসিক চাপে, উদ্বেগে আর দুশ্চিন্তায় থাইরয়েড অতিরিক্ত মাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে, ভীষণ ভয়কাতুরে হয়ে ওঠে উপেন—এমন কি মানসিক হাসপাতালেও যেতে হতে পারে। ফ্যামিলিতে

থাইরয়েড

কেউ মারা গেলে, ব্যবসায়ে বিরাট লোকসান হলে, চাকরী যাওয়ার সম্ভাবনা দেখে গেলে, সিরিয়াস রকমের গাড়ীর অ্যাকসিডেন্ট হলে, বড় রকমের অপারেশন ঘটলে, দাম্পত্য জীবনে গোলমাল দেখা দিলে এবং এই ধরনের সব কিছুই ওপর ওপর মাসের পর মাস বছরের পর বছর মনের ওপর উদ্বেগের চাপ সৃষ্টি করে চললে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দেখা দেবেই। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্রেন হাইপোথ্যালামাসকে দিয়ে পিটুইটারীকে অতিরিক্ত মাত্রায় উদ্দীপ্ত করবে—পিটুইটারী করবে আমাকে। এমন গতিবেগে উপেনকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব আমি যে ওর পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব হবে না।

অনেক ক্ষেত্রে আমি আবার উপেনের দেহের দুর্বলতম অংশগুলোর অন্যতম। অনেক ধরনের গোলমাল ঘটতে পারে আমাকে নিয়ে। আমার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এমনই সূক্ষ্ম এবং সঠিক, আবার হরমোন-উৎপাদন ব্যবস্থা অন্যান্য কয়েকটা ব্যাপারের ওপর এমনই নির্ভরশীল যে এদের কোথাও কোনো বিচ্যুতি ঘটলেই গোলমাল অবশ্যম্ভাবী।

খুব সাধারণ যে গোলমালটা দেখা যায় তা হল আয়োডিনের অভাব। বিলেত আমেরিকার কথা আলাদা। সেখানকার মানুষের খাবারে আয়োডিনের অভাব বড় একটা দেখা যায় না, সমস্যাও খুব একটা ঘটে না। উন্নত দেশ তো? এছাড়া সমুদ্রের ধারে কাছে যে সব শাকসব্জী হয় তাতে আর সামুদ্রিক খাবারে আয়োডিন থাকে যথেষ্ট পরিমাণে। যদি এই ধরনের খাবার না পাওয়া যায়, তাহলে আয়োডাইড মিশোনো লবণে আয়োডিনের চাহিদা মিটোনো হয় উন্নত দেশের লোকেদের—সেইসঙ্গে চাহিদা মেটে আমারও। কিন্তু পৃথিবীর অন্য জায়গার মানুষদের কপাল এত ভাল নয়। পাহাড়ি জায়গায় মাটিতে আর জলেতে আয়োডিন প্রায় থাকে না বললেই চলে। একই ঘাটতি দেখা যায় সেই সব জায়গায় এককালে যেখান দিয়ে হিমবাহ গিয়েছে। এই সব অঞ্চলের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আয়োডাইড মিশোনো লবণও পাওয়া যায় না।

আয়োডিনের ঘাটতি ঘটলেই আমাকে বড় হতে হয়—লক্ষ লক্ষ নতুন কোষ নিজের সঙ্গে জুড়ে নিই শুধু একটা উদ্দেশ্য সাধন করতে—ধরে বেঁধে আনো আয়োডিন যেখান থেকে পারো। পাঁচগুণ ওজন বেড়ে যায় আমার। ব্যায়রামটার নাম সিম্পল বা 'নন-টক্সিক' গয়টার—দুষ্ট নয়। আয়োডিনের অভাব থেকে থাইরয়েড বৃদ্ধি ঘটে, বিব্রত হতে হয় তখনই যখন আকার এত বৃদ্ধি পায় যে শ্বাসনালী বন্ধ করে দেওয়ার উপক্রম করে।

বেশ কয়েকটা জিনিস আমার মধ্যে মন্থর গতি এনে আপেক্ষিক নিষ্ক্রিয় করে তুলতে পারে। বংশগত ত্রুটি অথবা বিশেষ কয়েকটা ওষুধ বা অসুখে আমার বিষম কঠোর এনজাইমদের একটিও যদি বিনষ্ট হয়, হরমোন উৎপাদন কমে যাবে আমার—বন্ধও হয়ে যেতে পারে। আরও আছে। হঠাৎ আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে আর নয় এবার তল্পিতল্পা গুটিয়ে কাজ-কারবার লাটে তুলবো, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যাবো, অথবা আমার কাজের টিশুদের বদলে এমন অকাজের থাইরয়েড টিশুদের ঠাঁই দেব যে তাদের আর দেহযন্ত্র আখ্যা দেওয়া যাবে না। অথবা উপেনের পিটুইটারী বিকল হতে পারে, তখন আমাকে উদ্দীপনা জোগাতে যে টুকু হরমোনের দরকার তা এতই কম মাত্রায় উৎপাদন করবে যে আমার দফারফা হয়ে যেতে পারে। এর ঠিক উল্টোদিকের সমস্যাগুলোও কিন্তু শোনবার মত। বেশ কিছু জিনিস আমাকে অতিরিক্ত মাত্রায় উৎপাদন-শীল করে তুলতে পারে—তখন আকারে বিরাট হতে হয় আমাকে—আয়োডিন না থাকলে কোষ সংখ্যা বাড়িয়ে যেমন সাইজ বাড়াই, এক্ষেত্রেও কোষ সংখ্যা বাড়িয়ে সাইজ বাড়িয়ে নিই। এই গোলমালটার নাম 'টক্সিক' গয়টার। থাইরয়েডের এই ধরনের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি শরীরের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।

আমার অন্যান্য অসুখের অন্যতম হল ক্যানসার। তবে আমাকে যে ক্যানসার আক্রমণ করে তার আক্কেল আছে, আদবকায়দাও জানে। এক জায়গাতেই আবদ্ধ থাকে—চারদিকে ছটফটিয়ে বেড়ায় না। ছুরী কাঁচি নিয়ে শল্যচিকিৎসক তাকে কেটে বাদ দিতে পারে—সেরে ওঠবার আশা থাকে খুব বেশী। অথবা থাইরয়েড বড়ি খাইয়ে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি রোধ করে সাইজ কমিয়ে আনা যেতে পারে।

উপেনের কপাল ভাল আমার অসুখবিসুখের মোকাবিলা করার ব্যাপারে অনেক খবরাখবর রাখেন ডাক্তাররা—খুব সম্ভব ওর অন্যান্য অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিদের ক্ষেত্রেও তাঁদের এত জ্ঞান নেই। আমি মন্থরগতি হলেই উপেনকে ওরা চাঙা করে তোলেন বড়ির আকারে নিখোঁজ হরমোন খাইয়ে। ওষুধের খবর তাঁরা রাখেন যাদের সাহায্যে আমার এনজাইমদের বাগে এনে হরমোন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। অথবা জল আর রেডিও-অ্যাকটিভ আয়োডিন গিলিয়ে দিতে পারেন উপেনকে, সাধারণ আয়োডিনের মতই এই

আয়োডিন সটান চলে আসবে আমার কাছে, রেডিয়েশন (বিকিরণ) আরম্ভ হবে তৎক্ষণাৎ। গাঁট্টা মেরে শায়েস্তা করবে আমার অতিরিক্ত মাত্রায় উৎপাদনশীল কোষদের। রেডিও-অ্যাকটিভ আয়োডিন বিনষ্ট হয় খুব তাড়াতাড়ি, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায় যাবতীয় বিকিরণ।

এই সব উপায়ে বেশীর ভাগ অতি-সক্রিয় থাইরয়েডের চিকিৎসা সম্ভব। অবশ্য কিছু রুগীর ক্ষেত্রে অপারেশনের দরকার হয়। সার্জন তখন ঠিক করেন আমার ঠিক কতখানি কেটে বাদ দিতে হবে। খুব কম বাদ দিলে আগের মতই খুব বেশী হরমোন উৎপাদন করে চলব ; খুব বেশী বাদ দিলে হরমোন বড়ি খাইয়ে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে।

আমি যে নষ্টামি করতে যাচ্ছি, ডাক্তার তা বোঝেন কি করে? উপেন যদি লম্বা করে সামনে হাত বাড়ায় এবং তখন হাতের আঙুল থির থির করে কাঁপতে থাকে, যদি সব ব্যাপারেই নার্ভাস বোধ করে এবং ঘুমের সমস্যা দেখা যায়, যদি রাক্ষুসে ক্ষিদে সত্ত্বেও ওজন কমতে থাকে, তাহলেই যে কোনো ডাক্তার সন্দেহ করেন নিশ্চয় আমি অতি-সক্রিয় হয়েছি। যদি ওর মুখ ফুলো ফুলো লালচে হয়, তাহলে সন্দেহ করেন সক্রিয়তা আমার স্বাভাবিকের চাইতে কমে এসেছে। নিদানকে সাহায্য করার জন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও আছে। একটা টেস্টের কথা বলা যাক। রক্তের নমুনা নিয়ে তাতে দেখা হয় রক্তের প্রোটিনের মধ্যে হরমোনের পরিমাণ কতখানি। আগেই বলেছি হরমোনরা উপেনের রক্তের প্রোটিন-লাগোয়া হয়ে দেহের দূরতম প্রান্তেও বেড়াতে যেতে পারে। সুতরাং ভ্রমণরত হরমোনদের প্রোটিন-লাগোয়া অবস্থায় মেপে নিলেই হল। আমার সক্রিয়তা টেষ্ট করার চমৎকার উপায় কিন্তু এইটাই।

আমার বিশ্বাস এখনো আমার মধ্যে এমন অনেক গুপ্তরহস্য আছে যা বৈজ্ঞানিকদের আজও অজ্ঞাত। গবেষণার ফলে ক্যালসিটোনিন নামে আরেকটা হরমোন আবিষ্কৃত হয়েছে আমার মধ্যে। ক্যালসিয়াম শরীরের অন্যতম বড় রকমের খনিজ—হাড় আর দাঁতের মূল উপাদান। প্যারা-থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডক্ষরিত হরমোন মূলতঃ হাড় থেকে ক্যালসিয়াম টেনে এনে উপেনের রক্তের ক্যালসিয়াম পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। খুব বেশী ক্যালসিয়াম বার করে আনলেই হাড়ের জোর কমে আসে। এই বিপর্যয়কে রোধ করে আমার ক্যালসিটোনিন। ভারসাম্য বজায় রাখে এই ধরনের তাল-

কেটে-যাওয়া ব্যাপারে।

বুড়ো বা বয়স্কদের হাড়ের বিকৃতি বা ব্যথার মূলে যে অবাধ্য রোগকে শাসন দিয়ে শায়েস্তা করা যায়নি আজও তার চিকিৎসাতে খুবই কাজ দিতে দেখা গিয়েছে ক্যালসিটোনিনকে। মনে হতে পারে এ ছাড়া বুঝি এই হরমোনের আর কোনো কাজকর্ম নেই—ক্ষমতা সীমিত—কিন্তু সব তথ্য কি আজও জানা গেছে? আজ্ঞে না। তাই পরমানন্দে বলতে পারি আমার নাড়ি নক্ষত্রের সন্ধান এখনো পর্যন্ত পাননি বলেই দিব্বি নিরাপদে আছি আমি।

থাইমাস

উপেনের গ্ল্যাণ্ড-ফ্যামিলির খুব হীন আত্মীয় হিসেবে আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হয়েছিল এই সেদিন পর্যন্ত। অ্যাপেনডিক্স জিনিসটা যেমন বহু বিবর্তনের পরে পড়ে থাকা একটা দেহাংশ ছাড়া আর কিসৃসু নয়, যার নিজস্ব কোনো উৎপাদন ক্ষমতা নেই, যে খুব সম্ভব অমঙ্গল করতে পারে, মঙ্গল কণামাত্রও করে না—আমাকেও দেখা হত সেইভাবে।

কিন্তু দিন পালটেছে! আচম্বিতে আমি চিকিৎসা গবেষণায় সাড়া ফেলেছি—আমিই এখন মেডিক্যাল রিসার্চের সবচেয়ে গরম বিষয়—অ্যালার্জি আর আর আরথ্রাইটিস থেকে শুরু করে ক্যানসার আর জরা পর্যন্ত বহু সমস্যার সম্ভাব্য চাবিকাঠি নাকি আমি, এই ধরনের দৃঢ় বিশ্বাস দেখা দিয়েছে বৈজ্ঞানিকদের মনে। উপেনের থাইমাস গ্ল্যাণ্ড আমি।

চেহারা আমার খুবসুরৎ নয়—আহামরি কিছু নয়। হলদে-ধূসর টিশুর একটা অকিঞ্চিৎকর পিণ্ড। সাইজ একটা দেশলাইয়ের বাক্সের মত। উপেনের বুকের মাঝের হাড়ের ঠিক মাথায় চড়ে বসে আছি দুই ফুসফুসের মাঝখানে। সাইজে আমি কতখানি হব, তা নির্ধারণ করে দেয় উপেনের বয়স। ওর বয়স এখন ছেচল্লিশ। এই বয়েসে আমার ওজন এক আউন্সের তিনভাগের এক ভাগ মাত্র। কিন্তু উপেন যখন জন্মেছিল, তখন ওজন ছিল ঠিক এর ডবল। হল তার ছ' গুণ যখন পোঁছোলো বয়ঃসন্ধিতে।

চটকদার দেহযন্ত্রের ভূমিকায় আমি রয়েছি, এই বিশ্বাস ডাক্তারদের মনে শেকড় গেড়ে বসে যাওয়ার পর থেকেই গালভরা খেতাব দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে আমাকে। আমাকে বলা হয় 'রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতার রাজসিংহাসন'। দেহের ক্ষতির কারণ হতে পারে, এমনি যে কোনো সর্বনাশা আগন্তুককে সনাক্ত করা এবং ধ্বংস করাই হল জীবদেহের রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা (ইমিউনিটি)। ক্ষতিকারক আগন্তুকদের মধ্যে প্রায় সকলেই আছে —ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস, ভুল টাইপের রক্ত, আঙুলে লোহা, কাঁচ বা কাঠের কুচি, ছত্রাক, ক্যানসার কোষ, বিষ, একজনের টিশু আরেকজনের দেহে বসিয়ে দেওয়া (ট্রান্সপ্লান্টেড টিশু)—নামের শেষ নেই। আপনি নিজেও

শেষ করতে পারবেন না।

উপেনের দেহটাকে একটা কেল্লা বলতে পারেন। সৈন্যবাহিনী মোতা- আছে অষ্টপ্রহর আগন্তুক দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে—উপেনের মধ্যে যা নেই, তা সে যাই হোক না কেন—অ-উপেন হলেই হল, আর তার রক্ষে নেই। উপেনের এই বিরাট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মূল অংশ হলাম আমি। পৃথিবীর যে কোনো দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার চাইতে কম জটিল নয় উপেনের দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা—কম নয় তার সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্র। ধরনটা কেবল আলাদা—দেহদুর্গের উপক্ত করে তৈরী ফৌজ। এদের অনেককেই শক্তি জুগিয়ে যাই আমি। প্লীহা (Spleen), লসিকা গাঁট (Lymph-

থাইমাস
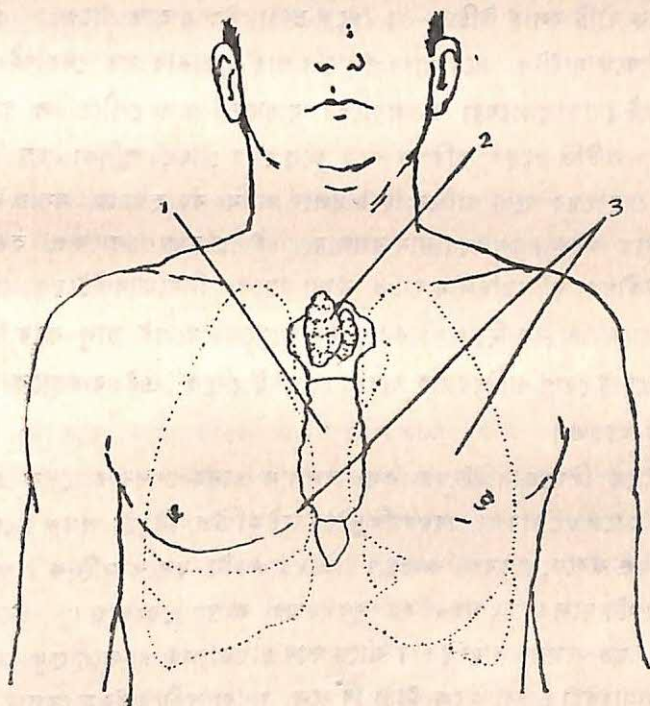
১। বুকের হাড় ; ২। থাইমাস ; ৩। ফুসফুস ;

Nodes), হাড়ের মজ্জা, টনসিল, গলরস-গ্রন্থি (Adenoids) এবং সম্ভবতঃ অ্যাপেনডিক্স আর অন্ত্রের কিছু অংশ এদের মধ্যে রয়েছে।

আমার গুরুত্ব যে কতখানি তা একটা ব্যাপার শুনলেই বুঝবেন। উপেন যখন মায়ের পেটে, তখন আমি ছিলাম ওর হৃৎপিণ্ডের চাইতেও বড়, এমনকি ফুসফুসের চেয়েও বড়। আমাকে ছাড়া উপেন যদি ভূমিষ্ঠ হত—অনেক নবজাতকের ক্ষেত্রেই এমনটা দেখা যায় কস্মিন কদাচিৎ—তাহলেই অতি তুচ্ছ কোনো সংক্রমণের ফলেই প্রাণসংশয় উপস্থিত হত বেচারার। দুর্বল, হীনবল, কাহিল শিশুটির ধুকপুকে হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যেত মাস কয়েকের মধ্যেই।

কিন্তু তা ঘটেনি। আমাকে নিয়েই জন্মেছে বলে নিজে থেকেই সংক্রমণের সঙ্গে লড়তে শিখেছে উপেন। ভূমিষ্ঠ হয়েই তৈরী হয়েছে লড়বার জন্যে। পুঁচকে দেহদুর্গকে সুরক্ষিত রেখেছি আমি। হাড়ের মজ্জার ভেতরে ছিল খুব ছোট ছোট অণুবীক্ষণে দেখা যায় এমনি সাদা কোষ। অপরিপক্ব বীচি বলাই উচিত—যা থেকে চারা উৎপন্ন হতে পারে। এদের নাম লিমফোসাইট। সবে পাখা গজানো পাখীর ছানার মত নেহাৎই অনভিজ্ঞ এই যোদ্ধা কোষেরা রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে এসে পৌঁচেছিল আমার কাছে। ঝটিতি এদের পরিপক্ব করে তুলে ফের প্লীহা, লসিকা তন্ত্র এবং অন্যান্য দেহযন্ত্রের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আমি বড় হওয়ার সময়ে কাজে লাগানোর জন্যে। যাদের নাম বললাম, এই দেহযন্ত্রগুলোকেও হরমোন দিয়ে উদ্দীপনা জুগিয়েছিলাম যাতে কাঁচা বয়সের লিমফোসাইটদের ঠেলেঠুলে কাজে ভিড়িয়ে দিতে পারে। দিন কয়েকের মধ্যেই চালু করে দিয়েছিলাম ছোট্ট রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা। সেই থেকে এই ব্যবস্থাকে চালু রেখেছি আজও।

এই যে লিমফোসাইটদের কথা বললাম এদের গুণপনার শেষ নেই। দারুণ কাজের কোষ। এদের কিছুটা ডিটেকটিভ, কিছুটা ঘাতক। গোয়েন্দাগিরিও করছে, খতমও করছে। এদের একটা দলকে সৃষ্টি করি আমি, আর একটা দলের উৎপাদন হয় খুব সম্ভব অন্ত্রের কোথাও। উপেনের শরীরে যত রক্তের সাদা কোষ আছে তার চারভাগের একভাগ শুধু এরা—লিমফোসাইটরা। আঙুলে কাঁটা বিঁধলে অথবা শরীরে ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাস ঢুকলে অথবা পুঁজ সৃষ্টি করে যারা সেই স্ট্যাফাইলোকক্কাসের আবির্ভাব ঘটলে চক্ষের পলকে চিনে নেয় বিপুল শক্তিমত্তা নিয়ে দেহদুর্গে

প্রবেশ করেছে যারা—সেই আগন্তুক শত্রুদের। হাঁকডাক দিয়ে বিপদ-সঙ্কেত বাজিয়ে দেয় তক্ষুনি।

ধরা যাক, উপেন আঙুল কেটে ফেলেছে, ছোটখাট সংক্রমণ আরম্ভ হল সেই কাটা জায়গায়। কিন্তু সদা সতর্ক লিমফোসাইটদের কাছে ছোটখাট বলে কোনো কথা নেই। শত্রুকে তাচ্ছিল্য করাটা কি ঠিক? তৎক্ষণাৎ অ্যান্টিবডি ঢালতে থাকে হুড়হুড় করে—পদাঙ্ক অনুসরণ করার ডাক দেয় অন্যান্য কোষদেরও। এক-একটা অ্যান্টিবডির এক-এক ধরনের কর্তব্য—এক-এক ধরনের আগন্তুককে ঘায়েল করার জন্যে বিশেষ ভাবে তাদের সৃষ্টি। কেউ নিপাত করে মামস্-য়ের জীবাণুকে কেউ হুপিং-কাফের—এইভাবে আলাদা আলাদা কাজ নিয়ে হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে তেড়ে যায় অ্যান্টিবডিরা। উপেন নিজেও জানে না ওর দেহদুর্গের মধ্যে লাখ দশেক এমনি অ্যান্টিবডি দিনরাত আগলাচ্ছে ওকে—এদের চোখ এড়িয়ে যাওয়া শত্রুদের পক্ষে সম্ভব নয় কোনমতেই।

অ্যান্টিবডি বস্তুটা কি কেউ যদি জানতে চান এই ফাঁকে বলে রাখি। বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধের স্বাভাবিক উপায়স্বরূপ (ইমিউনিটি) জীবের রক্তে রোগজীবাণু ঢুকলেই স্বভাবতঃ যে-সব জৈব রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয় তাদেরই নাম অ্যান্টিবডি। রক্তে প্রবিষ্ট জীবাণুরা এদের প্রভাবে বিনষ্ট হয়, বা এদের রাসায়নিক ক্রিয়ায় জীবাণুদের বিষ রস নির্বিষ হয়ে পড়ে।

এহেন নিঃশব্দ সঞ্চারী নীরব কর্মী অ্যান্টিবডিরা কাটা জায়গার লক্ষ লক্ষ জীবাণুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সংহার করে তাদের। ইতিমধ্যে ফ্যাগো-সাইটদের সঙ্গে এসে ভিড়ে যায় লিমফোসাইটরা। ফ্যাগোসাইটরাও রক্তের সাদা কোষ। নিহত বা নির্বিষ জীবাণুদের স্রেফ খেয়ে নিয়ে আবর্জনা সাফ করে দেয় এরা। কোনো উৎপাত না ঘটিয়ে সেরে যায় উপেনের কাটা আঙুল। উপেন তা নিয়ে মাথাও ঘামায় না—জানতেও পারে না যে ঐটুকু কাটা জায়গাতেই রীতমত একটা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়ে গেল।

মাঝে মাঝে সদা হুঁশিয়ার লিমফোসাইটরা বিপদকে অতিরঞ্জিত করে দেখে। বিপদ নিয়ে বাড়াড়ি করে। তিলকে তাল বানিয়ে নেয়। ফলে এত প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ করে যে বিরক্তিকর অনেকগুলো লক্ষণ বিব্রত করে তোলে উপেনকে। ধরুন এই ধরনের একটা বহিরাগত উৎপাতের নাম

পরাগরেণু। নিরীহ বস্তু। কিন্তু অতি-আক্রমণের ফলে যে বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়—তারই নাম অ্যালার্জি। আর পাঁচজনের মত উপেনের ছোটখাট মৃদু মাঝারি অ্যালার্জি আছে। নাকানি চোকানি খেতে হয় বেচারীকে এদের নিয়ে। ধুলোয় অ্যালার্জি, চিংড়ি মাছে অ্যালার্জি, কাঁকড়ায় অ্যালার্জি—বলুন দিকি কাঁহাতক সহ্য করা যায়? অসহ্য ঠিকই। লিমফোসাইটরা এতটা বাড়াবাড়ি না করলেও পারে—কিন্তু এ থেকে অন্ততঃ একটা বিষয় উপেনের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত। ওর ইমিউনিটি ব্যবস্থা যে মরে যায় নি—রীতিমত সক্রিয়—এই থেকেই তা হাড়ে হাড়ে বোঝা যায়।

আগেই বলেছি হ'দুটো ইমিউনিটি ব্যবস্থা আছে উপেনের। একটা সদরদপ্তর সম্ভবতঃ অন্ত্রে; মূলতঃ ব্যাকটিরিয়া আর ভাইরাস আক্রমণের মোকাবিলা করাই এদের কাজ। আমার লিমফোসাইটরা ব্যাকটিরিয়া আর ভাইরাসদের ছেড়ে কথা কয় না ঠিকই, কিন্তু তাদের পয়লা নম্বর শত্রু হল অ্যালারজেন, বহু রকমের ছত্রাক (ফানগাস) সংক্রমণ, এবং বহিরাগত বিদেশী টিশু। ধরুন, উপেনের লিভার ফেলে দিয়ে নতুন লিভার বসানো হল—এক কথায় যার নাম লিভার ট্রান্সপ্লান্ট। সময় থাকতেই যদি লিমফোসাইটদের দমিয়ে রাখা না যায়, তাহলেই নতুন লিভারকে বলে বসবে, এই উটকো উৎপাতটা আবার কোত্থেকে এলো উপেনের দেহে—হটাও উস্‌কো! ব্যস, নতুন লিভারকে বাতিল করে দেবে লিমফোসাইট বাহিনী দলে দলে অ্যান্টিবডি ফৌজ উৎপাদন করে। এই কারণেই ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারীর আগে ওষুধপত্র আর রেডিয়েশন (বিকিরণ) দিয়ে আমাকে যারা খাড়া করে রেখেছে সেই সব দেহযন্ত্রদের নিষ্ক্রিয় করে রাখে। সাময়িকভাবেও আমরা যদি মঞ্চ থেকে বিদেয় নিই, বাঁধ ভাঙা বন্যার জলের মত সংক্রমণের তোড়ে ট্রান্সপ্লান্ট রুগী বেচারী বৈতরণী পেরিয়ে যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তে।

জীবন যত ফুরিয়ে আসে, অন্যান্য সব কিছুর মতই ইমিউনিটি প্রতিক্রিয়াও মন্থরগতি হয়ে আসে। এই কারণেই কি ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী বয়েসেই বেশী দেখা যায় অল্প বয়েসের চেয়ে? মনে তো হয় তাই। সম্ভব হলেও হতে পারে। আর একটা বিষয়ও প্রণিধান যোগ্য। দীর্ঘদিন ধরেই ডাক্তাররা একটা অদ্ভুত ব্যাপার নিয়ে ভেবে ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না। বেশ কিছু ক্যানসার আপনা থেকেই সেরে যায়—ডাক্তারী শাস্ত্রে যত রকম কারণ জানা আছে, সে রকম কোনো কারণ না দেখিয়েই বেমালুম

মিলিয়ে যায় ক্যানসার। 'স্বতঃ প্রবৃত্ত ক্যানসার নিরাময়' নিয়ে অনেক রকম সন্দেহ করেছেন ডাক্তাররা—জবাব পাননি। রহস্যময় কেসগুলো নথিভুক্ত হয়ে রয়েছে—কিন্তু সমাধান আজও রহস্যাবৃত। দুটো সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আমি তুলে ধরতে চাই।

হয়তো কোনো কারণে সাময়িক ভাবে অকেজো হয়ে যায় ইমিউনিটি ব্যবস্থা। ফাঁকতালে টুক করে ঢুকে পড়ে ক্যানসার। তারপরেই নিজেই নিজেকে সারিয়ে নেয় ইমিউনিটি ব্যবস্থা—সজাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল বিক্রমে হামলা চালায় ক্যানসারের ওপর। পত্রপাঠ বিদায় নিতে হয় ক্যানসার মহাপ্রভুকে। এমনও হতে পারে যে অস্ত্রোপচার করে ক্যানসার গ্রস্ত টিশুর বেশ খানিকটা বাদ দেওয়ার পর টিউমারের বাকী অংশটাকে খতম করে ছাড়ে ইমিউনিটির কলকব্জা। পুরো টিউমারটাকে বাগে আনতে না পারলেও পড়ে থাকা ছুটকো-ছাটকাকে শায়েস্তা করতে পারে এরা মাঝে মাঝে। কিছু রুগী এই ভাবে সেরে উঠতে পারে—বিশেষ করে যারা বাচ্চা। দুর্বোধ্য এই হেঁয়ালির সঠিক জবাব দিতে পেরেছি, এতটা বড়াই করা আমার পক্ষে ঠিক নয়, তবে যা বললাম তার মধ্যে যুক্তি আছে। নয় কি?

আমার ইমিউনিটি ব্যবস্থার মত এইরকম একটা জটিল ব্যবস্থা চিরকাল সুষ্ঠুভাবে চলবে, এমনটা আশা করা যায় না। মাঝে মাঝে বিষম ভুল করে বসে আমার লিমফোসাইটরা। দেহের স্বাভবিক টিশুকেও বিদেশী বস্তু মনে করে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিকেশ করার জন্যে। অস্থিসন্ধির লাইনিং আক্রমণ করে এমন যন্ত্রণাদায়কভাবে ফুলিয়ে দেয় জায়গাটা যে উপেন তখনই ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়ে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন—এরই নাম রিউম্যাটয়েড আরথ্রাইটিস। উত্তেজিত লিমফোসাইটদের বেচাল ব্যবহারটা যদি কোনরকমে শুধরোনো যেত, আরথ্রাইটিস নামক যন্ত্রণাদায়ক রোগটার সবচেয়ে সাধারণ কারণটারও শ্মশানও যাত্রা সম্পূর্ণ হয়ে যেত।

অন্য দশটা মানুষ-জীবের মত উপেনের ক্ষেত্রেও মানসিক পীড়ন আমাকে কাবু করে ফেলে। যে কোনো ধরনের মানসিক পীড়ন দেহের ভেতরকার যন্ত্রপাতিকে ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট—একটানা আওয়াজ, ভয়, ক্লান্তি বা অসুখ এদের যে কোনোর একটাই আমাদের দফারফা করার পক্ষে যথেষ্ট। আমিও দেহের ভেতরকার সূক্ষ্ম একটা যন্ত্র। এইসব

পীড়ন যাদের আগে মারে, আমি তাদের অন্যতম। পীড়ন যদি রীতিমত নিদারুণ হয় দিন কয়েকের মধ্যে আমি আমার স্বাভাবিক সাইজের এক সাইজের এক তৃতীয়াংশ হয়ে যাই। সর্বনাশা পীড়নদের মোকাবিলা করার জন্যে আমার একটা মুখ্য ভূমিকা নেওয়া দরকার। কিন্তু ভূমিকাটা কি তা আজও জানি না।

উপেন এখন বড় হয়েছে, এককালে ওর কাছে যতটা অত্যাবশ্যক ছিলাম, এখন আর ততটা নেই। আমার লিমফোসাইট উৎপাদনে এখন আর ততটা সংকটপূর্ণ গুরুত্ব নেই, কেন না অনেক আগেই অন্যান্য দেহযন্ত্রে যে-সব লিমফোসাইট বিলিয়েছি, তারাই এখন সেই সব জায়গায় শেকড় গেড়ে বসে পুরোদমে উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও বলব, হঠাৎ এখন যদি টিউমার-আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হই আমি, রাশি রাশি বিপর্যয় দেখা দেবে উপেনের দেহে : আঙুলের নখ কুরে কুরে খাবে ছত্রাকবাহিনী। মুখ গহ্বরে দেখা দেবে যন্ত্রণ দায়ক ছত্রাক সংক্রমণ, পেশী ফুলে উঠে কষ্ট দেবে, কাহিলও হবে—এই ধরনের আরও অনেক ব্যায়রামে জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে বেচারীর। তাই বলছিলম শেষ জীবনে আমার প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি, তা পুরোপুরি জানা যায়নি আজও।

যা বললাম, তা কিন্তু আমার সদ্য আবিষ্কৃত হরমোন থাইমোসিনের ক্ষেত্রে খেটে যায়। রক্তপ্রবাহে একবার যদি একে ঢেলে দিই, সঙ্গে সঙ্গে গোটা ইমিউনিটি ব্যবস্থাকে উদ্দীপনা জুগিয়ে চলে এই একটা হরমোন : প্লীহাকে চনমনে করে, লসিকা তন্ত্রকে চাঙা করে পর্যাপ্ত পরিমাণে লিমফোসাইট উৎপাদন করার জন্যে। উপেন যদি কড়াডোজের রেডিয়েশনের শিকার হয় কখনো, যদি তার পরিণামস্বরূপ বিকল হয়ে যায় পুরো ইমিউনিটি ব্যবস্থা—তাহলে জীবন দীপকে জ্বালিয়ে রেখে দিতে পারে আমার এই হরমোন—যে প্লীহা আর অন্যান্য দেহযন্ত্র কারখানায় তালা ঝুলিয়ে উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছিল—তারাই ফের উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে পারে এই হরমোনের প্রেরণায়। আমার হরমোন সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত তথ্য কিন্তু আপনার জানা দরকার। উপেন যতই বয়েসে বাড়ে ততই কমে আসে আমার উৎপাদন। ৫০ বছরে পা দেওয়ার পর একেবারেই বন্ধ করে দেব উৎপাদন। জরার মুখ্য ভূমিকায় কি তাহলে এই হরমোন রয়েছে? থাই-মোসিন শরীরে ফুঁড়ে দিলে কি জরাকে ঠেকানো যাবে? জবাবটা আমারই

জানা নেই।

উপেনের দেহে একটা বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন আমি স্বয়ং—বিদঘুটে এই থাইমাস। আমার কাহিনী আজও সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি। স্বভাবতঃই আমাকে নিয়ে এত হইচই হওয়ার ফলে বুক এখন আমার দশহাত। তোষামোদ যতই করুক না কেন সবাই, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আমাকে চিনতে এত দেরী হল কেন বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের? আমি তো জেনেই বসে আছি আমি কে—কিন্তু যাদের মধ্যেই আছি, তারাই আমাকে আবিষ্কার করল এত দেরীতে?

তোবা! তোবা!

অ্যাড্রেন্যাল

গ্রামের ওজমে যদি ধরেন, তাহলে উপেনের দেহে অন্যান্য যন্ত্ররা যত ডিনামাইট ঢোকাতে পারবে, তার চাইতে ঢের বেশী ঢোকাচ্ছি আমি। ইচ্ছে করলে আমি ওকে অকম্মার ধাড়ি করতে পারি, রোগে রোগে পঙ্গু করতে পারি, পাগলা কুত্তার মত উন্মাদ করে তুলতে পারি; মেরেও ফেলতে পারি। এর কোনোটাই অবিশ্যি করিনি। এত ভাল ভদ্রভাবে চলি যে উপেন টেরই পায় না আমার অস্তিত্ব।

উপেনের ডান কিডনীর মাথায় গ্যাঁট হয়ে দেখুন বসে আছি আমি—অ্যাড্রেন্যাল গ্ল্যাণ্ড। অন্য কিডনীটার মাথাতেও দেখুন কেমন ক্ষুদে ঘোড় সওয়ারের মত বসে আছে আমার যমজ অংশীদার। চেহারায় আমি অনেকটা গান্ধী টুপীর মত। লম্বায় আঙুলের ডগায় চাইতে বড় নই। ওজনে মাত্র পাঁচ গ্রাম। কিন্তু শেষ নেই আমার বিপুল প্রতিভার: হরেক রকমের ৫০ টা হরমোন বা হরমোনের বস্তু আমি বানাই—যা সংশ্লেষ করতে কয়েক বিঘে জমির ওপর তৈরী একটা কেমিক্যাল কারখানার দরকার। যদিও রোজ এক আউন্সের এক হাজার ভাগের মাত্র এক ভাগের মতন হরমোন আমি উৎপাদন করি, তা সত্ত্বেও এইটুকু হরমোনই উপেনের দৈনিক কাজ-কর্মের প্রায় প্রতিটিতে মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

জীবন ধারণের পক্ষে আমি নিতান্তই অত্যাবশ্যক। আমাকে অথবা আমার পার্টনারকে বাদ দিয়ে দেখুন না—দু'একদিনের মধ্যেই ইহলোকের মায়া কাটাবে উপেন—যদি না ঝটিতি কৃত্রিম হরমোন খাইয়ে ওকে টিঁকিয়ে রাখা হয়। মন্থর করে দিন আমাদের তৎপরতা, দেখবেন উপেনের জীবনের গতিও মন্থর হয়ে এসেছে। দেখতে দেখতে কাহিল অশক্ত অক্ষম হয়ে যাবে বেচারা—মনে হবে আসল উপেনের একটা ছায়া কোনমতে ধুঁকছে।

উপেন যখন বালক, তখন যদি আমার কিছুটা অংশ অতি-সক্রিয় হত, তাহলেও ফলাফলটা হত চমৎকৃত করার মত। দুদিনেই মাথা ঝাড়া দিয়ে ছোট্ট ছেলে থেকে ছোট্ট লোকে রূপান্তরিত হত উপেন। ভারী হত গলার

স্বর, চড় চড় করে বেরিয়ে আসত দাড়ি গোঁফ, যৌনযন্ত্রের তাগিদে পুরুষালি চেহারা পেয়ে যেত অল্পসময়ের মধ্যেই। হাড়ের যে সব প্রান্ত বাড় সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত খোলা আর নরম থাকে, অকালে তা বন্ধ হয়ে গিয়ে হাড়ের বেড়ে ওঠা পর্যন্ত দিত বন্ধ করে।

দীর্ঘদিন ধরে উপেনের দেহের রহস্যাবৃত দেহযন্ত্র ছিলাম আমি, আমি যে কি করি আর না করি কেউ তা জানত না, শুধু জানত আমাকে বাদ দিলেই মৃত্যু অনিবার্য। রসায়নবিদরা আমার গুপ্ত রহস্য নিয়ে গবেষণা শুরু করার পর জানা গেল আমার বহুমুখী প্রতিভার বৃত্তান্ত। আমার কর্টি-সোনের মত হরমোনের খবর জানবার পর সত্যিই চমৎকৃত হলেন এঁরা,

অ্যাড্রেন্যাল
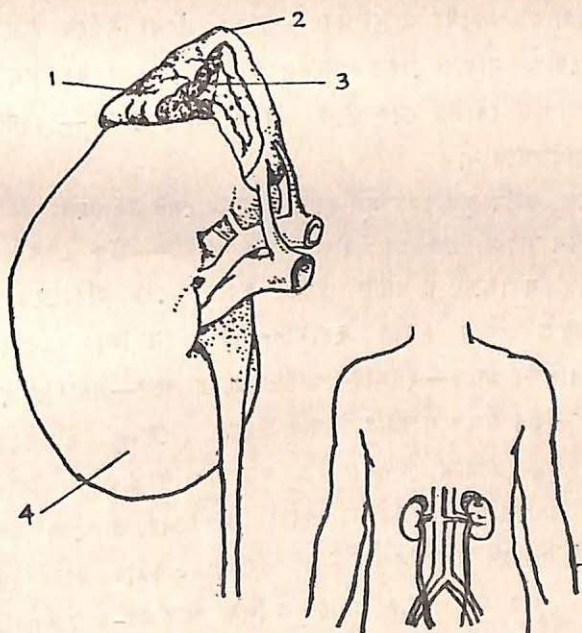
১। করটেক্স (বহিঃস্তর); ২। অ্যাড্রেন্যাল গ্ল্যাণ্ড ; ৩। মেডালা (অন্তঃস্থল); ৪। ডানদিকের কিডনি।

কেন না শুধু এইগুলো দিয়েই একশরও বেশী অসুখ সারানো যায়—বাতব্যাধি থেকে আরম্ভ করে রক্তের গোলযোগ, আলসারেটিভ কোলাইটিস থেকে আরম্ভ করে হাঁপানি—কিছুই বাদ দেয় না অদ্ভুত ক্ষমতাশালী এই কর্টিসোন সম হরমোনেরা।

আমার গঠনকৌশলও বিবেচনা করে দেখার মত। উপেনের দেহযন্ত্রে সবচেয়ে রক্তসমৃদ্ধ যে-সব রক্তবাহ জালের মত ছড়িয়ে আছে, সেই রকমই একটি রয়েছে আমার মধ্যে। আমার যা ওজন, তার ছ'গুণ ওজনের রক্ত প্রতি মিনিটে বয়ে চলেছে আমার মধ্যে দিয়ে। এছাড়াও বিরাট একটা সঞ্চয় রেখেছি ভবিষ্যতে কাজে লাগানোর জন্যে। আমার যা টিশু আছে, তার দশ শতাংশই উপেনের স্বাভাবিক চাহিদা মিটোতে আমার হরমোনদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু যদি আমি নিজেকে গুটিয়ে ঐ দশ শতাংশ পর্যায়ে নিয়ে আসি, তাহলেই হঠাৎ বাড়তি চাপ বা পীড়নের সময়ে (যেমন ধরুন কঠিন অসুখ অথবা বড় রকমের অস্ত্রোপচার) উপেন চাহিদা মিটিয়ে উঠতে পারবে না। বেঘোরে মারাও যেতে পারে। আমার যে সব হরমোন দিবারাত্র আগলে রাখছে বিভিন্ন দেহযন্ত্রকে বিপদ-আপদ থেকে—দুঃসময়ে তাদের সাহায্য আর পাবে না।

আসলে, আমি দু'ধরনের মূল দুটো হরমোন সেট উৎপাদন করি। ফলের যেমন শাঁস থাকে ভেতরে, ছাল থাকে বাইরে—ঠিক তেমনি আমারও অন্তঃস্থলে (মেডালা-য়) থাকে একটা হরমোন-সেট, বহিঃস্তরে (করটেক্স -য়ে) থাকে আর একটা হরমোন-সেট। মেডালার একটা অনন্য-সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে—হটলাইন আছে ব্রেনের সঙ্গে—সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা। প্রবল আবেগে হঠাৎ উদ্বেলিত হলে, (যেমন, ধাঁ করে রেগে যাওয়া বা রক্ত জমিয়ে দেওয়ার মত অকস্মাৎ আতংক) আমার মেডালা খবর পায় তৎক্ষণাৎ। জরুরী অবস্থাটা কি ধরনের, তা তো আমি জানি না। তাই পলায়ন অথবা লড়াই—এই দুটোর একটার জন্যে তৈরী করি উপেনকে। ওর রক্তপ্রবাহে অ্যাড্রেন্যালিন আর নর-অ্যাড্রেন্যালিন নামে দুটো হরমোন ঢালতে শুরু করি সঙ্গে সঙ্গে।

অসাধারণ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় উপেনের দেহে। লিভারে জমানো শর্করা (ইন্সট্যান্ট এনার্জি অথবা অবিলম্বিত শক্তি) তৎক্ষণাৎ ছাড়ান পেয়ে বেরিয়ে আসে ওর রক্তপ্রবাহে। চামড়ার রক্তবাহদের পথ বন্ধ

করে দেয় আমার হরমোনেরা—ফ্যাকাশে হয়ে যায় উপেন—এইভাবে পাওয়া বাড়তি রক্তকে ভেতরকার যন্ত্র আর পেশীতে পাঠাতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে। হৃৎপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হতে থাকে, ধমনীরা টাইট হয়ে গিয়ে রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। হজমক্রিয়া থেমে যায়—ওসব নিয়ে দুশ্চিন্তার এখন সময় নেই—যদি চোট লাগে, তাহলে যাতে ঝটপট উপেনের রক্ত জমে যায়, সেই হিসেবে রক্ত জমে যাওয়ার সময়-গতিও বৃদ্ধি পায় দ্রুত।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এত কাণ্ড করে বসি আমি। আচম্বিতে বাহ্যতঃ না হলেও ফলতঃ সুপারম্যানে পরিণত হয় উপেন। অকস্মাৎ সংগ্রামে এখন যদি তাকে আরো জোরে দৌড়োতে হয়, কি আরও বেশী লাফাতে হয়, অথবা অনেক বেশী ওজন তুলতে হয় বা অধিকতর শক্তি প্রয়োগ করে আঘাত হানতে হয়—অনায়াসেই এর প্রতিটিতে সক্ষম হয় উপেন। গাড়ীচাপা পড়ে মানুষ যখন মুমূর্ষু, তখন একা গাড়ী টেনে সিধে করে দিয়েছে এমন মহাবীরের গল্প উপেন নিশ্চয় শুনেছে। এহেন অতি মানুষী কাণ্ড সম্ভব হয় কেবল অ্যাড্রেন্যাল হরমোনদের দৌলতে।

বুঝতেই পারছেন, এই ধরনের প্রবল উদ্দীপনা অনিশ্চিতকালের জন্যে চলতে পারে না—উপেনের দেহ ভীমবেগে চলতে চলতে মারা পড়বে। তাই কৌশলে তাকে বাঁচানোর ব্যবস্থাও করতে হয়। যে চাপ বা পীড়ন অ্যাড্রেন্যালিন উৎপাদনকে উদ্দীপ্ত করে, সেই একই তাগিদ হাইপোথ্যালামাসকে বাধ্য করে পিটুইটারীকে সংকেত দিয়ে ACTH নামক একটা বস্তু ছাড়বার জন্যে। ACTH এসে আমার বহিঃস্তর অর্থাৎ কর্টেক্সকে ঠেলেঠুলে সেখানকার হরমোন উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। পীড়ন বা চাপের সময়ে এই হরমোনদের কাজই হল রক্তচাপ ঠিক রেখে জীবন-রক্ষক অপরিহার্য দেহযন্ত্রগুলোয় রক্ত সরবরাহ বজায় রাখা, চর্বি আর প্রোটিনকে শর্করায় পরিণত হতে সাহায্য করা—যা থেকে এনার্জি পাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে—এতটুকু দেরী হয় না। দেখতে দেখতে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসে যায় সবকিছু।

আমার করটেক্সে উৎপাদিত হরমোনদের তিনটে মোটামুটি শ্রেণীতে ফেলা যায়। একটা সেট (কর্টিসোন ফ্যামিলির) ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট আর প্রোটিন বিপাকের তদারকি করে, দ্বিতীয়টা নজর রাখে উপেনের দেহে জল আর খনিজের ভারসাম্যের ওপর। তৃতীয় দলে থাকে যৌন হরমোন—

যৌনগ্রন্থি গোনাড থেকে উৎপাদিত হরমোনদের ক্রোড়পত্র বলতে পারেন—বাড়তি সহায়ক। যেহেতু এই হরমোনদের জমিয়ে রাখা যায় না, এদের ক্রমাগতই তৈরী করে যেতে হয় আমাকে ; বাড়তিটুকু যেন নষ্ট হয়—সেটুকু দেখতেই হয় লিভারকে। এই কারণেই দুঘন্টা আগে আমার করটেক্স যে হরমোন উৎপাদন করে, উৎপাদনের দুঘন্টা পরে তার বেশীর ভাগই আর থাকে না—নতুন হরমোন এসে ঠাঁই নেয় সে জায়গায়।

সব কিছুরই একটা সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ধরুন উপেন বেচারী সাংঘাতিক জখম হল, কঠিন ব্যাধিতে পড়ল বা ঐরকম কিছু একটা হল যার ফলে ওর করটেক্সের কাজের কোষগুলোই গেল নষ্ট হয়ে। এই সেদিন পর্যন্ত গবেষকরা জানতেন না কি করে আমার প্রধান হরমোনদের বানাতে হয়। এখন জেনেছেন বলেই রক্ষে, নইলে করটেক্সের :কাজের কোষ নষ্ট হওয়া মানেই উপেনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা। বিষয়টা আর যাই হোক, খুব সুখাবহ নয়।

কেন না, সঙ্গে সঙ্গে ডজনখানেক অসুখে কাবু হত উপেন। ব্রোঞ্জ রঙীন হয়ে যেত চামড়া ; আবির্ভূত হত অ্যানিমিয়া অর্থাৎ রক্তাল্পতা ; হীনবল হত পেশী ; হ্রাস পেত রক্তচাপ আর দেহের ওজন ; অন্তর্হিত হত ক্ষিদে ; সেই সঙ্গে আসত গা-গুলোনো ভাব, বমি আর ঘন ঘন পাইখানা। একটু একটু করে কাহিল হতে হতে অশক্ত অক্ষম হয়ে গিয়ে এক সময়ে মহানিদ্রায় নিদ্রিত হত উপেন। তবে ওর কপাল ভাল। এ যুগে ওসব আশংকার কোনো কারণ নেই। আমার করটেক্সে যাই ঘটুক না কেন, কৃত্রিম হরমোন তো আছে। প্রায়-স্বাভাবিক জীবন যাপনের সুযোগ পাবে উপেন।

আমার কর্টিক্যাল হরমোনদের পরিমাণ খুব কম হলে যেমন বিপদ, খুব বেশী হলেও তেমনি বিপদ। কর্টিসোল হরমোনটা আমারই কর্টিসোন পরিবারভুক্ত। ইনি যদি একটু বেশী মাত্রায় ক্ষরিত হন, তাহলেই আমার হাত পা শুকিয়ে কুঁচকে যাবে—:কন না বাড়তি হরমোনের উৎপাতে পেশীর প্রোটিন রূপান্তরিত হবে শর্করায়। খনিজ বেরিয়ে যাওয়ার ফলে হাড়গুলো ঠুনকো হয়ে দাঁড়াবে। পিঠে আর পেটে চর্বি জমবে—লিকলিকে পাদুটোর ওপর আরো বেশী চাপ পড়বে। হু-হু করে বাড়বে রক্তচাপ : অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ দেখা দেবে মানসিক অনচ্ছতা—অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রংশ ঘটবে বেচারী উপেনের।

অ্যালডেসটেরোন হরমোনটা আমার কর্টেক্সের আর একটা অন্যতম প্রধান হরমোন। এর কাজ উপেনের দেহে জল আর খনিজের ভারসাম্য বজায় রাখা। একটা আলপিনের মাথায় যতটুকু হরমোন ধরে, ততটুকুই উপেনের শরীরের জল আর খনিজের ভারসাম্য বানচাল করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। অ্যালডেসটেরোন যদি মাত্রাতিরিক্ত হারে ক্ষরিত হতে থাকে, সিরিয়াস ঝঞ্ঝাটে পড়বে বেচারা উপেন। জীবন রক্ষক পটাসিয়াম বেরিয়ে যাবে প্রস্রাবের মধ্যে দিয়ে, বাড়তি সোডিয়াম (লবণ) থেকে যাবে দেহে। কাহিল হ'তে থাকবে উপেনের পেশী—পক্ষাঘাত-গ্রস্তও হতে পারে। হৃদযন্ত্র দৌড়োবে পাঞ্জাবমেলের মত, রক্তচাপ উঠে যাবে রকেটের মত। তীব্র যন্ত্রণায় ঝন ঝন করতে থাকবে আঙুল। প্রায়-অসহ্য মাথাব্যথা বিরামবিহীনভাবে পাগল করে তুলবে বেচারীকে। —রেহাই দেবে না কিছুক্ষণের জন্যেও। সাধারণতঃ টিউমার হলেই অ্যালডে-সটেরোনের অতি-উৎপাদন দেখা যায়। টিউমার বাদ দিলেই নিরাময় নিশ্চিত।

অবশ্য এর কোনোটাই ঘটেনি উপেনের ক্ষেত্রে। এখনো পর্যন্ত তো নয়ই। এ থেকেই কি বোঝা উচিত নয় যে গ্রীক পুরাণে বর্ণিত প্যানডোরার বাক্স বোধহয় আমিই। কাদা থেকে নির্মিত প্যানডোরাই বিশ্বের প্রথম নারী এবং তার কাছে একটা বাক্স থাকত সব সময়ে যার মধ্যে ছিল এই পৃথিবীর সব পুরুষের অসুখবিসুখ দুঃখকষ্ট (মতান্তরে যাবতীয় শুভাশীর্বাদ)। যাই হোক, উপেন যেন মনে রাখে চিন্তা ভাবনা উদ্বেগ ঘৃণা রাগ বিদ্বেষের বাড়াবাড়ি ঘটলে ক্ষতি শুধু তার নয়—আমারও বটে। কাজেই সাধু সাবধান! এখন থেকে ও যেন একটু শান্ত রাখে নিজেকে।

মনে থাকবে তো?

৫

রক্ত সংবহন তন্ত্র

হৃদযন্ত্র

আমি সুন্দর নই। আমার ওজন বারো আউন্স। রঙ, লালচে-বাদামী। আকার আহামরি কিছু নয়। আমি একজনের গোলাম। আমি উপেনের হৃদযন্ত্র।

বুকের ঠিক মাঝখানে লিগামেন্ট অর্থাৎ সন্ধিবন্ধনীর বাঁধনে ঝুলতে থাকি আমি। আমি লম্বায় ইঞ্চি ছয়েক, চওড়ায় চার, অর্থাৎ উপেনের হাতের মুঠোর সমান। কবিরা যাই বলুক, আমি মোটেই রোমান্টিক টাইপের নই। চার-কুঠরীওলা কঠোর-পরিশ্রমী পাম্প ছাড়া আমি আর কিছুই নই। পাম্প আসলে দুটো। একটা রক্ত ঠেলে দেয় ফুসফুসের দিকে, অপরটা দেহের ভেতরে।

প্রতিদিন প্রায় ষাট হাজার মাইল লম্বা রক্তবাহের মধ্যে দিয়ে রক্ত ঠেলতে হয় আমাকে। এতে যা জোর লাগে তা একটা চার হাজার গ্যালন ট্যাঙ্ক ভর্তি করার পক্ষে যথেষ্ট।

হৃদযন্ত্র
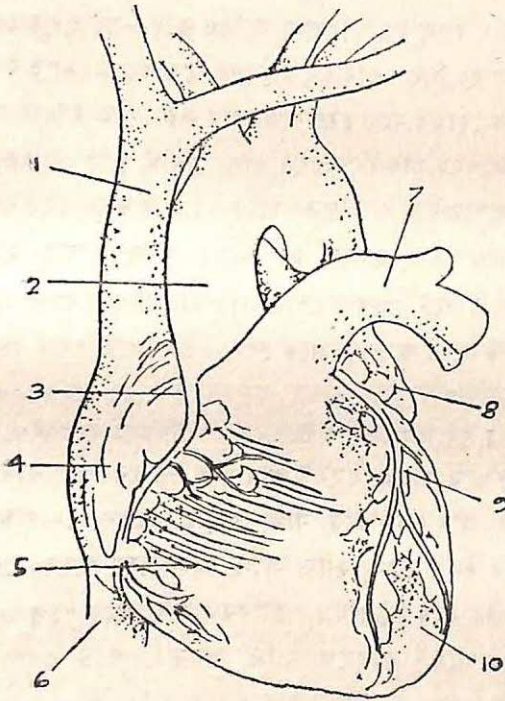
১। উত্তরা মহাশিরা (দেহ থেকে হৃদযন্ত্রে রক্ত); ২। মহাধমনী (দেহে রক্ত বহন করছে); ৩। ডানদিকের করোনারী ধমনী; ৪। ডানদিকের অলিন্দ; ৫। ডানদিকের নিলয়; ৬। অধরা মহাশিরা (দেহ থেকে রক্ত ফের ফিরিয়ে আনছে হৃদযন্ত্রে); ৭। ফুসফুসীয় ধমনী (ফুসফুসের রক্ত নিয়ে যাচ্ছে); ৮। বাঁদিকের অলিন্দ; ৯। বাঁদিকের করোনারী ধমনী; ১০। বাঁদিকের নিলয়;

আমার কথা খেয়ালই থাকে না উপেনের। খেয়াল যখন হয়, তখন ভাবে না জানি আমি কি ভঙ্গুর আর পলকা। পলকা! আজ পর্যন্ত তার তিন লক্ষ টন রক্ত পাম্প করার পরেও? দৌড়বাজের পায়ের মাংসপেশী অথবা হেভীওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়নের বাহুর মাংসপেশীর চাইতে দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে হয় আমাকে। আমার চাইতে শক্তিশালী মাংসপেশী শরীরের আর কোথাও নেই। আমার মত সত্তর বছর ধরে একনাগাড়ে দিবারাত্র শক্তিশালী থাকার ক্ষমতা শরীরের আর কোন যন্ত্রের নেই।

একটু বাড়িয়ে বললাম। বিশ্রাম আমিও করি—দুই হৃদ্‌ঘাতের মধ্যবর্তী সময়ে। আমার হৃদপিণ্ডর বাম প্রকোষ্ঠ এক সেকেণ্ডের দশভাগের তিনভাগ সময় নেয় রক্তকে দেহের মধ্যে ঠেলে দেওয়ার জন্য। তারপরেই আধ সেকেণ্ড জিরিয়ে নেওয়ার সময় পাই। উপেন যখন ঘুমোয়, তখন অধিকাংশ জালক (চুলের মত সূক্ষ্ম রক্তবাহ) নিক্রিয় থাকে। তার মানে সেই সব জালকের মধ্য দিয়ে আমাকে রক্ত ঠেলতে হয় না। ফলে আমার হৃদঘাত মানে হৃদস্পন্দন প্রতি মিনিটে ৫৫ বার শোনা যায় স্বাভাবিক অবস্থায় যা কিনা ৭২। অর্থাৎ, স্বাভাবিক অবস্থায় হৃদপিণ্ডকে বেশী রক্ত ঠেলতে হয়। ঘুমন্ত অবস্থায় জিরেন পায় হৃদপিণ্ড।

আমার কথা খুব কমই ভাবে উপেন। আমিও তাই চাই। হার্ট নিয়ে ভেবে খিটখিটে হয়ে যাওয়া মানেই আমার ও উপেনের দুজনেরই মহাবিপদ। নেহাতই যখন আমাকে নিয়ে মাথা ঘামায় উপেন, দেখেছি তা সম্পূর্ণ অমূলক। একদিন রাত্রে ঘুমোতে যাচ্ছে, এমন সময় আচমকা ওর মনে হল, আমি যেন ধড়ফড় করে উঠলাম। রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল ও। না জানি তাকে কি ফ্যাসাদেই ফেলতে যাচ্ছি আমি। অথচ ব্যাপারটা মোটেই উদ্বেগের নয়।

আমার বিদ্যুৎশক্তি আমি নিজেই উৎপাদন করি এবং সঙ্কোচনের হুকুম পাঠাই। মাঝে মাঝে একটু এদিক-ওদিক হয়ে যায়—ফলে পিঠোপিঠি দুটো হৃদঘাত শোনো যায়। তাইতেই মনে হয় যেন ধড়ফড় করছি আমি। কিন্তু তাতো নয়। ওর অজান্তেই যে এরকম ধড়ফড়ানি যে কতবার ঘটে, তা জানলে উপেন অবাক হয়ে যাবে।

মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায় উপেনের। বুঝতে পারে আমার ধুকপুকুনি বেড়ে গেছে। ফলে বেচারী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে

উপেন যদি দৌড়োয়, আমিও দৌড়োই। তাইতো হৃদ্‌ঘাত বেড়ে যায়। উপেনের উদ্বেগ আমার ধুকপুকুনি আরও বাড়িয়ে দেয়। ও যদি শান্ত হয়, আমিও হই। উপেন যদি নিজে থেকে না পারে, তাহলেও আমাকে মন্থরগতি করার একটা উপায় আছে। ভেগাস (Vagus) স্নায়ু ব্রেকের কাজ করে। কানের পেছনে ঘাড়ের ওপর দিয়ে গেছে এই স্নায়ু। চোয়ালের খাঁজে আস্তে আস্তে মালিশ করলেই আমি শান্ত হই।

সবকিছুর জন্যেই উপেন আমাকে দোষারোপ করে। কিন্তু তার ক্লান্তির জন্যে আমি দায়ী নই। কখনো কখনো ও টেবিলে বসে একনাগাড়ে কাজ করে। তখন বুকে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে। উপেন ভাবে, এই বুঝি 'হার্ট অ্যাটাক' আরম্ভ হল। কিন্তু উপেন যেন নিশ্চিন্ত থাকে। ঘণ্টাদুয়েক আগে পেট ঠেসে খাওয়ার ফলেই হজমের গোলমাল হেতু এই বিপত্তি দেখা যায়। আমি বিপদে পড়লে, অংথা আবেগ আর পরিশ্রমের পরেই যন্ত্রণার সংকেত পাঠাই। বলি, আমি আর পারছি না। যে বাড়তি কাজের ভার আমার ওপর চাপাচ্ছে উপেন, তা বইবার মত পুষ্টির অভাব ঘটছে।

আমার পুষ্টি আসে কোত্থেকে? রক্ত থেকে তো বটেই। যদিও ওজনে আমি দেহের ওজনের দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। আমার রক্তের চাহিদা মোট রক্ত সরবরাহের বিশ ভাগের এক ভাগ। সোজা কথায়, দেহের অন্যান্য যন্ত্র আর টিশুকে চালু রাখতে গেলে যে পরিমাণ রক্ত সরবরাহের দরকার, তার দশ গুণ বেশি দরকার কেবল আমারই।

কিন্তু এই পুষ্টি আমার চার কুঠরীর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত রক্তস্রোত থেকে সংগ্রহ করি না। আমার নিজস্ব একজোড়া ধমনী আছে। গাছের মত ডালপালা মেলে দেওয়া ধমনী। যার গুঁড়ি খড়ের আঁটির চাইতে মোটা নয়। এইটাই হল আমার দুর্ব্বল জায়গা। এখানে গোলমাল মানেই আমার মৃত্যু অবধারিত।

অমুক চাই তমুক চাই বলাটা আমার স্বভাব নয়, সব রকম পরিস্থিতিতে উপেনের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করি আমি। তাই চাই, উপেনও যেন সেই ভাবে আমার জন্যে একটু ভাবে। মানে একটু রোগা হয়, একটু ব্যায়াম করে, একটু এলিয়ে দেয় নিজেকে, ধূমপান আর চর্বি খাওয়া বেশ কমিয়ে দেয়। কারণ এগুলো না করলেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব আর দীর্ঘ দিন উপেনের সেবা করতে পারব না।

ফুসফুস

আমি উপেনের ডানদিকে ফুসফুস। আকারে আমি আবার বাঁদিকের পার্টনারের চেয়ে বড়। আমার তিনটে ভাগ—পার্টনারের অংশ মোটে দুটো। কাজেই বড় হিসেবে কথা বলার অধিকার আমার।

আমাকে দেখলে চোখ কপালে উঠে যেত উপেন বেচারার। ওর ধারণা আমি গোলাপী রঙের ফোঁপরা একটি থলি ছাড়া আর কিছুই নয়—ঝুলছি বুকের খাঁচার ঠিক মাঝখানে। আসলে কি তাই? মোটেই নয়। পয়লা নম্বর হল, আমি ফোঁপরা নই! কাটুন না, কেটে ফেলুন আমাকে, দেখবেন ঠিক যেন রবারের একটা স্পঞ্জ। অনেক চানের ঘরে যেরকম স্পঞ্জ দেখা যায়—সারা গায়ে অজস্র ছেঁদা—ঠিক তেমনি। দোসরা ভুল হল—আমি নাকি গোলাপী। আরে মশাই গোলাপী ছিলাম এককালে—উপেন যখন কচি খোকা ছিল—তখন। এখন নই। শ্লেটের রঙ দেখেছেন? আমার রঙ এখন ঠিক সেইরকম ধূসর, ফুটকি-ফুটকি দাগানো কালচে। কেন এমন হল জানেন? শুনবেন? সিগারেট···সিগারেট···আর শহরের নোংরা ধুলোভরা বাতাস—এরাই বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে আমার অমন চমৎকার গোলাপী রঙটার। প্রায় আড়াই লাখ সিগারেট আর কোটি কোটি বার ধুলোভরা নিঃশ্বেস নিলে গোলাপী রঙ কখনো গোলাপী থাকে?

উপেনের বুকের খাঁচায় সীল করা তিনটে কুঠরি আছে: একটা আমার জন্যে, একটা বাঁদিকের ফুসফুসের জন্যে, আর একটা ওর হৃদযন্ত্রের জন্যে। আমি আমার কুঠরিতে শিথিল ভাবে ঝুলছি, কুঠরির প্রায় সবটুকুই জুড়ে রয়েছি, আমার ওজন একপাউণ্ডের একটু বেশী। আমার কোনো পেশী নেই, তাই নিঃশ্বেস প্রশ্বাসের ব্যাপারে আমার ভূমিকা নিষ্ক্রিয়। আমার কুঠরিতে সামান্য একটু ভ্যাকুম অর্থাৎ বায়ুশূন্যতা আছে, তাই উপেনের বুকের খাঁচা যখন ফুলে ওঠে, আমিও ফুলে উঠি। উপেন যখন নিঃশ্বেস ছেড়ে দেয়, আমি নেতিয়ে পড়ি। ব্যাপারটাকে রিকয়েল মেক্যানিজ্‌ম্ বলা যেতে পারে। চমকে উঠে যেন গুটিয়ে এতটুকু হয়ে যাই। অ্যাকসিডেন্টের ফলে উপেনের বুকের খাঁচার দেওয়ালে যদি ফুটো হয়ে যায় তাহলে আমার

ভ্যাকুম নষ্ট হয়ে যায়, আমি শিথিল ভাবে ঝুলতেই থাকি, মেরামত করে ভ্যাকুম ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত কোনো কাজ করি না।

আমার গড়নটা দেখুন। উপেনের শ্বাসনালী নিচের দিকে দুভাগ হয়ে দুটো ব্রনকাইয়াল টিউব হয়ে গেছে—একটা আমার জন্যে, একটা আমার পার্টনারের জন্যে। ব্রনকাইয়াল টিউব আমার মধ্যে এসেই ছড়িয়েছে শাখা

ফুসফুস
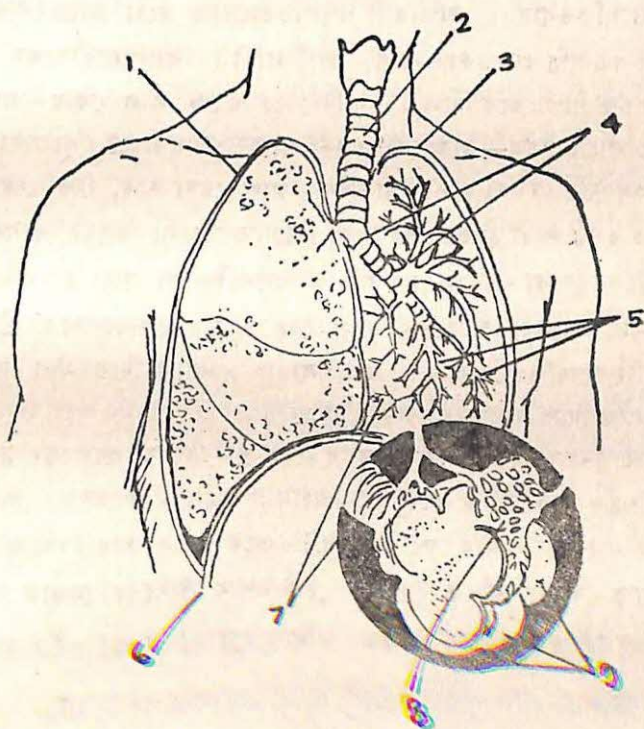
১। ডানদিকের ফুসফুস (তিনটে অংশ) ; ২। শ্বাসনালী ; ৩। বাঁ-দিকের ফুসফুস (দুটো অংশ) ৪। ব্রনকাইয়াল টিউবস্ (ক্লোমনালী সমূহ) ; ৫। ব্রনকাই ; ৬। ডায়াফ্রাম (মধ্যচ্ছদা) ; ৭। ব্রনকাইওল্স্ ; ৮। ক্যাপিলারী সমূহ (সূক্ষ্ম রক্তবওয়া নালী) ; ৯। অ্যালভিওলি (ক্ষুদে ক্ষুদে বাতাসের থলি) ;

প্রশাখা—উলটোনো গাছের মত। প্রথমে বড় সাইজের ব্রনকাই, তা থেকে ব্রনকাইওল্‌স্‌, যাদের ব্যাস এক ইঞ্চির একশ ভাগের এক ভাগ। এগুলো বাতাস যাতায়াতের অলিন্দ ছাড়া কিছুই নয়। আসল কাজ হয় আমার অ্যালভিওলির মধ্যে—যাদের দেখতে আঙুরের থোকার মত—ক্ষুদে ক্ষুদে বাতাসের থলি। প্রায় আড়াইকোটি অ্যালাভিওলি আছে আমার। চ্যাপ্টা করে পাশাপাশি ছড়িয়ে দিলে আধখানা টেনিশকোর্ট জুড়ে থাকতে পারে।

অনেকগুলো আছে বলে যাদের অ্যালভিওলি বলা হচ্ছে তাদের একটার নাম অ্যালভিওলাস। প্রত্যেকটা অ্যালভিওলাসের মধ্যে আছে মাকড়শার জালের মত সূক্ষ্ম রক্ত বওয়া নালি—ক্যাপিলারী। ক্যাপিলারীর এক প্রান্তে হৃদযন্ত্র রক্ত পাম্প করে দিচ্ছে। সারি বেঁধে যাচ্ছে লাল কোষ—প্রায় এক সেকেণ্ড লাগে যেতে—তারপরেই একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে। শূন্যে বা ঝোপে যে রকম মিহি পাতলা হালকা মাকডশার জাল দেখা যায়, ঠিক সেই রকম দেখতে ক্যাপিলারী দেওয়ালের ঝিল্লী দিয়ে কোষগুলো তাদের কার্বন ডায় অক্সাইডের বোঝা নামিয়ে দেয় আমার অ্যালভিওলির মধ্যে। একই সঙ্গে উল্টোদিকে যাওয়া অক্সিজেন তুলে নেয় আমার কোষগুলো। ঠিক যেন গ্যাস বদলাবদলির দোকান। ক্যাপিলারীর একপ্রান্ত দিয়ে নীল রক্ত নেমে অন্য প্রান্ত দিয়ে লাল হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

উপেনের অন্যান্য আরও গুরুত্বপূর্ণ দেহযন্ত্র—বিশেষ করে হৃদযন্ত্র—কিন্তু স্বয়ংক্রিয়—অটোমেটিক কন্ট্রোলের অধীন। চলে নিজে থেকে। অধিকাংশ সময়ে এ ব্যবস্থা আমার ক্ষেত্রেও খাটে—তবে আমি আবার ইচ্ছে করলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। ছোটবেলায় উপেনের মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে গেলেই দম আটকে থাকত, নীলচে হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অকারণে উদ্বেগে পড়ত ওর মা। সত্যিকারের কোনো ঝামেলায় পড়ার আগেই কিন্তু চালু হয়ে যেত স্বয়ংচালিত নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস—নিজের ইচ্ছের শেষ ঐ খানেই।

আমার স্বয়ংচালিত নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (অটোমেটিক ব্রিদিং কন্ট্রোল) রয়েছে মেডুলা অবলংগেটা-তে—মেরুদণ্ড যেখানে ফুলে উঠে মিলিত হয়েছে মস্তিষ্কের সঙ্গে—সেই ছোট্ট ঢিপিটাই মেডুলা অবলং-গেটা অর্থাৎ সেরিবেলাম (লঘুমস্তিষ্ক)। আশ্চর্য রকমের অনুভূতিসচেতন কেমিক্যাল ডিটেক্টর বলা যায় একে—রাসায়নিক পদ্ধতিতে ঠিক ধরে নেয়

কি করতে হবে। মেহনতী পেশীগুলো ঝটপট অক্সিজেন পুড়িয়ে বাইরে বার করে দেয় জঞ্জাল কার্বন ডায়অক্সাইডকে। কার্বন ডায়অক্সাইড জমা হতে থাকলই রক্তে অ্যাসিড বাড়তে থাকে। লঘুমস্তিষ্কের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে ব্যাপারটা ধরা পড়ে তৎক্ষণাৎ—হুকুম আসে আমার ওপর আরও তাড়াতাড়ি কাজ চালিয়ে যাওয়ার। রক্তে অ্যাসিড বাড়তে থাকে—যখন উপেন দারুণ ব্যায়াম করে তখন—ততই হুকুম আসতে থাকে আরও গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসের—এই ভাবেই মানুষ অতিরিক্ত বায়ু টেনে নেয় নিজের ফুসফুসে।

বসে থাকলে মিনিটে ১৬ পাঁইট বোতল বাতাসের দরকার হয় উপেনের ; হাঁটলে, ২৪ ; দৌড়োলে, ৫০ ; শুয়ে থাকলে, ৮। মিনিটে নিঃশ্বাস নেয় প্রায় ১৬ বার—প্রতিবারে এক পাঁইট বোতল বাতাস নেয় নিশ্বেসের সঙ্গে। (এতে আমি আংশিক প্রসারিত হই। এর আটগুণ বাতাস ধরে রাখার ক্ষমতা আমার আছে)। এক-একবারে এক পাঁইট বোতল নিঃশ্বেসের সবটা কিন্তু পৌঁছোয় না আমার কাছে ; তিনভাগের একভাগ উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হোঁচট খায় শ্বাসনালী আর অন্যান্য বায়ুপথের মধ্যে দিয়ে নানা দিকে।

গরম অঞ্চলের জলাভূমির বাতাস যেমন ভিজে ভিজে আর উষ্ণ হয়, আমি চাই আমার বাতাসও ঠিক সেইরকম হোক। মাত্র কয়েক ইঞ্চি পরিধির মধ্যে বিশেষ ধরনের এই বাতাস বানিয়ে নেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। উপেনের চোখ ধুইয়ে দেয় যে অশ্রুগ্রন্থি, সে এবং তার সাথে নাক আর গলার যে-সব গ্রন্থী থেকে আর্দ্রতা বেরোয়—তারা সবাই মিলে প্রায় এক পাঁইট বোতল তরল পদার্থের যোগান দেয় আমার বাতাসকে ভিজেভিজে রাখার জন্যে। এই পথ বরাবর যে-সব রক্তনালী একেবারে বাইরের দিকে রয়েছে, তারাও বাতাসকে উষ্ণ রাখে ঠাণ্ডার দিনে নিজেদের হাট করে খুলে রেখে, আবার গরমের দিনে বন্ধ হয়ে গিয়ে।

যাদের জন্যে আমি ঝামেলায় পড়তে পারি, তাদের নামের ফর্দ কিন্তু সীমাহীন বললেই চলে। রোজই বহু-রকমের ব্যাকটিরিয়া আর ভাইরাস নিঃশ্বেসের সঙ্গে গ্রহণ করছে উপেন। এদের বেশীর ভাগকেই ধ্বংস করে লাইসোজাইম—নাক আর গলার অত্যন্ত শক্তিশালী জীবাণু জল্লাদ। আমার অন্ধকার, উষ্ণ, ভিজে ভিজে নালীপথে যারা ঢুকে পড়ে, তাদের শিকার করতে আমার মোটেই অসুবিধে হয় না। ফ্যাগোসাইটরা আমার নালীপথ

পাহারা দেয়—হানাদার ঢুকলেই বধ করে। ফ্যাগোসাইট হল রক্তের সংগঠক সেই সব কোষ যারা বহিরাগত জীবাণুদের ধ্বংস করে ; রক্তের শ্বেত-কণিকা কোষ। 'ফ্যাগো' মানে ভক্ষণ বা ধ্বংসকারী।

আমার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল নোংরা বাতাস। অন্যান্য দেহযন্ত্র-গুলো থাকে নিরাপদ আশ্রয়ে। সুরক্ষিত অবস্থায় ; কিন্তু কার্যতঃ আমি যেন উপেনের শরীরের বাইরের যন্ত্র—যত ঝুটঝামেলা যায় আমার ওপর দিয়ে--পারিপার্শ্বিক উপদ্রব আর কলুষিতকরণের মোকাবিলা করতে হয় আমা-কেই—শরীরের ভেতরে থেকেই। সত্যিই আমি সূক্ষ্ম, অত্যন্ত সূক্ষ্ম আমার গড়নপেটন, তা সত্ত্বেও সালফার ডায়অক্সাইড, বেন্জোপাইরিন আর নাইট্রো-জেন ডায়অক্সাইডের মত সাংঘাতিক গ্যাসেদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে কিভাবে যে টিঁকে থাকতে হয় আমাকে তা একটা পরমাশ্চর্য ব্যাপার। যাদের নাম করলাম, এদের কয়েকটার পাল্লায় পড়লে নাইলন মোজাও গলে যায়, বুঝে দেখুন তাহলে কি ক্ষতি করতে চায় ওরা আমার।

আমার বাতাস পরিষ্কারের কাজকর্ম শুরু হচ্ছে নাকের চুল থেকেই—ধুলোর বড় কণাগুলো আটকে থাকে সেখানে। নাক, গলা আর ব্রন-কাইয়াল গলিপথের চটচটে মিউকাস (শ্লেষ্মা) আটকে রাখে মিহি ধুলোকে—আঠা-কাগজে যে-ভাবে মাছি আটকে যায়, সেইভাবে। কিন্তু পরিষ্কার করার আসল কাজটা করতে হয় সিলিয়কে। অণুবীক্ষণে দেখতে হয়, এত ছোট চুল এরা—সংখ্যায় কোটি কোটি—বাতাস যাতা-য়াতের পথ বরাবর রয়েছে। বাতাসে ধানের ক্ষেতে ধানের শিষ যেমন দোলে সামনে পেছনে, এরাও দোলে সেইভাবে—সেকেণ্ডে প্রায় বারোবার। ওপরের দিকে ধাক্কা মেরে মিউকাস অর্থাৎ শ্লেষ্মাকে ঠেলে দেয় গলার কাছে—সেখানে এলেই উপেন গিলে নিতে পারে তাকে।

মাইক্রোসকোপের তলায় সিলিয়ার কাজ যদি দেখত উপেন, তাহলে দেখতে পেত সিগারেটের ধোঁয়া বা অত্যন্ত দূষিত বাতাস এদের ওপর এসে পড়লেই, ধানের-ক্ষেতে-বাতাস-লেগে দুলুনি বন্ধ হয়ে যায়। সাময়িক পক্ষাঘাত ঘটে। এই উৎপাত বেশ কিছুক্ষণ চালানোর পর সিলিয়ারা শুকিয়ে মরে যায়—নতুন সিলিয়া সে জায়গায় জন্মায় না।

তিরিশ বছর ধূমপান করে উপেন তার বেশীর ভাগ সিলিয়াকেই হারিয়েছে, বাতাস যাতায়াতের পথে শ্লেষ্মা নিঃসরণকারী পাতলা পর্দাও (মিউকাস-

মেমৃব্রেন) স্বাভাবিকের চাইতে তিনগুণ পুরু হয়ে গেছে। উপেন কিন্তু এখন ডুবে মরার পর্যায় পৌঁছেছে। এখন আমার বাতাসের থলিতে বেশ কিছু শ্লেষ্মা ঝুপ করে খসে পড়লেই বন্ধ হয়ে যাবে শ্বাসপ্রশ্বাস—জলভর্তি ফুসফুস যেভাবে বিকল হয়—ঠিক সেইভাবে। এ অবস্থা থেকে উপেন পরিত্রাণ পায় শুধু একটি ব্যাপারে—কাশির ফলে। যাকে বলে ধূমপায়ীদের কাশি—স্মোকার্স কাফ—তার ধাক্কায় দমটা কেবল বন্ধ হয় না—কিন্তু যত শব্দ করেই কাশুক না কেন, সিলিয়াদের কর্মক্ষমতা বা দক্ষতার বদলি কখনো হয় না। উপেনের মনে রাখা দরকার, বাতাস যাতায়াতের পথ পরিষ্কারের এই একটি মাত্র ব্যবস্থাই এখন হাতে আছে আমার—কাশি চাপা দেওয়ার ওষুধ যেন না খায়।

বেশীর ভাগ সময়েই উপেন আমাকে সত্যিকারের জঞ্জাল সাফ করতে বলে। বাতাস যাতায়াতের সরু সরু পথে মাঝে মাঝে অনেক কণিকা আটকে যায়, আমার টিশু পর্যন্ত ছিঁড়ে দেয় কখনো সখনো। স্থিতিস্থাপকতা অর্থাৎ রবারের মত ইলাসটিসিটি হারিয়ে ফেলে আমার অ্যালভিওলির পলকা দেওয়াল। নিঃশ্বেস ছেড়ে দিলে যে ভাবে নেতিয়ে পড়ে, সেভাবে আর পড়ে না এই সব উৎপাতের জন্যে। তখন নিঃশ্বেস নেওয়া যায়, কিন্তু ছাড়া যায় না।) কার্বন ডায়অক্সাইড আটকে যায় অ্যালভিওলির মধ্যে, রক্তে অক্সিজেনের যোগান দিতে পারে না, জঞ্জাল কার্বন ডায়অক্সাইডকে বার করেও দিতে পারে না। ফলটা হল এমফাইসিমা—এমন একটা ভয়ংকর অবস্থা যখন প্রত্যেকবার নিঃশ্বেস নেওয়া মানেই বেঁচে থাকার জন্যে লড়াই করা।

উপেন যদিও জানে না, কিন্তু ঠিক এই অবস্থাই হয়েছে আমার কয়েক লক্ষ অ্যালভিওলির। টেবিলে বসে কাজ করতে গেলে ফুসফুসের যতটা ক্ষমতা দরকার, তার আটগুণ ক্ষমতা উপেনের ফুসফুসের আছে বলেই উপেন এখনো চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ইদানীং একটা জিনিস টের পাচ্ছে উপেন। একটু পরিশ্রম করলেই দম বন্ধ হয়ে আসে যেন। উপেন, তুমি হুঁশিয়ার।

উপেন যেন এই আপ্তবাক্যটা মেনে চলে, 'তোমার ফুসফুস আছে যখনি তা টের পাবে, তখনি বুঝবে গণ্ডগোল আরম্ভ হয়ে গেছে,' —বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আমার ভালো থাকার দিকে একটু নজর দেয়। তার মানেই আমাকে যেন নিঃশ্বেস নেওয়ার জন্যে ভালো বাতাস এনে দেয়। সব-

চেয়ে বড় কাজ হবে যদি ধূমপান করা ছেড়ে দিতে পারে, একটু ব্যায়াম আর হিসেব করে খাওয়া দাওয়া করলেই আমি বর্তে যাব। যে কোনো সাধারণ ব্যায়াম—সিঁড়ি বেয়ে ওঠা, হাঁটা, জোরে হাঁটা, খেলাধূলা আমাকে খাটায়, বেশী করে নিঃশ্বেস নিতে বাধ্য করে—আমার ভালর জন্যে যা একান্ত দরকার। এ ছাড়াও শুধু আমার নিজের ব্যায়ামও আছে। সাধারণতঃ, সবচেয়ে ভাল ভাবে নিঃশ্বেস নেওয়া হল গভীরভাবে নিঃশ্বেস নেওয়া—ঢিমেতালে বেশী বাতাস আমার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া। এছাড়াও শিশু আর যাত্রাথিয়েটারের গাইয়েদের মত ঔদরিক শ্বাসপ্রশ্বাস রপ্ত করতে পারে উপেন। পুরুষ মানুষের মত বুক ফুলিয়ে নিঃশ্বেস না নিয়ে মধ্যচ্ছদা (ডায়াফ্রাম) টা নিচের দিকে ঝুলিয়ে নিঃশ্বেস নিলেই তো হয়—বাংলা কথায় বলা যেতে পারে বুক ভরে নয়, পেট ভরে নিঃশ্বেস দেওয়া। এতে আমার গভীরতম অ্যালভিওলির মধ্যেও বাতাস প্রবেশ করে।

উপেনের শ্বাসপ্রশ্বাসের আরও সুবিধে হবে যদি দরজা খুলে ঘরের মধ্যে বাতাস ঢুকিয়ে উষ্ণ শোবার ঘরে ঘুমোয়। খোলা জানলার ঠাণ্ডা বাতাসে কাশি আসতে পারে। দিনে কয়েকবার উপেন যেন আমাকে ঝেড়ে মুছে সাফ সুতরো করে নেয়। ওর ধারণা স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বেস ছেড়ে দিলেই বুঝি আমি খালি হয়ে গেলাম। মোটেই না। মুখ দিকে যতটা পারে বাতাস বার করে দিক তারপর ঠোঁট সরু করে আরও কিছুক্ষণ ফুঁ দিতে পারবে। ধূমপান করার সময়ে যদি এই কাজটি করে তাহলে এমন একটা ব্যাপার নজরে আসবে যাতে টনক নড়ে যাবে; ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে সঙ্কুচিত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে—যে ধোঁয়া বদ্ধ অবস্থায় পড়ে থেকে আমার দমবন্ধ করে ছাড়তো।

ফল কথা এই : আমার প্রতিবেশী বেশীর ভাগ দেহযন্ত্রই প্রচুর উপদ্রব মুখ বুঁজে সয়ে যেতে পারে। আমি পারি না। আজকের দুনিয়ায় যে-সব প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা থাকা দরকার প্রকৃতি আমাকে তা দেয়নি। সেই কারণে মহামারীর মত দেখা দিয়েছে এত রকমের ফুসফুসের রোগ।

উপেন, তুমি সাবধান!

রক্তপ্রবাহ

আমার কথা ভাবলে বুক ফুলে উঠবে আপনার। ঠিক যেন একটা ট্রান্সপোর্ট সিসটেম আমি—পরিবহন ব্যবস্থা। আমার যাত্রাপথ কত লম্বা জানেন? ৭৫,০০০ মাইল। সারা পৃথিবীর জুড়ে বিমান পথের চাইতেও বেশী। আরও কাজ আছে আমার। আমি হলাম গিয়ে ৬০ মহাপদ্ম (১ মহা-পদ্ম=১,০০০,০০০,০০০,০০০) খদ্দেরের ঝাড়ুদার আর তাদের চাহিদার যোগানদার! পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, তাকে ১৭ দিয়ে গুণ করলে যা হয়—আমার খদ্দেরের সংখ্যা তাহলে তাই। এখন বুঝেছেন? ও হরি! খদ্দের কারা জানতে চাইছেন! উপেনের শরীরে যত কোষ আছে, ওরাই আমার খদ্দের। ৬০ মহাপদ্ম (ইংরেজীতে যাকে বলা হয় বীলিয়ন) কোষের ভেতর থেকে হরবখৎ জমানো জঞ্জাল বার করে আনছি আমি, যোগান দিচ্ছি জীবনকে টি ঁকিয়ে রাখার জন্যে একান্ত দরকারী উপাদান। আমি কে, এখন বুঝতেই পারছেন? হ্যাঁ— আমিই উপেনের রক্তপ্রবাহ।

উপেনের ধারণা আমি একটা মন্থর গতি নদী। ওর মধ্যে থেকে আমি যে পাগলের মত কি খাটুনিই খেটে চলেছি, তার কোনো খবরই রাখে না। চোখের পলক ফেলতে ওর যেটুকু সময় যায় তার মধ্যেই আমার ১২ লক্ষ লাল কোষ তাদের ১২০ দিনের আয়ুষ্কাল শেষ করে খতম হয়ে যায়—এবং ঐ এক সেকেণ্ডের মধ্যেই উপেনের মজ্জা থেকে তৈরী হয় ঠিক ততগুলোই নতুন লাল কোষ। পাঁজরা, খুলি আর মেরুদণ্ডের মজ্জা থেকেই এরা তৈরী হয় বেশীর ভাগ। উপেনের সারা জীবনে এই সব অস্থিমজ্জা থেকে মোট কত লাল কোষ তৈরী হবে কল্পনা করতে পারেন?—প্রায় আধটন! আয়ুষ্কাল এদের বড়ই ছোট সন্দেহ নেই, মাত্র ১২০ দিন—এই ১২০ দিনের মধ্যেই এদের প্রত্যেকে উপেনের হৃদযন্ত্র থেকে বেরিয়ে শরীরের অন্যান্য অংশে টহল দিয়ে আসে প্রায় ৭৫,০০০ বার!

উপেনের শরীরময় চক্কর দিই কি করে জানতে চাইছেন? ওর হৃদযন্ত্র পাঠায়। পাম্পের মত ঠেলে দেয়। প্রধান পাম্প হৃদযন্ত্র যদিও—তবুও বলব আমার কাজের পক্ষে খুব একটা চোকস নয়। পাম্প করে দমকে

দমকে, ফলে হ্যাপা পোহাতে হয় আমার বড় বড় ধমনীগুলোকে। দমকে দমকে আমি যেই ধমনীর মধ্যে গিয়ে পড়ি, এলোমেলো স্রোতকে সমান করে আনার জন্যে ফুলে উঠতে হয় ধমনীকে। যতবার পাম্পের চোট পড়ে, তত-বার প্রসারিত হয় ধমনী—আবার সংকুচিত হয় দুটো হৃদ্‌ঘাতের মধ্যেকার সময়টুকুর মধ্যে। সেই কারণেই রক্ত সংবহন তন্ত্রের দূরতম প্রান্তেও রক্ত পৌঁছোয় অবিরল ধারায়—দমকে দমকে নয়। শিরার মধ্যে দিয়ে এই রক্তের হৃদযন্ত্রে ফিরে যাওয়ার সময় যখন আসে, চাপ কমে গিয়ে দাঁড়ায় শূন্যাংকে। বুঝতেই পারছেন, রক্তের নিজের তখন ক্ষমতা থাকে না হৃদযন্ত্রে ফিরে যাওয়ার।

কে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় হৃদযন্ত্রে? আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই সেই অধম। আমার রক্ত সংবহন তন্ত্রের বাইরের দিকে যত পেশী আছে, এরাই সাহায্য করে। এদের সাহায্য নিয়েই এই অধম পায়ের সেই বুড়ো আঙুল থেকে রক্তকে ঠেলে ফের পাঠিয়ে দিই বুকের হৃদযন্ত্রে। ভাবতে পারেন কি ধকলটা যায় সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে আমার ওপর দিয়ে? উপেনের পায়ের মাসল্ সংকুচিত হলেই চাপ পড়ে শিরার ওপর—রক্তকে ঠেলে তুলে দেয় ওপরের দিকে (কিছু তফাতে ভাল্‌ভ্ বসানো আছে—একমুখো দরজা বলা যেতে পারে। যে-রক্ত ওপরে ওঠে দরজা দিয়ে—তাকে নামতে দেয় না নিচে—ফেরার পথে দেয় বন্ধ করে।) এই কারণেই বলি মশাই, হাঁটার মত উৎকৃষ্ট ব্যায়াম আর নেই। রক্তসঞ্চালনকে উদ্দীপিত করে অতি চমৎকার। (ভাল্‌ভ্ যদি লীক করে, মানে ঠিকমত পেছন-দিকে-রক্ত নেমে-যাওয়া বন্ধ না করতে পারে, তাহলেই শিরার টান পড়ে, জমাট রক্তে শিরাপথ বন্ধ হয় যায়। এরই নাম ভ্যারিকোজ ভেইন—প্রায়শঃই যন্ত্রণাদায়ক, ঝামেলার চূড়ান্ত করে ছাড়ে সব সময়েই।)

অনেক জটিল এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নল নিয়ে তৈরী আমার এই রক্তসংবহন তন্ত্রের মধ্যে দিয়ে যে জলীয় বস্তুটি অহরহ প্রবাহিত হচ্ছে, তার মধ্যে মূলতঃ আছে লাল কোষ, মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মত হরেকরকমের লিউকোসাইটের পল্টন বাহিনী—যাদের বলা যায় রক্তের সাদা কোষ—যেমন, গ্র্যানিউলো-সাইট, লিমফোসাইট, মনোসাইট—এ ছাড়াও আছে প্লাটেলেট এবং আরও অনেক রকমের গুলে মিশে-থাকা (দ্রবীভূত) উপাদান যেমন, কোলেস্টেরল, চিনি, লবণ, এনজাইম, ফ্যাট আর তরল প্লাজমা। তরল প্লাজমা অর্থাৎ

রক্তরসের মধ্যেই ভাসছে এরা সবাই।

রক্তের ভল্যুম (ঘনফল) অর্থাৎ রক্ত যে জায়গা জুড়ে রয়েছে এবং রক্ত যে চাপ সৃষ্টি করে রয়েছে, এই দুটোকে একটা নিরাপদ অবস্থায় রাখার জন্যে আমার তরলাবস্থাকেও সবসময়ে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় বেঁধে রাখতে হয়। পাছে ঝামেলায় পড়ি, এই ভয়ে উপেন যা কিছু তরল খায় তার থেকে প্রায় সব জলই আমি শুষে নিই এবং বার করে দিই মূত্র, ঘাম আর প্রশ্বাসিত বায়ুর সঙ্গে। জলের যোগান কমে এলেই আমি কিপ্‌টে হয়ে যাই জল খরচ করার ব্যাপারে—যা পাই, তাই জমিয়ে রাখি এবং জল-চাই জল-চাই করে চেঁচাতে থাকি। খুব জখম হলে মানুষ এই কারণেই জলের জন্যে অনুনয় বিনয় করতে থাকে।

ব্লাডগ্রুপের খবর সবাই রাখেন—বিশেষ করে আমার মূল চারটে গ্রুপের—O, A, B আর AB। কিন্তু এ ছাড়াও আমার রক্তে আরও অনেক ফ্যাক্টর আছে (M, N, P, Rh, ইত্যাদি), এবং নতুন নতুন ফ্যাক্টর সনাক্ত হয়ে চলেছে হরবখৎ। এমন সম্ভাবনাও আছে যে শেষকালে দেখা যাবে উপেনের রক্ত উপেনের ফিংগারপ্রিন্টের মতই একেবারে একক, বৈশিষ্ট্যময়। অর্থাৎ এ পৃথিবীতে যত মানুষই থাকুক না কেন, তারা প্রত্যেকেই যেমন আলাদা আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে জন্মায়—একজনের আঙুলের ছাপের সঙ্গে আরেক জনের আঙ্গুলের ছাপের কোথাও না কোথাও একটা অমিল থেকেই যায়—ঠিক তেমনি সেইভাবে পরীক্ষা করতে পারলে দেখা যাবে প্রত্যেক মানুষেরই রক্তও আলাদা—একান্ত বৈশিষ্টাময়—এক-জনের রক্ত হুবহু আরেকজনের রক্তের মত নয় মোটেই। এই কাণ্ড যখন সম্ভব হবে, তখন ফুটবল খেলার স্টেডিয়ামে একবছর যে মানুষটা যে আসনে বসে রক্তের নমুনা দিয়ে যাবে কর্তৃপক্ষের কাছে, পরের বছর এলে তাকে ঠিক সেই আসনেই বসানো যাবে শুধু রক্তের নমুনা মিলিয়ে। এতই স্বতন্ত্র এই রক্ত।

শহর-টহরে বাড়ি-বাড়ি যেমনভাবে জলের যোগান যায়, ঠিক সেই-ভাবে নরদেহের কোষে কোষে আমাকে অক্সিজেনের যোগান দিতে হয়। হার্ট তো পাম্প করেই খালাস, রক্তস্রোত হু-হু করে ধেয়ে গেলো ধমনীর মধ্যে দিয়ে। ধমনীও মোটা থেকে ক্রমশঃ সরু হতে হতে চুলের মত সরু ক্যাপিলারীর অবস্থায় গিয়ে পৌঁছালো। গাছের ডাল থেকে ঝোপেঝাড়ে

শূন্যে যে মিহি মাকড়শার জাল ঝোলে, প্রায় সেইরকমই মিহি পাতলা হালকা এ ক্যাপিলারী কিন্তু যোগসূত্র রচনা করেছে ধমনী আর শিরার মধ্যে। ঠিক যেন হাওড়ার পোলের এদিকে কলকাতা, ওদিকে হাওড়া। এই ক্যাপিলারীর মধ্যে দিয়েই অক্সিজেন চালানের কাজটা করতে হয় আমাকে।

ক্যাপিলারী যে কত সরু, তা বুঝতে পারবেন শুধু একটা ঘটনা বললেই। লাল কোষ বেচারীরা পাশাপাশি দুজনেও যেতে পারে না একটা ক্যাপিলারীর মধ্য দিয়ে, পেছন পেছন লাইন দিয়ে যেতে হয়। কোথাও কোথাও এত সরু যে রাস্তা করার জন্যে দুমড়ে মুচড়ে কোষদেহকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে পথ করে নিতে হয়। কিন্তু পথ করে নিতে এক-আধ সেকেণ্ড যাওয়ার পরেই দেখা যায় ঘুর্ণিঝড়ের মতই তৎপরতা আরম্ভ হয়ে গেছে এদের মধ্যে। ঠিক যেন লরী থেকে মাল খালাস করেই এমন মাল দিয়ে ফের লরী বোঝাই করা হচ্ছে যা নেহাতই অকেজো—জঞ্জাল। কাজের জিনিস যেটা নামিয়ে দেওয়া হয়, তা হল অক্সিজেন। সঙ্গে সঙ্গেই বাজে জিনিস যেটা তুলে নেওয়া হয়, তা হল কার্বন ডায়অক্সাইড। কোষে কোষে দহন ক্রিয়ার জন্যে যে কার্বন ডায়অক্সাইড জমা হচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে, সবচেয়ে বড় এবং মূল আবর্জনা এই গ্যাসটাকেই অক্সিজেনের জায়গায় বোঝাই করে নিয়ে ফিরে আসতে হয় শরীরের বাইরে ফেলে দেওয়ার জন্যে—যেভাবে ধাপার মাঠে লরী বোঝাই করে কলকাতার জঞ্জাল ফেলা হয়, অনেকটা সেইরকমই আর কি।

কিন্তু এছাড়াও আরও কতরকমের মালপত্র টিশুতে পৌঁছে দিতে হয় আমাকে, তা শুনলে চোখ কপালে উঠে যাবে আপনার। প্রত্যেক টিশু আর দেহযন্ত্রের কোষদের বাজারের ফর্দ কিন্তু একরকম নয়। চাহিদা প্রত্যেকেরই আলাদা—বায়নাক্কা হাজার রকমের। একই শরীরে থেকে প্রত্যেকটা টিশু আর দেহযন্ত্রের কোষেরাই যেন এক-একটা খাপ্পা খা। কোনো কোষ চায় কোবাল্টের ছিটেফোঁটা, অন্যেরা চায় খনিজ ধাতু, ভিটামিন, হরমোন, গ্লুকোজ, ফ্যাট, অ্যামিনো অ্যাসিড, অথবা সামান্য একটু জল। এই হাজার চাহিদা মিটিয়ে চলতে হয় আমাকে মুহূর্তে মুহূর্তে। এর ওপর যদি ব্যায়াম করতে শুরু করে উপেন, তাহলে টিশুদের সব চাহিদাই দারুণ বেড়ে যায়। চামড়া লালচে হয়ে ওঠে—তার মানেই

বুঝতে হবে ক্যাপিলারীরা পুরোদমে খেটে চলেছে। অক্সিজেন খালাস আর কার্বনডায়অক্সাইড বোঝাইয়ের কাজ বহুগুণ বেড়ে গেছে। কোষেদের বাড়তি চাহিদা মিটিয়ে চলেছে বহুগুণ বেশী বেগে। আবার যখন উপেন

রক্তপ্রবাহ
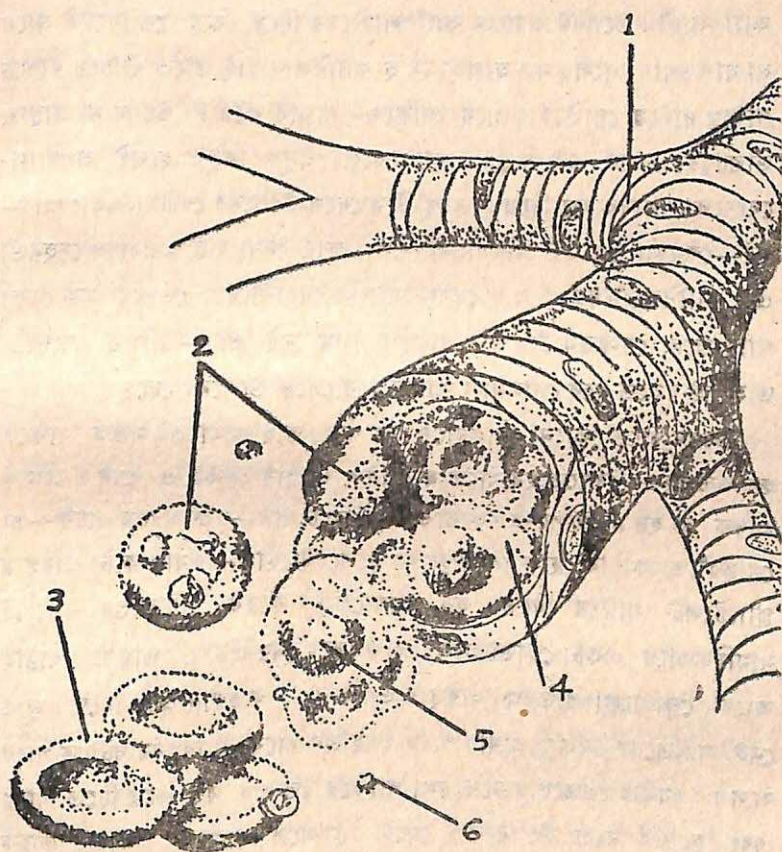
১। আর্টারিওল বা ছোট ধমনী (ধমনীর সঙ্গে ক্যাপিলারীর সংযোগকারী); ২। গ্রানিউলোসাইটস; ৩। লাল রক্ত কোষ; ৪। লিমফোসাইট; ৫। মনোসাইট; ৬। প্লাটেলেট;

নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়, তখন কোষেদের চাহিদা একেবারে কমে যায়, ঘ্যানঘানানি একদম থাকে না। ক্যাপিলারীদের শতকরা নব্বইভাগ দোকান-পাট বন্ধ করে ছুটি নেয়।

শেষ পর্যন্ত যদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, দেখা যাবে উপেনের ক্যাপিলারীর মতই উপেনও রীতিমত স্বাস্থ্যবান। উপেনের ধারণা সে বুঝি নিঃশ্বেস নেয় ফুসফুস দিয়ে, খায় মুখ দিয়ে, খাদ্যের পুষ্টি চালান দেয় অন্ত্রের মধ্য দিয়ে। ভুল, ভুল, সব ভুল। আসলে এ সবই করছে ক্যাপিলারী। উপেনই করাচ্ছে ক্যাপিলারীদের দিয়ে, কিন্তু সে নিজেই জানে না মাকড়শার জালের মত হালকা মিহি ক্যাপিলারীরাই তাকে বাঁচিয়ে রাখছে খাইয়ে দাইয়ে পোষ্টাই জুগিয়ে অক্সিজেন সাপ্লাই করে। উপেন না জানুক, ডাক্তাররা জানে এই তত্ত্ব। জানে বলেই অসুখ বিসুখ হলেই অপথ্যালমোসকোপ নামক যন্ত্র দিয়ে অত খুঁটিয়ে দেখে উপেনের রেটিনা অর্থাৎ অক্ষিপট—কেন না শুধু এই জায়গাতেই তো স্পষ্ট দেখা যায় অসাধারণ মেহনতী এই ক্যাপিলারীদের। যদি দেখা যায়, বেচারীদের ভেতরে রক্ত ডেলা পাকিয়েছে, সে-রকম টান টান অবস্থায় আর নেই ওরা—এলিয়ে পড়েছে, তাহলেই বুঝতে হবে গোলমাল আরম্ভ হয়ে গেছে উপেনের দেহে।

উপেন যাতে কোনো গোলমালে না পড়ে, তাই আমাকেই সতর্ক থাকতে হয় অষ্টপ্রহর—দেখতে হয় যাতে স্বাভাবিক অবস্থার একটুও যেন এদিক ওদিক না হয়। উপেনের কোথাও যদি কেটে যায়—রক্ত ঝরতে থাকে—তা সে ছুরীতে কাটাই হোক কি বন্দুকের বুলেটেই হোক—অমনি কাটা জায়গায় প্ল্যাটেলেট পাঠিয়ে দিতে হয় আমাকে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সাময়িকভাবে একটা জোড়াতালির কাজ সেরে নেয় এরা। তারপর পাঠাই আরো জোরালো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপাদান। ক্ষতস্থান জুড়ে দিতে জুড়ি নেই ফাইব্রিনের—কিন্তু আমার রক্তে ফাইব্রিন থাকে না বিপর্যয় ঘটাতে পারে বলে। ধমনীর ভেতরে রক্তকে দলা পাকিয়ে রক্ত পথ বন্ধ করে দিতে পারে এবং মুহূর্তের মধ্যে উপেনকে মেরে ফেলতে পারে। অথচ তাকে একান্তই দরকার ক্ষত মুখ জুড়ে দেওয়ার জন্যে। তাই ফাইব্রিন বানাতে যে কাঁচামালের দরকার তা মজুদ রাখি হাতের কাছে অষ্টপ্রহর—মজুদ রাখি সেই সব এনজাইম যাদের সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কাঁচামাল থেকে ফাইব্রিনের উৎপাদন সম্ভব। দু এক সেকেণ্ডের মধ্যে কাজ

আরম্ভ করে দিতে পারি আমি। আপৎকালীন অবস্থার মোকাবিলা করার পর কাঁচামাল এনে জুড়তে থাকি ক্ষতমুখ।

তাহলে, আমার এই রক্তসংবহন তন্ত্র চলছে ঠিক যেন একটা পাইপ লাইন সিসটেম মারফৎ। অজস্র পাইপ—তার মধ্যে দিয়ে রক্ত যাচ্ছে—আর আসছে বিরাম বিহীনভাবে। এই পাইপের কোথাও ছেঁদা হলেই যেমন আপৎকালীন অবস্থার উদ্ভব হয়—বিষম বিপদে পড়তে হয়—তেমনি উটকো উৎপাত রক্তের মধ্যে ঢুকে পড়লেও আপৎকালীন অবস্থা অর্থাৎ এমার্জেন্সী অবস্থা এসে দাঁড়ায়। ধরুন ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাস, পরাগ, কোনো কিছুর ভাঙা চোকলা (ফর্দের কিন্তু শেষ নেই, কত আর নাম বলব) পাইপে ছেঁদার চাইতেও বড় বিপদ—প্রাণ নিয়ে টানাটানির অবস্থায় গিয়ে পড়তে পারে বেচারী উপেন। কিন্তু এহেন হানাদারদের মোকাবিলা করার জন্যেও হাতিয়ার মজুদ থাকে আমার কাছে। এর নাম অ্যান্টিবডি। শত্রুসংখ্যা কোটি কোটি হলেও শুধু এই অ্যান্টিবডি বাহিনী দিয়েই আক্রমণ প্রতিরোধ করি আমি। এক একটা অ্যান্টিবডি আবার এক-এক ধরনের শত্রুকে ঘায়েল করার উপযুক্ত করে তৈরী। ঠিক যেন একটা লাখ দশেক লোকের পুলিশ বাহিনী—যে বাহিনীর প্রত্যেক অফিসার বিশেষ বিশেষ ধরনের অপরাধের মোকাবিলা করতে দক্ষ। প্রত্যেকেই যেন বিশেষজ্ঞ এক-একরকমের শত্রু নিধনের মন্ত্রগুপ্তিতে।

আমার এই অ্যান্টিবডিদের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বৈশিষ্ট্য হল এদের মনে রাখার ক্ষমতা। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। ছ'বছর বয়েসে উপেনের গলগণ্ড (মাম্‌স্) হয়েছিল। উপেনের নিজেরই তা মনে নেই। কিন্তু তার অ্যান্টিবডির ঠিক মনে আছে। মাম্‌স্-ভাইরাস যদি এখন ঢোকে উপেনের শরীরে, সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুরের পেছনে টেরিয়ার কুত্তা যে ভাবে তেড়ে যায়, ঠিক সেইভাবে এই অ্যান্টিবডিরা ঝাঁপিয়ে পড়বে সেই ভাইরাসের ওপর। উপেন জানতেও পারবে না কি লড়াই হয়ে গেল তার রক্তের মধ্যে, কিন্তু অক্কা পেতেই হবে হানাদারদের—রক্ষে নেই অ্যান্টিবডিদের হাত থেকে। অক্কা পাবে সেই অ্যান্টিবডিরাও। যুযুধান দুই পক্ষকেই পটল তুলতে হবে লড়াইয়ের শেষে। মৃতদেহে বোঝাই হবে আমার রক্তস্রোত—কিন্তু নোংরা আমি একদম পছন্দ করিনা—ঘরদোর সবসময়ে সাফসুতরো রাখি—তাই ফ্যাগোসাইট নামে কতকগুলো সাদা কোষ এগিয়ে যাবে তক্ষুনি মড়াগুলোর

কাছে অর্থাৎ ধাঙ্গর বাহিনীও তৈরী থাকে আমার রক্তের মধ্যে !

এই কটা লাইন পড়তে আপনার যতটুটু সময় গেল, তার মধ্যেই কিন্তু নিহত অ্যান্টিবডিদের জায়গায় তৈরী হয়ে গেল কোটি কোটি অ্যান্টিবডি। এরা না থাকলে খুব সামান্য সংক্রমণ থেকেও রেহাই পেতনা উপেন— প্রাণ যেত শুধুমুধু।

আমায় চাহিদা ভাসা ভাসা নয়—ঠিক যেটুকু দরকার, সেইটুকুর কম বা বেশী হলেই বাধে যত ঝামেলা। রাশিরাশি রোগের ডিপো হতে হয় সেই কারণেই। রক্তে ক্যালসিয়াম ঢুকতে থাকলে কাদামাটির নলচের মতই শক্ত হয়ে যায় আমার ধমনী। চর্বির স্তর জমতে জমতে যখন ধমনী পথ বন্ধ হয়ে যায়, তখন বুড়ো আঙুলের পচা ঘা থেকে আরম্ভ করে স্ট্রোক বা মারাত্মক হার্ট অ্যাটাক পর্যন্ত ঘটতে পারে। সুগার (গ্লুকোজ) যদি বাড়তে থাকে রক্তে, তখন ডায়াবেটিসে ভুগতে হয় উপেনকে ; বেশী কমে গেলে ভোগে হাই-পোগ্লাইসিমিয়া রোগে—বুক ধড়ফড় করতে থাকে, চামড়া ফ্যাকাশে হয়ে যায়, ঘামতে থাকে, মাথা ঘুরতে থাকে, দুর্বল বোধ করে। লাল কোষ যদি সংখ্যায় খুব কমে আসে অথবা ঠিকমত কাজ না করতে পারে, তখন দেখা যায় অ্যানিমিয়া রোগ। সেই কারণেই বললাম, বড় সূক্ষ্ম আমায় এই রক্ত সংবহন তন্ত্র—ভারসাম্য একটু টলে গেলেই রোগের বাসা হয়ে দাঁড়াই।

ধরুণ সাদা কোষের সংখ্যা নাটকীয় ভাবে কমতে লাগল। কমতে কমতে এমন একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো যে আমার অ্যাগ্রানিউলোসাইটোসিস হয়ে গেল। সেই সময় সংক্রমণ নিবারণের জন্যে যদি অ্যান্টিবডিরা কোমর বেঁধে না লাগে এবং উপেনকে সারিয়ে না তোলে—তাহলে বেচারীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ঠিক উল্টো ব্যাপারটাও ঘটতে পারে। হু-হু করে বেড়ে যেতে লাগল সাদা কোষের সংখ্যা—স্বাভাবিক অবস্থায় যেখানে থাকে এক কিউবিক মিলিমিটার রক্ত পিছু ৬০০০ থেকে ৮০০০, সেখানে গিয়ে দাঁড়াল এক লক্ষ, কি তারও বেশী। লিউকিমিয়া অর্থাৎ রক্তের ক্যানসার হলে এমনি ঘটে। মৃত্যু আসে তার পরেই।

উপেন কি পারে আমার বোঝা কমাতে ? খুব পারে। আমার ব্লাড প্রেসারের দিকে লক্ষ্য রাখতে পারে—খুব বাড়লেই বুঝবে একটানা বড্ড বেশী চাপ পড়ছে আমার ওপর। ওষুধ দিয়ে এই চাপ কমিয়ে এনে একটা নিরাপদ মাত্রায় ধরে রাখতে পারে। নিয়মিত ব্যায়াম নিতান্তই প্রয়োজন—ঠিক-

মত বইতে পারে রক্তস্রোত। হিসেব করে খাওয়া দাওয়া আর একটা অত্যাবশ্যক ব্যাপার। বেশী চর্বি খাওয়া মানেই আয়ুষ্কাল কমিয়ে আনা।

সংক্ষেপে, অন্য টিশু বা দেহযন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশী যত্নআত্যির দরকার আমার। তাতে উপেন আর সবকটা দেহযন্ত্রেরই লাভ। যত যত্ন করবে আমায়, ততই ভাল থাকবে এদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য। উপেনেরই লাভ তাতে, নয় কী?

৬

পাচন তন্ত্র

শ্বদন্ত

উপেনের দেহমন্দিরে যে কজন মেহনতী শ্রমিক আছে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা সেবা করে চলেছে উপেনকে—তাদেরই একজন বলে ধরে নিতে পারেন আমাকে। ওর লিভারের মত প্রতিভা-দীপ্ত কেমিস্ট আমি নই, অথবা ওর হার্টের মত আত্মনিবেদিত গোলামও আমি নই। ওর জীবদ্দশাতেই সবচেয়ে নশ্বর-দেহাংশ আমি এবং যদি ওর মৃতুর পরেও টিঁকে যাই—তাহলে সবচেয়ে টেঁকসই হব আমিই। উপেনের দেহের আর সব অংশ ছাই হয়ে পঞ্চভূতে মিলিয়ে যেতে পারে—বেশ কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত কিন্তু থেকে যাব আমি—উপেনের শ্বদন্ত।

ওর ওপরের ডানদিকের শ্বদন্ত বা ছেদন-দন্ত, বা কুকুরে দাঁত আমি। আমাকে আই-টুথ'ও বলা হয়। আমার যমজটি রয়েছে বাঁর দিকের ওপরে এবং আমাদেরই বিপরীত দুজন রয়েছে নিচের চোয়ালে। আমরা এই ক'জন যে টিমের অন্তর্ভুক্ত, তার মোটসংখ্যা ছিল ৩২—উপেন যখন প্রাপ্ত-
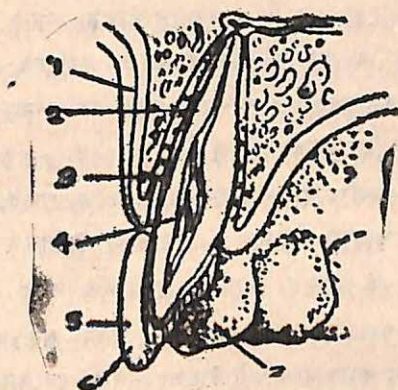
১। মাড়ি, ২। ডেনটাইন; ৩। সিমেন্টাম; ৪ নরম শাঁস; ৫। এনামেল; ৬। আইটুথ; ৭। প্রিমোলার;
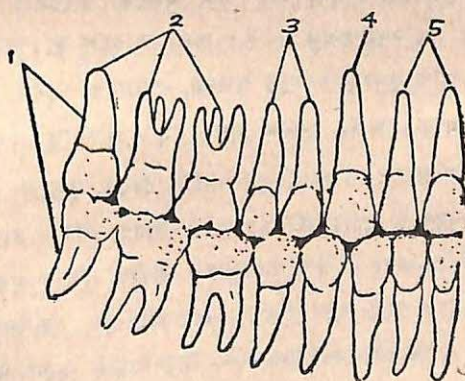
১। আক্কেল দাঁত; ২। মোলার (:কশের দাঁত); ৩। প্রিমোলার; ৪। কাসপিড ৫। ছেদনদন্ত

বয়স্ক হল, তখন। উপেন যখন খেতে বসে, আমরা এই দাঁতেরাই তার পাচনতন্ত্রে প্রাথমিক কাজ শুরু করি। খাওয়াটা যে কত মজার ব্যাপার, আমাদের দৌলতেই উপেন তা বুঝতে পারে। না চিবিয়ে কোঁৎ কোঁৎ করে গিলে খেলে খাবারের স্বাদ কি সেইভাবে পাওয়া যায়?

আমার কিছু কিছু অবদান বাস্তবিকই তাক লাগিয়ে দেওয়ার মত। নরম খাবারে এক কামড় এবং শক্ত খাবারে আর এক কামড় দিয়েই অনুভূতি সংজ্ঞা দিয়ে বুঝতে পারি কাকে ফেলে কাকে নেব। যে চাপে দেহের অন্যান্য যন্ত্র থেঁতলে জেলীর মত থলথলে হয়ে যেতে পারে, ভয়ানক সেই চাপও সওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে। জখম হলে উপেনের দেহের কিডনি, চামড়া এবং অনে অংশই নিজেই নিজেকে মেরামত করে নিতে পারে— আমরা পারি না। জখম যদি করেন আমাদের, জখম অবস্থাতেই থেকে যাব চিরটা কাল। দাঁত থাকতে থাকতেই দাঁতের মর্যাদা দেবেন।

উপেনের মুখবিবরের অন্যান্য দাঁতেদের হয়ে কথা বলার অধিকার আমার আছে কিনা জানতে চাইছেন? আমার মনে হয় সম্ভবত আমি, এই আই-টুথ বা চক্ষু-দন্তই সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক দন্ত উপেনের ত্রিশ পাটি দাঁতের মধ্যে। কেন, তাও বলছি। আমার নামের শেষ নেই দেখতেই পাচ্ছেন। কুকুরের দাঁতের মত দেখতে বলে না হয় কুকুরে দাঁত আখ্যা পেতে পারি। কিন্তু আই-টুথ বা চক্ষু-দন্ত নামটা কেন হল বলতে পারেন? নিশ্চয় চক্ষু-রত্নের মত দেখতে নয় আমাকে। তবে? শুনুন তাহলে কারণটা। বিলেতের মানুষ যখন রাশি রাশি কুসংস্কার নিয়ে আচ্ছন্ন, পুরোনো সেই দিনে ওদের ধারণা ছিল আমার শেকড় এত লম্বা যে পৌঁছেছে ওদের চোখ পর্যন্ত। এমন আতংকও ছিল যে আমাকে টেনে তুললে চোখজোড়াই ধুঁকতে থাকবে বিদঘুটে ব্যায়রামে। এখন অবশ্য ওরা জানে ধারণাটা ভিত্তিহীন, অর্থহীন এবং রাবিশ, তা সত্ত্বেও কথায় কথায় কোনো কিছুর বিষম প্রয়োজন ঘটলে বলে বসে, নিয়ে যাও আই-টুথ, বিনিময়ে দিয়ে যাও অমুক জিনিস। অর্থাৎ জিনিসটা কতখানি অত্যাবশ্যক হলে তবে চক্ষু-দন্ত দান করার জন্যে মন প্রস্তুত হয়।

সেই পুরাকালে মাছেদের দেহে হয়ত আঁশ আকারে শুরু হয়েছিল আমাদের অস্তিত্ব। আস্তে আস্তে এল বিবর্তনের ঢেউয়ের পর ঢেউ। স্থলদেশে জীবন-ধারা বিবর্তিত হয়ে চলল দ্রুত উন্নততর পথে, আমরাও চেহারা পাল্টালাম,

যেখানে ছিলাম—সেখান থেকে সরে এলাম এবং দাঁতে রূপান্তরিত হলাম। জন্মের সময়ে উপেন প্রায় মুখ ভর্তি দাঁত নিয়ে জন্মেছিল। মাড়ির মধ্যে ঢোকানো অবস্থায় ছিল ৫২টা দাঁত। পূর্ণ আকৃতি তখনো আমরা পাইনি। কিন্তু ২০টা শিশু-দন্ত এনামেল কোটিংসহ বেরিয়ে আসার তোড়জোড় আরম্ভ করে দিয়েছিল। নবজাতক উপেনের চোয়াল ছোট আর আধ-তৈরী অবস্থায় ছিল, মুখটাও স্তনবৃন্ত মুখে নেওয়ার অবস্থায় গড়ে উঠেছিল—চিবোনোর মত করে তৈরী হয়নি। শিশু-দন্তের জায়গা প্রায় ছিল না বললেই চলে—প্রাপ্তবয়স্কদের বত্রিশপাটির তো নয়ই।

মাড়িই আমাদের মাতৃজঠর। ছ-মাস বয়েসেই আমাদের প্রথম জনাকয়েক মাড়ি ফুঁড়ে ওপরে বেরিয়ে আসা আরম্ভ করেছিল। সংখ্যায় তারা চার। এই চার মূর্তিমানকেই দাঁতের ডাক্তাররা বলেন incisor অর্থাৎ ছেদন-দন্ত, যা দিয়ে কাটতে খুব সুবিধে। উপেন অবিশ্যি বাচ্চা বেলার বড় আদরের এই চার মূর্তিমানকে বলে সামনের দাঁত। কচি-কচি দুধে-দাঁতগুলোর জন্যে কি ভালই না দেখতে লাগত উপেনকে। ১৮ মাস বয়েসে উপেনের আহ্লাদ আর ধরে না—শিশু-দন্তে অর্থাৎ দুধে-দাঁতে মুখভরে গেছে যে। শিশু-দন্তদের শেষ দাঁতজোড়া বেরিয়েছিল দু-বছর বয়েসে। এদের দ্বিতীয় কশের দাঁত চালু কথায় আমরা বলি বটে, দাঁতের ডাক্তারেরা বলেন সেকেণ্ড মোলার।

ছ'বছর বয়েসে বেরোতে আরম্ভ করে কশের দাঁতগুলো। স্থায়ী দাঁত-দের তরফ থেকে সবার আগে আবির্ভূত হয়েছিল এরাই—দুধে দাঁতদের পেছনে মহা ঠেলাঠেলি জুড়েছিল মাড়ির ওপরে মাথা তোলবার জন্যে। খাবার চিবিয়ে খেতে সাহায্য করেছিল এই কশের দাঁতেরাই এবং অন্যান্য দুধে দাঁতদের শেকড়গুলো উপেনের শরীরের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়ার ফলে আলগা হয়ে যায় দাঁতের গোড়া—একে একে পড়ে যেতে থাকে বাচ্চাবেলার দুধে দাঁতেরা—সে জায়গায় বেরিয়ে আসে স্থায়ী দন্তবাহিনী। উপেনের বয়স যখন ১২, তখন আবির্ভূত হলাম আমি—শ্রীশ্বদন্ত। সবশেষে বেরোলো আক্কেল দাঁত—রীতিমত আক্কেল দিয়ে—উপেনের বয়স তখন ১৮।

আমার গড়ন পেটনটা এবার দেখুন। ইঞ্জিনীয়ারদের হাতে তৈরী একটা নিখুঁত যন্ত্র নই কি? আমার যে-অংশটা মাড়ি থেকে ঠেলে উঠেছে, তাতে রয়েছে এনামেল (মিনে বা কলাই) য়ের একটা 'চামড়া'। জিনিসটা

মূলতঃ ক্যালসিয়াম ফসফেট দিয়ে নির্মিত—দেহমন্দিরের কঠিনতম খনিজ বস্তু। খুব পঁুচকে ছ'কোনা ডাণ্ডা গুচ্ছ গুচ্ছ যেন দাঁড়িয়ে আছে—বাণ্ডিল বাণ্ডিল ছ'কোনা পেন্সিল দাঁড়িয়ে থাকলে যেমন দেখায়—ঠিক সেইভাবে ; এই সবের সমষ্টি হল আমার এনামেল। ডাণ্ডা বা রডগুলো কত পঁুচকে জানেন? কয়েকশ একত্র করলে তবে একগাছি চুলের মত মোটা হবে। স্নায়ু বা নার্ভের বালাই নেই আমার এই কঠিনতম এনামেল অঞ্চলে—তাই বেদনা বোধের অনুভূতিও নেই, কিন্তু কড়মড় করে হাড়গোড় পর্যন্ত চিবিয়ে খাওয়ার সময়ে যে প্রচণ্ড এবং ভয়াবহ চাপ পড়ে দাঁতেদের ওপর—তা নির্বিকার ভাবে সয়ে যাওয়ার ক্ষমতা এদের আছে।

এনামেলের ঠিক নিচেই রয়েছে ডেনটাইন—যার সঙ্গে আত্মীয় সম্পর্ক রয়েছে হাড়ের। ক্যালসিয়াম দিয়ে গড়া এই টিশুটাই দাঁতের মধ্যবর্তী শাঁসের মত বস্তুটিকে আগলে রেখে দিয়েছে পরম যত্নে। দাঁতের অনুভূতির শুরু কিন্তু এই ডেনটাইন থেকেই। ডেনটাইনের ঠিক নিচেই আমার হৃদয়-দেশ—নরম শাঁস। মোটামুটি তুলতুলে বস্তুটার মধ্যে থেকে স্নায়ু, রক্তবাহ আর কোষেরা বেরিয়ে চারপাশে বিকিরিত রশ্মির আকারে প্রবেশ করেছে ডেনটাইনের অতিসূক্ষ্ম নলিকাগুলোর মধ্যে। সবকিছু নিয়ে দাঁত নামক বিচিত্র মিনারটি বসানো থাকে চোয়ালের খাপে—ঠিক দাঁতের সাইজেই হুবহু মাপে তৈরী—সিমেনটাম নামক এক জাতীয় অস্থিময় টিশু আর হাজার হাজার তন্তু দিয়ে নোঙর গাঁথার মত মজবুত ভাবে খাপে খাপে বসে থাকে যে-যার গর্তে।

উপেনের চোয়ালের হাড়ের অখণ্ড অংশ আমরা কিন্তু নই। ফুলের টবে বসানো বিস্তর ফুলগাছের মতই যেন আমরা শেকড় চালিয়ে বসে আছি ওর মাড়ির ওপর যে-যার নির্দিষ্ট কাজ সুসম্পন্ন করার জন্যে। সামনের দিকে যারা শুধু কাটবার জন্যে রয়েছে, তাদের যেমন একটা শেকড়ই যথেষ্ট, তেমনি আমিও (যার কাজ মাংস আর শক্ত খাবারকে ছিঁড়ে নেওয়া), একটা শেকড় নিয়ে দিব্বি মজবুত। আমাদের পেছনে যারা অধিকতর ভারী কাজের উপরক্ত করে যাঁতাকলের মত নিষ্পেশন কাজ চালাচ্ছে—তাদের শেকড় তিনটে পর্যন্ত দরকার হয়—নইলে পারবে কেন কড়মড় করে হাড় চিবুতে।

দাঁত নিয়ে মাঝেমাঝেই বড় ঝামেলায় পড়ে উপেন। আশ্চর্য কিছুই নয়, এর মধ্যেই আমাদের চারজনকে হারিয়েছে—আরও কয়েকজন যাওয়ার

পথে, গোড়া থেকেই দন্তবাহিনীর যদি উপযুক্ত পরিচর্যা করে যেত উপেন, এই বিপর্যয় দেখা দিত না। উপেন অবশ্য রোজ দাঁত মাজে বুরুশ দিয়ে, মাউথওয়াশে মুখবিবরও সাফ রাখে। তাইতেই ওর ধারণা মুখবিবর বুঝি ঝকমকে তকতকে হয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে, অগুন্তি জীবাণুদের চিড়িয়াখানা হয়ে থাকে মুখের ভেতরটা। এদের মুখ থেকে তাড়ানোটাও ওর পক্ষে সোজা নয়।

মুখবিবরের মধ্যে খাদ্যকণার সঙ্গে ব্যাকটিরিয়াদের পারস্পরিক ক্রিয়ার (মিথস্ক্রিয়া) ফলে দাঁতের অবক্ষয় নিয়ে জীবনের বেশীর ভাগ কাটিয়ে এল উপেন। দাঁতের এই ক্ষয় হল গিয়ে ওর সবচেয়ে বড় শত্রু। দাঁতের ফাঁকফোকরে আবর্জনা সঞ্চিত হয়। উপেনের দাঁতের ডাক্তার এর নাম দিয়েছে প্লাক (plaque) বাংলায় যার মানে ধাতু ইত্যাদি নির্মিত ফলক। সাধারণতঃ এরা অদৃশ্য। জীবন্ত ব্যাকটিরিয়ারা অদৃশ্য এই ফলকের ওপর খাদ্যকণাকে গাঁজিয়ে তা থেকে অ্যাসিড উৎপাদন করে। সেই অ্যাসিড এনামেল গালিয়ে ব্যাকটিরিয়াদের তারও অন্দর মহলে ঢোকবার পথ প্রশস্ত করে দেয়। তোপ দেগে দুর্গপ্রাকার ধসিয়ে দেওয়ার মত ব্যাপার আর কি ! সূক্ষ্ম জীবাণুদের ক্ষমতাটা দেখুন। দেহের কঠিনতম এনামেল পাঁচিলকেও গালিয়ে দিচ্ছে অ্যাসিড দিয়ে। অথচ তাদের অণুবীক্ষণে দেখতে হয় বলে আমলই দিতে চাই না আমরা। ভেতরে ঢোকবার পথ আরও একটা আছে। উপেনের এনামেল কোটিংয়ে সূক্ষ্ম চিড় থাকতে পারে—সামান্য সেই ফাঁক ফোঁকরের মধ্যে দিয়ে কুটকচালে মহাশত্রু জীবাণুরা সুরুৎ করে ভেতরে ঢুকে বসে এনামেলের ঠিক নিচের ডেনটাইনের ওপর ক্ষয়কর্ম শুরু করে। এক্স-রে দিয়ে এই লুকোনো ক্ষয় দেখা সম্ভব। ব্যাপারটা আরো সাংঘাতিক। এনামেলের ওপরে তো খুব মাজাঘষা পালিশ চলছে—তলায় বসে আরামসে তেনারা দাঁতের ভিত নড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন।

২৫ বছর বয়েসের পর থেকেই দাঁতের এই অবক্ষয় মন্থর-গতি হয়ে আসে। এর পরেই যে জিনিসটার জন্যে উপেনের সজাগ থাকা দরকার, তা হ'ল দাঁত ঘিরে নানা ধরনের অসুখবিসুখ, এরা হানা দেয় মাড়ির লাইনের নিচে। এখানেও কিন্তু পালের গোদা এই প্লাক। অনেকদিন ধরে একটু একটু করে মুখের লালা থেকে খনিজদ্রব্য টুকটাক করে তুলে নেয় অদৃশ্য

এই প্লাক—ফলে প্লাক হয়ে যায় টার্টার অথবা দাঁতের পাথরি। পাথরের মতই তা কঠিন, খাঁজকাটা, এবড়ো খেবড়ো ধারযুক্ত। প্লাক অথবা টার্টার—এই দুই পরম শত্রুর দুজনের যে কেউ মাড়ির নিবিড় সান্নিধ্য থেকে আলগা করে দেয় দাঁতকে—এমন ছোট ছোট পকেট বানিয়ে দেয় যার মধ্যে জমা হতে থাকে খাদ্যকণা এবং ব্যাকটিরিয়া।

যত দুর্ভোগের সূত্রপাত এই থেকেই। মাড়ি ফোলে, রক্ত পড়ে। মাড়ি দাঁতের যে নরম অংশটিকে পরম স্নেহে অতন্দ্র প্রহরীর মত আগলে রেখে দেয়, সাধারণতঃ ব্যাকটিরিয়া মহাপ্রভুরা সে অঞ্চলেই ঢুকে পড়ে গুটিগুটি, এই অবস্থা অব্যাহত থাকলেই সর্বনাশ—পুঁজের পকেট তৈরী হয়ে যায়—চোয়ালের সঙ্গে আমাদের লেগে থাকারও দফারফা হয়ে যায়। এই অবস্থায় পৌঁছোলেই উপেনের মাড়িদের শেষ প্রণাম জানিয়ে শ্মশানযাত্রা করা ছাড়া আর পথ থাকে না আমাদের। উপেনের এখন যা বয়স, ওর অধিকাংশ দাঁতের রোগের উৎস কিন্তু এইখানেই।

উপেন যখন আদরের খোকা, তখনই যদি ওর বাবা-মা দাঁত সিধে করে দিতেন, তাহলে ওপরের পাটির দাঁত নিচের পাটির সঙ্গে এসে মিলত চোয়াল বন্ধ করলে এবং ম্যালোক্লুসন নামক দাঁত ঘিরে আর একটি রোগের সূত্রপাত ঘটত না। দাঁত ভাঙ্গা নামের এই রোগটি কি আগেই বললাম—ওপরের পাটির দাঁত নিচের পাটির ঠিক জুড়ি দাঁতের সঙ্গে এসে মিলতে পারে না চোয়াল বন্ধ করলে। ফলে একটা দাঁত যখন সক্রিয়, তারই জুড়ি অপর দাঁতটি তখন নিষ্ক্রিয়। বসে থাকলে হাড়েও ঘুন ধরে—কাজেই নিষ্কর্মা দাঁতটিরও গোড়া আল্গা হয়ে যায় কাজের কোনো উদ্দীপনা পায় না বলে। শেকড় ঢিলে হলেই দাঁতের গোড়া থেকে মাড়ি সরে যায়, পুঁজের পকেট তৈরী হয়। মহানন্দে জীবাণুরা হানা দেয়। আস্তে আস্তে দাঁত নড়তে থাকে—তারপর গঙ্গাযাত্রা করে যথা সময়ে।

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝুন মশায়। শুধু এই কথাটাই দাঁতে পিশে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সোজা বলছি, দাঁতের ক্ষয় আর দাঁত ঘিরে যে সব রোগেদের কথা এখুনি বললাম, এ সবেরই পুরো পুরি নিবারণ সম্ভব এ-যুগে। উপেন যখন বাড়ের মুখে, তখন থেকেই ফ্লোরাইড-যুক্ত পানীয় জল খেলে দাঁত শক্ত হত, ক্ষয়কে বেশী করে প্রতিরোধ করতে পারত। আজ এই ৪৭ বছর বয়েসেও উপেন ইচ্ছে করলে ভবিষ্যতের

গর্ভে প্রতীক্ষমান বহু ঝঞ্ঝাটকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে পারে—পুরোপুরি না পারলেও আসন্ন অনেক উৎপাতের সংখ্যাগুলো তো কমিয়ে আনতে পারে। দাঁতেদের ফাঁক পরিষ্কার এবং ফাঁকে ফাঁকে বুরুশ চালিয়ে দাঁত মাজা একান্তই প্রয়োজন। দাঁতখোঁটা বস্তুটা ভদ্রসমাজে নিষিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু দাঁত পরিষ্কারের ব্যাপারে এর জুড়ি নেই। দাঁতের কাজে ব্যবহার করার উপযুক্ত মিহি, কোমল, সাদা ও অত্যুজ্জ্বল রেশমতন্তু—দুই দাঁতের ফাঁক দিয়ে চালান করেও দাঁত সাফ রাখা যায় পরিপাটি ভাবে। প্রত্যেকবার উদর দেশে খাদ্য নিক্ষেপ করার পর এবং মিষ্টি-টিষ্টি খাওয়ার পরেও দাঁত সাফ করা খুব ভাল অভ্যেস। মিষ্টি হল দাঁতের যম। চিনিতে জীবাণু খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। সুতরাং দাঁতে মিষ্টি না রেখে ভাল করে ধুয়ে ফেলাই মঙ্গল।

বুরুশ দিয়ে ওপর ওপর দাঁত মাজলে অদৃশ্য দাঁতের প্লাককে. বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছোঁওয়া যায় না। দাঁতের ডাক্তার কিন্তু এই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন—অদৃশ্য শত্রু কোথায় কোথায় ঘাপটি মেরে আছে, দেখিয়ে দিতে পারেন। অথচ সময়ও বেশী লাগে না—রোজ কয়েকটা মিনিট খরচ করলেই যথেষ্ট। ওষুধের দোকানে এক রকম বড়ি কিনতে পাওয়া যায়। উপেন তা চুষুক। বড়িতে থাকে বিশেষ রকমের রঙ-মিশোনো খাবার। লাল রঙটা লেগে যায় অদৃশ্য প্লাকের গায়ে—তখন তা দেখা যায় ছোপ ছোপ আকারে। এর পরের কাজটা অতীব সহজ। ঠিক সেই-সেই জায়গাগুলো ভীমবিক্রমে বুরুশ দিয়ে আক্রমণ করলেই সর্বনেশেরা আর ক্ষতি করতে পারবে না দাঁত নামক অমূল্য রত্নদের।

রুটিনমাফিক শুধু এই কাজই করে গেলেই বহু সমস্যাকে কলা দেখাতে পারবে উপেন। এর পরেও যদি কোনো কোনো জায়গা উপেনের চোখ এড়িয়ে গিয়ে থাকে তো বছরে বার দুয়েক ডাক্তারের কাছে গিয়ে পেশাদারী পন্থায় সাফসুতরো করে নিক দাঁতেদের আগাপাশতলা। দাঁতের যে জায়গা দিয়ে খাবার কামড়ানো হয়, সেখানে ফাঁক ফোঁকর বা চিড় থাকলে যাতে তার মধ্যে দিয়ে জীবাণু ঢুকে না বসে, তাই প্লাস্টিক দিয়ে সেই সব ফুটোফাটা বেমালুম বন্ধ করে দেন দাঁতের ডাক্তার। এ ছাড়াও যে সব দাঁত ঠিকমত দাঁতে দাঁতে মিলছে না, তাদেরকেও ঘষেমেজে শায়েস্তা করে দিতে পারেন দাঁতের ডাক্তার।

বিপদের অশনিসংকেত দেখলেই উপেন যেন হুঁশিয়ার হয়। মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া মানেই বুঝে নিতে হবে সবচেয়ে মোক্ষম জায়গা—মাড়ি লাইনে ভাঙন ধরেছে। কারণটা চক্ষের পলকে ধরে ফেলতে পারেন দাঁতের ডাক্তার—উপেনের উচিত তাঁরই শরণাপন্ন হওয়া তিলমাত্র গড়িমসি না করে। উপেনের আরও একটা কথা খেয়াল রাখা দরকার—ব্যায়াম জিনিসটা আমাদেরও দরকার। মুচমুচে খাবার, চিবিয়ে খাওয়ার মত খাবার—যেমন আপেল ছোলা মটর রুটি—এই সবে আমাদের পুরো ইমারতটা উদ্দীপ্ত থাকে এবং মজবুতও থাকে।

সব মিলিয়ে দেখুন মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল নেই উপেনের। উপেন যদি বছরে দুবার পেশাদারী পন্থায় আমাদের সাফ করিয়ে নেয়, মাড়িতে রক্ত পড়লেই ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় এবং প্রতিদিন আমাদের আগাপাশতলা সাফসুতরো রাখে, তাহলেও আমরাও ওকে সেবা করে যাব অনেক…অনেক বছর। মুখভর্তি বাঁধানো দাঁতের বাহার দেখিয়ে উপেন যত সুখী হবে, তার চাইতে বেশী স্বর্গসুখ পাবে যদি আমরা টিঁকে থাকি তার মাড়ি সংলগ্ন হয়ে।—

গলা

আপনার সঙ্গে মোলাকাৎ ঘটলেই উপেন যখন সোল্লাসে বলে ওঠে—“নমস্কার, নমস্কার! বলি আছেন কেমন?” তখন এই কথাগুলো—আমারই কথা—উচ্চারণ করতে গিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে-সব নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা এবং বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজন ঘটে, একটা মহাকাশযানের জটিল কলকব্জা-কেও অম্লান করে দেওয়ার মত। আরও আছে। উপেন অফিস যাওয়ার আগে কোঁৎ কোঁৎ করে ভাতের গরস গিলতে থাকে, তখন আবার যে-ধরনের নিখুঁত সময়বদ্ধ ঘটনা পরম্পরার সূচনা ঘটে, তার একচুল এদিক ওদিক ঘটলেই ওর প্রাণ যেতে পারে। মনে হয় অতিশয় সামান্য ব্যাপার মুখভর্তি খাবার-কোঁৎ করে গিলে নেওয়ার মধ্যে অসামান্য কিছু আছে কি? এত নিখুঁতভাবে কাজকর্মগুলো চালিয়ে যাই বলেই জানতে পারে না উপেন কিভাবে প্রতিবার খাদ্য গলাধঃকরণের সময়ে তার প্রাণটা বাঁচিয়ে চলেছি আমি। কাজেই আমি সামান্য নই—অনুগ্রহ করে খেয়াল রাখবেন।

মিরাক্‌ল্ ঘটিয়ে চলেছি প্রতিবারে ওর খাবার সময়ে—অলৌকিক ক্রিয়াকর্মই বলতে পারেন—তা সত্ত্বেও উপেনের ধারণা আমি একটা লম্বায় খাটো লালচে রঙের বাগানে জল দেওয়ার নলের মত পাইপ ছাড়া কিছু নই—নাক, ফুসফুস, মুখ-বিবর আর পাকস্থলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করাই বুঝি আমার একমাত্র ধর্ম। যখন আমি জ্বালাযন্ত্রণায় উসখুস করি, সাধা-রণতঃ শুধু তখনি উপেন টের পায় আমার অস্তিত্ব—নইলে আমি যে আছি সে খেয়ালটাও থাকে না। এক কথায় আমাকে বলতে পারেন, আমিই হলাম গিয়ে উপেনের দাসানুদাস অষ্টপ্রহরের গোলাম—গলা।

ভাবলেও হাসি পায় আমি নাকি নিতান্তই একটা বাগানের জল দেওয়ার হোসপাইপ। হায়রে! উপেন যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারত কি জটিল পরিবহন ব্যবস্থা চালু রয়েছে আমার মধ্যে দিয়ে, তাহলে চোখ কপালে উঠে যেত বেচারার। নানা ধরনের মাল ঠিকমত আলাদা করে নিয়ে নানা পথে চালিয়ে দিতে হচ্ছে আমাকে। বাতাস, তরল পদার্থ, কঠিন পদার্থ—এই তিন সামগ্রী নিয়েই চলছে আমার পরিবহনক্রিয়া।

উপেন যখন ভূমিষ্ঠ হল, তখনি কিন্তু আমার কলকব্জা একেবারে নিখুঁত অবস্থায় পৌঁছে গেছে। তৈরী যন্ত্র নিয়েই জন্মেছিল উপেন—যদি তা না হত, তাহলেই প্রথম দুধ চুমুক দিতে গিয়েই দম আটকে অক্কা পেত উপেন মহাশয়। সেই থেকে চিরটা কাল সদাসতর্ক রয়েছি—ওকে যেন কোনোরকম ঝামেলায় না পড়তে হয়—হাওয়া, জলীয় খাবার আর শক্ত খাবার নিয়ে যেন নাকানি চোবানি খেয়ে দম আটকে মরে না যায়।

এমন আশ্চর্য সময় ব্যবস্থা আমার যে কেউ যদি তার মধ্যে এক সেকেণ্ডের এক ভগ্নাংশের হেরফের ঘটিয়ে দেয়, তাহলেই মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে যেতে হবে অকৃতজ্ঞ উপেন মহাশয়কে—মৃত্যু এসে টুঁটি টিপে নিয়ে যেতে চাইবে যমালয়ে। মারাত্মক বিপদটা ঘটতে দিচ্ছি না আমি—অধম এই গলা। বেশ তো, বেশী কথায় কাজ কি—মাংসের টুকরো গেলবার সময়ে ওকে একটু হাসতে বলুন না—দেখবেন কি কেলেঙ্কারীটা ঘটে। মাংসকে পেটের পথে চালান না করে আমি গলিয়ে দেব শ্বাসনালীর মধ্যে—যাবে দমটা আটকে। হার্ট অ্যাটাক হলে দুম করে যেমন মানুষ মারা যায়, ঠিক তেমনি ভাবে ইহলীলা সম্বরণ করবে শ্রীউপেন। চলতি কথায় বিষম খাওয়ার এই চূড়ান্ত অবস্থাকে অন্যভাবে বলা হয় 'কাফে করোনারী'—খেতে গিয়ে হার্টঅ্যাটাক হওয়ার সামিল আর কি-মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে উপেনের যদি না কেউ সেই সময়ে উপস্থিত বুদ্ধি-খাটিয়ে মাংসের ডেলাটাকে ঝটপট শ্বাসনালীর মুখ থেকে টেনে বার করে না দেয়। যাই হোক, মোটের উপর আমার ব্যবহার কিন্তু অন্যের কাছে উজ্জ্বল আদর্শ হয়ে থাকার উপযুক্ত। নীরবে নিঃশব্দে কি রকম বাঁচিয়ে চলেছি উপেনকে, এই ঘটনা থেকেই কি বুঝছেন না?

আমার গড়নটা কি রকম, সেইটা আগে না বললে বুঝবেন না আমার জটিল কাহিনীর জটিলতা। স্নায়ু, রক্তবাহ, কশেরুকা, বিবিধ টুকরা টাকরা জিনিস—এবং আমার নলসমূহ—এইসবের একটা বিরাট ট্রাফিক জ্যাম রয়েছে উপেনের ঘাড়ে। শিয়ালদায় যে রকম গাড়ীর ভিড়ে চক্ষুস্থির হওয়ার উপক্রম হয় গাঁ থেকে আসা মানুষদের—উপনের ঘাড়ে তেমনি ঠেলাঠেলি লেগেই আছে স্নায়ু, রক্তবাহ, কশেরুকা এবং ইত্যাদির সঙ্গে আমার পাইপদের। আমার প্রথম নলটা পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ফ্যারিংক্স (গলবিল)—ফানেলের মত দেখতে অনেকটা—চওড়া দিকটা থাকে ওপরে—উপেনের নাকের পেছন থেকে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে ওর কণ্ঠার পেছনে।

এর পরেই রয়েছে ল্যারিংক্স (স্বরযন্ত্র)। উপেনের কণ্ঠস্বর ফুটিয়ে তোলার কলকব্জার প্রধান যন্ত্রাংশ হল এই ল্যারিংক্স। এ ছাড়াও এর কাজ আছে। গলবিল দিয়ে নানা ধরনের যানবাহন নেমে এলে তাদের ঠিক-ঠিক রাস্তায় চালিয়ে দেওয়ার ভারও এর হাতে—আমার মেন সুইচ বলতে পারেন একে।

গলা
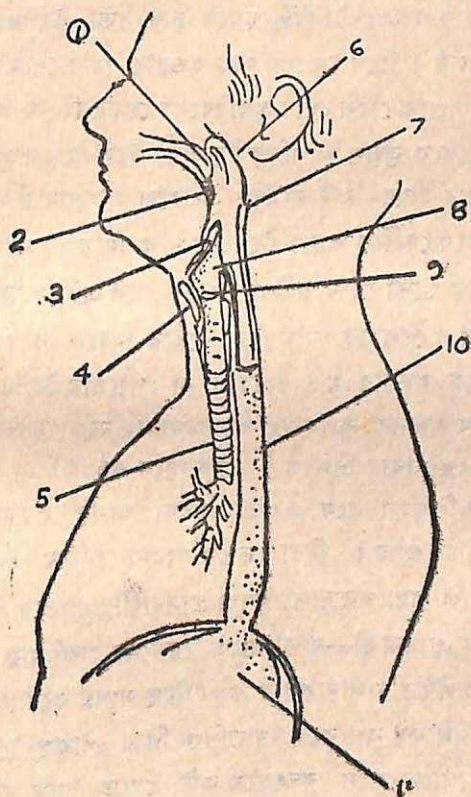
১। আল্‌জিব; ২। টনসিলস্‌; ৩। অধিজিহ্বা; ৪। কণ্ঠমণি; ৫। শ্বাসনালী; ৬। গলরসগ্রন্থি; ৭। গলবিল (ফ্যারিংক্স); ৮। স্বরযন্ত্র; ৯। ভোক্যাল কর্ড্‌স্‌; ১০। গ্রাসনালী;

দেখতে আহামরি অবশ্য নয়, গড়নটা মোটামুটি ব্যাটের মত ; পৌনে দু'ইঞ্চি লম্বা ; ন'টা কার্টিলেজ (তরুণাস্থি) অতি সূক্ষ্মভাবে নিজেদেরকে সাজিয়ে নিয়েছে এর মধ্যে ; মিউকাস মেমব্র্যান অর্থাৎ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দিয়ে মোড়া এবং লিগামেন্ট অর্থাৎ সন্ধি বন্ধনী দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে ন'জনকে একজায়গায় বাঁধা—সব মিলিয়ে ল্যারিংক্স অর্থাৎ স্বরযন্ত্র। এর কিছুটা অংশ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে উপেনের ঘাড়ে কণ্ঠা হিসেবে। এর পর নামছে দুটো নল : গ্রাসনালী গিয়েছে—পাকস্থলী পর্যন্ত, শ্বাসনালী গিয়েছে ফুসফুস পর্যন্ত—দুটোরই ব্যাস প্রায় এক ইঞ্চি।

আমার কাজ করার ধরনটা যদি দেখতে চান তো উপেনকে এক মুখ খাবার গিলতে বলুন। চিবোনো-পর্ব সাঙ্গ হওয়ার পর উপেনের জিভ কায়দা করে চর্বিত খাদ্যপিণ্ডকে ঠেলে দেবে মুখবিবরের পেছন দিকে। লাল আঙুলের মত দেখতে ছাদ থেকে ঝুলন্ত আলজিব টক্ করে উঠে পড়ে তক্ষুনি বন্ধ করে দেয় নাকে যাওয়ার রাস্তা—যদি না দিত তাহলে এক চামচে মাংসের ঝোল দেখতেন সুরুৎ করে বেরিয়ে আসত উপেনের নাক দিয়ে। তারপরেই পেছন দিক থেকে জিভের গুঁতো খেয়ে গুটিগুটি নিচের পথে এগিয়ে যাবে খাদ্যপিণ্ড।

প্রতিবার খাবার গেলবার সময়ে বিষম খেয়ে 'কাফে করোনারী' ঘটিয়ে যাতে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার মত অবস্থায় না পৌঁছোয় উপেন, তা নিবারণ করার জন্য বিশেষ ধরনের কলকব্জা আছে আমার মধ্যে। উপেনকে বলুন কণ্ঠায় আঙুল রেখে খাবার গিলতে। টের পাবে কণ্ঠা উঠছে ওপর দিকে। এর মানেই হল অধিজিহ্বা নামে একটা পাতলা ভাল্‌ভ্‌ হুকুম পেয়ে চেপে বসেছে শ্বাসনালীর ওপর। নিরাপদে সে জায়গা পেরিয়ে এল খাদ্যপিণ্ড—ঢুকে পড়ল দশ ইঞ্চি লম্বা খাদ্যনালী অথবা গ্রাসনালীর ভেতরে। প্রচুর পেশীর সমন্বয়ে গঠিত এই গ্রাসনালী—খাদ্যপিণ্ডকে ঢেউয়ের ভঙ্গিমায় ঠেলার পর ঠেলা মেরে পাকস্থলীতে চালান করার গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করে।

কপ করে গিললেই ঝপ করে খাদ্যপিণ্ড গিয়ে পাকস্থলীতে পড়ে না—সরাসরি খাবার পৌঁছে গেলে বদহজমে কষ্ট পেতে পারে উপেন। সেই কারণেই উপেন যখন খেতে থাকে, আমি একটু একটু করে খাবার ডেলিভারী দিতে থাকি পাকস্থলীতে এমন কায়দায় যাতে একসঙ্গে একগাদা কাজ নিয়ে হজমের ব্যাপারে হাঁসফাঁস করতে না পারে পাকস্থলী। কায়দাটা এই : গ্রাসনালী যেখানে পাকস্থলীতে গিয়ে মিশেছে, ঠিক সেইখানে ভাল্‌ভ্‌-য়ের মত

ছোট্ট এক টুকরো পেশী আছে। এই দরজা খুলেই অল্প পরিমাণে খাবার চালান দেয় পাকস্থলীকে সহজেই যাতে খাবারটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারে সে। উপেন যদি গপাগপ গিলতে থাকে, খাদ্য স্তূপীকৃত হয়ে যাওয়ার ফলে সাময়িকভাবে ওর মনে হবে দমসম খাওয়া হয়ে গেছে—সাধু ভাষায় আকণ্ঠ গেলা হয়ে গেল বুঝি। অস্বস্তি হয় উপেনের। কখনো সখনো গ্রাসনালী আর পাকস্থলীর মাঝের ভাল্‌ভ্‌ বিগড়ে যায়, পাকস্থলীর অ্যাসিড ওপরে উঠে এসে গ্রাসনালীর সূক্ষ্ম শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীকে আক্রমণ করে। তখন কিন্তু সত্যিই কষ্ট পায় বেচারা উপেন। কিন্তু দিনরাতে কয়েকশ বার খাবার আর জল খেলেও মুখের লালা চুঁয়ে চুঁয়ে গ্রাসনালী দিয়ে নেমে গেলেও কোন সমস্যা দেখা যাবে না।

স্বর সৃষ্টি করি কি করে জানতে চাইছেন? উপেনের ধারণা ফুসফুস থেকে বাতাস বেরিয়ে আসার সময়ে বেহালার তারের মত আমার ভোক্যাল কর্ডকে কাঁপিয়ে স্বর সৃষ্টি হয়। আসলে ভোক্যাল কর্ডগুলো দেখতে চকচকে সাদাটে ঠোঁটের মত। শিষ দেওয়ার সময়ে যে ভাবে ঠোঁট নড়ে, স্বর-গ্রাম ওঠানামার সময়েও ঠিক সেই ভাবে খোলে আর বন্ধ হয় সাদাটে চকচকে এই ঠোঁটগুলো। এদেরকে তাই ভোক্যাল কর্ড অর্থাৎ স্বরের দড়ি না বলে বলা উচিত স্বরের 'ভাঁজ'। 'ভাঁজ' বললে ব্যাপারটা অনেকটা স্পষ্ট হয়—বেহালার তারের মত যে নয়, এই তফাৎটা বোঝা যায়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পেশী ব্যবস্থার দৌলতে গুরুগম্ভীর শব্দ সৃষ্টি করার সময়ে ভাঁজগুলো পুরোপুরি খুলে যায়—আবার সঙ্কীর্ণ সরু হয়ে যায় তীক্ষ্ণ উচ্চ-গ্রামের শব্দলহরী সৃষ্টির সময়ে। খাবার গেলার সময়ে এরা এঁটে বন্ধ হয়ে যায়—তাই খাবার গিলতে গিলতে কথা বলতে পারে না উপেন।

যদি কোনো কারণে আমার এই স্বরের ভাঁজেরা ঠিকমত বন্ধ হতে না পারে, তাহলেই ঘটে স্বরবিকৃতি। বিবিধ কারণে তা হতে পারে। যেমন, টিউমার, পলিপ (টিউমার জাতীয়—ক্যানসারগ্রস্ত সাধারণতঃ হয় না—পরে হতে পারে), সিস্ট (তরল বা আধা-কঠিন উপাদান ভর্তি ফোস্কার মত শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর একটা পিণ্ড) অথবা প্রদাহ। ফুটবল মাঠে গিয়ে তারস্বরে একনাগাড়ে চেঁচিয়ে যাওয়ার ফলে আমার স্বর-ভাঁজেরা ক্লান্ত হয়—প্রদাহ-গ্রস্ত হয়। একই কাণ্ড ঘটে নির্বাচনের সময়ে ভোটপ্রার্থী রাজনীতিবিদদের—অজস্র মিটিংয়ে বকে বকে স্বর-ভাঁজের প্রদাহে ভোগে—সাদাকথায় বলা

হয়, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙেছে। গাইয়েরা বেশী ফাংসনে গাইতে গেলেও স্বর ভাঁজেরা ক্লান্ত হয়—প্রদাহে ভোগে—গলা ভেঙে যায়। এ ছাড়াও উপেনের আত্যন্তিক আবেগেও সাড়া দেয় আমার স্বর-ভাঁজেরা। রেগে তিনটে হ'লে অথবা ভয়ে কাঠ হলে উপেনের গলায় আওয়াজ ফোটে না স্বর-ভাঁজরা পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে যায় বলে।

একদিক দিয়ে বলতে পারেন স্বরযন্ত্র থেকে ঠোঁট পর্যন্ত সাতইঞ্চি লম্বা স্বরপথটা ছোটখাট একটা পাইপ অর্গানের সামিল। প্রায় সেই ভাবেই বেজে চলেছে উপেন কথা বললেই। গলার বাজনার ওঠানামা নির্ভর করে ফুসফুস থেকে তেড়েমেড়ে হাওয়াটা বেরিয়ে এসে স্বর-ভাঁজের কিনারায় অবস্থিত শক্ত, তন্তুময়, কম্পমান ফিতেগুলোকে কতখানি টেনে বাড়াতে পারছে তার ওপর। গজগজ করতে করতে হঠাৎ যদি আর্ত চীৎকার করে ওঠে উপেন, প্রায় সিকি ইঞ্চি পর্যন্ত বেড়ে যায় শক্ত তন্তুময় এই ফিতে-গুলো। যারা যাত্রা-থিয়েটারে গলা ফাটিয়ে গান গেয়ে অভ্যস্ত, তাদের বাড়ে প্রায় আধইঞ্চি পর্যন্ত। শব্দটা কিন্তু নিখাদ নয়—কাঁচা—আংশিকভাবে পরিশ্রুত হয়ে বাক্যের রূপ নেয়। খসড়া বাক্য বলতে পারেন। একে মেজে ঘসে ছিমছাম করে আপনার কানে পৌঁছে দেওয়ার বাকী কাজের দায়িত্ব উপেনের ঠোঁট, জিভ, নাসিকাপথ এবং তালুর ওপর।

আমার যন্ত্রপাতির আর একটা অংশের খবর আপনাকে বলা দরকার—টনসিল এর নাম। এ রকম লসিকা-গ্রন্থি আমার সবশুদ্ধ চারজন আছে। আর একটা আছে উপেনের নাসিকা-পথে—তার নাম গলরস-গ্রন্থি (অ্যাডেনয়েড)। ফোসিয়াল টনসিল জোড়াকে দেখা যায় গলার প্রবেশ পথে। হামেশা কেটে বাদ দেওয়া হয় এদেরকেই। লিন্‌গুয়াল টনসিল জোড়া থাকে আরো নিচে—সাধারণতঃ আকারে এরা সবুজ কড়াইশুঁটি দানার মত—কিন্তু বৃহদাকার ধারণ করাও ক্ষমতাও রাখে)।

পুংজননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগের বাড়তি চামড়া বাদ দেওয়ার অস্ত্রোপচার যেমন হরবখৎ ঘটছে, ঠিক তারপরেই আকছার টনসিল বাদ দেওয়ার অস্ত্রোপচারটাও যেন একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে। এককালে ডাক্তারদের ধারণা ছিল, বিবর্তনের বহু ধাপ পেরিয়ে আসার পর বুঝি টনসিল জিনিসটা একটা নেহাতই অদরকারী দেহাংশ হিসেবে খরচের খাতায় জমা পড়েছে—সুতরাং তাকে কেটে বাদ দিলেও ক্ষতি কিছু নেই।

ইদানীং কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে টনসিল বাদ দেওয়ার পর শ্বাসপথের ওপর দিকে যন্ত্রটায় যত দুর্ভোগ দেখা যায়, বাদ না দিলে ততটা দেখা যায় না। এই থেকেই ডাক্তাররা মোটামুটি একমত হয়েছেন যে টনসিল ফুললেই যে তাকে অস্ত্রোপচার করে বাদ দিতে হবে—এটা ঠিক নয়। অর্থাৎ টনসিল বৃদ্ধি পাওয়াটা সবসময়ে ছুরিকাঁচির আওতায় আসছে না।

আমি কিন্তু বরাবরই জানি টনসিল আমার মিত্র, শত্রু নয়। ওদের খাঁজ খুপরির মধ্যে হানাদার জীবাণুদের ওরা বন্দী করে ডাক দেয় রক্তের ফ্যাগোসাইটদের। ফ্যাগোসাইট হল রক্তের সংগঠক সেই সব কোষ বহিরাগত জীবাণুদের যারা ধ্বংস করে (রক্তের শ্বেত-কণিকা কোষ)। 'ফ্যাগো' মানে ভক্ষণ বা ধ্বংসকারী। ফ্যাগোসাইটরা এসেই ঝাঁপিয়ে পড়ে হানাদারদের ওপর এবং ভক্ষণ করে নেয় কপাকপ করে—মাকড়শার জালে মাছি আটকে গেলে মাকড়শা মহাপ্রভু মাছিকে দিয়ে জলযোগ সারেন—অনেকটা সেইরকম ভাবে। টনসিলেরা সংক্রামিত হয়ে প্রদাহগ্রস্ত হলেই ফুলে বেড়ে ওঠে; তখন বুঝতে হবে আক্রমণ জোরদার হয়েছে শত্রুবাহিনীর এবং বোধকরি হেরেও যাচ্ছে মিত্রপক্ষ। কাজেই সেবাশুশ্রূষা করে মহাবীর এই অভিভাবকদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনাই সঙ্গত—কেটে বাদ দেওয়ার চেয়ে।

আমার ঝামেলার কি শেষ আছে। গলার গণ্ডগোল নিয়েই তো বেশী রুগী আসে ডাক্তারের কাছে। বাতাস আর খাবারের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক আর ভাইরাসরা আক্রমণ হেনে চলেছে আমার ওপর। আমার টনসিল এদের ধ্বংস করার চেষ্টা করে, যে শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর আবরণ আমার সমস্ত পথ আগাগোড়া ঢেকে রেখেছে, তারাও এদের ফাঁদে ফেলে আটকে রাখে—তারপর ঝেঁটিয়ে বিদায় দেয়। এ-লড়াইয়ের বিরাম নেই এক লহমার জন্যেও। কখনো সখনো হানাদাররা লড়াইয়ে জিতে গেলেই উপেনের গলক্ষত দেখা যায়।

আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হল আমার ল্যারিংক্স। ডজনখানেক উৎপাতে বিপর্যস্ত হয়ে, কাহিল হয়ে, শেষ পর্যন্ত ল্যারিনজাইটিস বাঁধিয়ে বসে ল্যারিংক্স বেচারা—অর্থাৎ প্রদাহে ভোগে। এই ডজনখানেক উৎপাতের মধ্যে আছে মোটর গাড়ীর পোড়া পেট্রল বা ডিজেলের অনিষ্টকারী ধোঁয়া, সিগারেটের ধোঁয়া, চিমনীর ধোঁয়া। প্রদাহ দেখা দিলেই উপেনের গলা ভেঙ্গে যায়, ফিসফিসানি শব্দ বেরোয় গলা দিয়ে অথবা কোনো শব্দই আর বেরোয় না।

গলার অষ্টপ্রহরের রক্ষক হল কাশি—উপেনের যে-কটা রিফ্লেক্স অর্থাৎ প্রতিবর্তী ক্রিয়া আছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে যারা গুরুত্বপূর্ণ, তাদের একজন এই কাশি। কোনো উৎপাত যদি আমাকে খোঁচাতে থাকে, তা সে সিগারেটের ধোঁয়া হতে পারে, শ্লেষ্মা হতে পারে, 'বিপথগামী' খাবার বা জল হতে পারে—তাদের খপ্পর থেকে আমাকে আগলে রাখার জন্যেই কাশি নামক এই নিরন্তর প্রতিবর্তী ক্রিয়াটি উপেন পেয়েছে জন্ম থেকেই। উৎপাত যেই হোক না কেন, আমি খানিকটা বাতাসকে ফাঁদে ধরে তারপর সেই বাতাসকে ঘন্টায় দু-শ মাইল বেগে দমকা ঠেলা দিয়ে বার করে দিই—সেই সঙ্গে বাইরের উৎপাতকে। এরই নাম কাশির ধমক।

ক্যানসারের বড় প্রিয় লক্ষ্যবস্তু আমার ল্যারিংক্স। সৌভাগ্যক্রমে, এই ক্যানসার ছড়ায় খুব আস্তে আস্তে এবং যে-সব ক্যানসারদের খুব সহজে ধরে ফেলে কোবাল্ট চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচার করে ঝটপট সারিয়ে ফেলা যায়—ল্যারিংক্সের ক্যানসার তাদের অন্যতম। তা সত্ত্বেও বলব, একটানা হপ্তা দুয়েক যদি গলা ভেঙে থাকে উপেনের, তাহলে যেন ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়।

ক্যানসার যদি বেড়ে যায়, তাহলে কিন্তু ল্যারিংক্সকে কেটে বাদ দেওয়া দেওয়া ছাড়া পথ থাকে না। উপেনের ক্ষেত্রে এই কাণ্ড যদি ঘটে:কখনো, তাহলে তাকে নতুন করে কথা বলার কায়দা শিখতে হবে। বাতাস গিলে ভর্তি করবে আমার গ্রাসনালীকে, তারপর ছাড়াবে নিয়ন্ত্রত ঢেকুর তোলার ভঙ্গিমায়। হাওয়ার এই স্তম্ভকে মোটামুটি একটা কথা বলার নকল চেহারা এনে দেবে জিভ, ঠোঁট, দাঁত আর ফ্যারিংক্স (গলবিল)। অথবা, ইচ্ছে করলে ইলেকট্রনিক ল্যারিংক্স বসিয়ে নিতে পারে উপেন। ব্যাপারটা ভাবতে যেমন ভাল লাগছে না মোটেই—ঠিক তেমনি এমনটা ঘটবার সম্ভাবনাটাও সুদূর পরাহত বলে মনে করলেই তো ল্যাটা চুকে যায়।

এত জটিল হয়েও আমি নাকি বাগানে-জল দেওয়ার মত হোস পাইপ ছাড়া আর কিছু নই—জটিলতা নিয়েও এত নিখুঁত ভাবে কর্তব্য করে চলি যে উপেনকে বিব্রত হতে হয় না বললেই চলে—তাই টেরও পায় না যে আমি আছি...আমি আছি...আমি আছি!

পাকস্থলী

উপেনের দেহমন্দিরে বিস্তর দেহযন্ত্র রয়েছে। কিন্তু আমাকে নিয়ে ওর যতটা দুর্ভাবনা, ততটা আর কাউকে নিয়ে নয়। ওর ধারণা, আমি নাকি ভয়ংকর গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, আমি ওকে একটা সুবিধে জুগিয়ে যাই কেবল—তার বেশী নয়। নিছক একটা খাবারের চৌবাচ্চা বলতে পারেন—রিজার্ভার। আমি আছি বলেই দিনে তিনবার গেণ্ডেমুণ্ডে খেলেই কাজ চলে যায় উপেনের। আমি না থাকলে দিনে ছ'বার খেতে হত। বুঝতেই পারছেন আমি কে। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি শ্রীউপেনের পাকস্থলী।

আর যদি বলেন হজমটা তাহলে করাচ্ছে কে, আমি বলব সে ব্যাপারের সত্যিকারের বীরপুরুষ হল গিয়ে ওর ক্ষুদ্রান্ত্র। আমার কাজ প্রোটিনের ওপর। প্রোটিনকে ভেঙেচুরে পলিপেপটাইড বানিয়ে দিই (পলিপেপটাইড হল দীর্ঘ শৃঙ্খলে আবদ্ধ অনেকগুলো প্রোটিন)। এক্ষেত্রে কিন্তু আসল কাজটা করতে হয় অন্ত্রকে। শর্করা, স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং অন্যান্য খাবারের গতিও হয় সেখানেই।

চেহারার দিক দিয়ে আমাকে দেখলে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে না। বাইরের দিকে রঙটা আমার মসৃণ চকচকে গোলাপী রঙের। ভেতর দিকে আমার চেহারাটা চকচকে মখমলের মত। উদরের খোলে তলার পাঁজরায় লাগোয়া অবস্থায় এবং খালি অবস্থায় যখন আমি ঝুলি, তখন আমাকে দেখে মনে হয় যেন একটা চুপসোনো বেলুন। ভর্তি অবস্থায় কাৎ হয়ে পড়ি আড়াআড়িভাবে দেহের মধ্যে ; ইংরেজি J অক্ষরের মত দেখতে লাগে আমাকে—মাথা মোটা, তলা সরু। দুই থেকে তিন পাঁইটের মত জিনিসপত্র ধরাতে পারি আমার মধ্যে।

উপেন কখনো আমাকে মনে করে ভয়ংকর গুরুত্বপূর্ণ, আবার কখনো আমোলই দিতে চায় না। অথচ আমাকে অনেক কিছুই করতে হয়—ওর জন্যেই করতে হয়—যাতে ওর জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটে। আমার ভেতরকার আস্তরণে প্রায় সাড়ে তিন কোটি গ্ল্যাণ্ড আছে। প্রতিদিন তা থেকে চার থেকে পাঁচ পাঁইট পর্যন্ত পাচকরস ক্ষরিত হতে পারে—বেশীর ভাগটাই

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। আমার আস্তরণ থেকে ক্ষরিত হয় আরও একটা জিনিস—এনজাইম পেপসিন। অ্যাসিডের কৃপায় সক্রিয় হয়ে ওঠে এই পেপসিন—শুরু হয় প্রোটিন হজম প্রক্রিয়া। পেপসিন না থাকলে মজাসে মাংস খাওয়াটা বেড়িয়ে যেত উপেনের—হজম করতে পারত কি? অন্যান্য এনজাইমরাও ক্ষরিত হয় আমার গ্ল্যাণ্ড থেকে। যেমন ধরুন, একটার কাজ হচ্ছে দুধ কাটিয়ে সহজ পাচ্য দই আর ছানার জলে রূপান্তরিত করা।

প্রত্যেকেরই ধারনা আমি নাকি একটা ভীষণ রকমের মন্থন পাত্র। উপেন যাই গিলুক না কেন—তার প্রতিটিকে নিয়ে দলাইমলাই করে তার বারোটা বাজিয়ে ছাড়ি। মোটেই তা নয়। উপেন যখন খেতে বসে, খাবার জমা হতে থাকে এক-এক স্তরে: প্রথমে বড়ির সুক্তো; তারপর ডাল ভাত আর ভাজা মাছ; তারপর মাছের ঝোল; সবশেষে দই। প্রথমেই আমার কাজ শুরু হয় বড়ির সুক্তো দিয়ে—গায়ে লেগে যায় বলে। ওপর থেকে নিচের দিকে আমার পেশী সংকোচন আরম্ভ হয় তরঙ্গাকারে—ভাল করে মিশিয়ে দেয় পাচকরসের সঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ একটা পুরু মণ্ড বানানো হয়ে যায়। একটু একটু করে গ্রহণীতে যাওয়ার প্রবেশদ্বার পাইলোরিক ভালভের দিকে নামিয়ে দিই মণ্ডটাকে—লম্বায় এক ফুট এই গ্রহণী ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ। ইংরেজিতে এর নাম ডুয়োডেনাম।

জায়গাটা অতীব বিপজ্জনক। পাচকরস একটু বেশী পরিমাণে গ্রহণীর মধ্যে গিয়ে পড়লে আর রক্ষে নেই—দেওয়াল কুরে কুরে খাবে। এই কারণেই আলসার অর্থাৎ ক্ষত জিনিসটা সবচেয়ে বেশী দেখা যায় এইখানেই। তবে কি জানেন, উপেনের কপাল ভাল তাই ধাঁই করে সমস্ত খাবারটা একেবারেই গিয়ে পড়ে না গ্রহণীতে—একটু একটু করে যায় পাইলোরিক ভালভের মধ্যে দিয়ে—এ-ভালভের কাজই তাই। এমনভাবে মণ্ড চালান করে অল্প মাত্রায় যে গ্রহণীর স্বাভাবিক ক্ষার দিয়ে অ্যাসিডের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেওয়া যায় অনায়াসেই।

আলুর মণ্ডকে কায়দা করতে আমার সময় লাগে মাত্র কয়েক মিনিট। মাংসতে লাগে বেশী সময়—তার চাইতেও বেশী লাগে পাতাওলা সব্জী হজম করতে। কতক্ষণ? অনেক হেরফের আছে সময়ের মধ্যে এবং এর বেশীর ভাগটাই নির্ভর করে উপেনের মেজাজের ওপর। ওপরে যে খাবারের বর্ণনা দিলাম, তাতে গড়ে সময় লাগে চার ঘন্টা। কিন্তু এর সঙ্গে যদি শাক
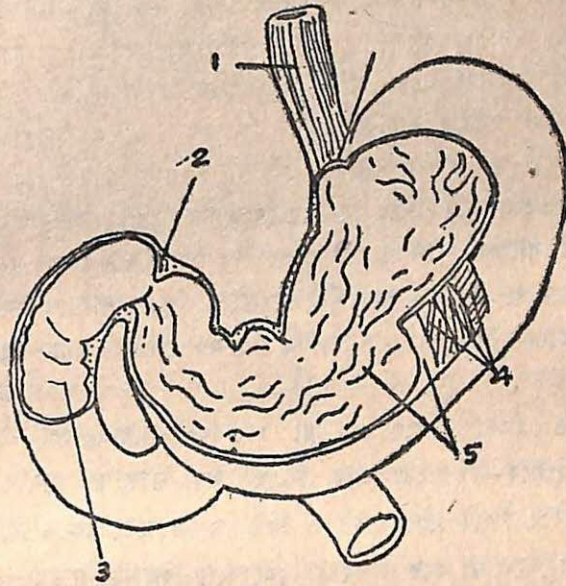
পাকস্থলী

১। গ্রাসনালী ; ২। পাইলোরিক স্ফিংক্‌টার (পাকস্থলী থেকে গ্রহণীতে যাওয়ার গোলাকার পেশীদ্বার) ; ৩। ক্ষুদ্রান্ত্রের গ্রহণী অংশ ; ৪। পাকস্থলীর পেশীময় আস্তরণ ; ৫। মিউকোসা (শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী) ; ৬। কারডিয়াক স্ফিংকটার (হৃদযন্ত্রীয় পেশী-দ্বার)

মিশোনো হয়, তাহলে চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত লেগে যেতে পারে।

বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করে চর্বিযুক্ত খাদ্য। ধরুন, সকাল সাতটায় জল খাবার খেতে বসে খেল:মাখনে ভাজা ডিম, পুরু করে:মাখন মাখানো টোস্ট আর শূওরের দাবনা ভাজা। এই যে কাঁড়ি কাঁড়ি চর্বি গিয়ে ঢুকল আমার মধ্যে, এর ফলেই গ্রহণী বেচারাকে আত্মরক্ষার জন্যেই সম্ভবতঃ এমন একটা হরমোন ক্ষরণ করতে হয় যার ফলে আমার পেশীদের সঙ্কোচন প্রসারণ ঝিমিয়ে পড়ে খুব বেশী মাত্রায়, বেচারা গ্রহণার আর দোষ কি বলুন। আচমকা এতটা চর্বি নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাবে যে! পরিণামটা হয় এই : দুপুরবেলা মাছের ঝোল আর ডাল ভাত দই খেতে বসে তেমন চনমনে ক্ষিদে অনুভব করে না উপেন—সকালের খাবারের সিকিখানাই যে তখনো রয়েছে আমার মধ্যে—নাকানিচোবানি খাচ্ছি স্তিমিত পেশীদের গ্লো-স্লো স্ট্রাইকের ফলে।

আরও একটা কারণে গো-স্লো কাণ্ড ঘটে আমার মধ্যে—ঝিমিয়ে যাই চক্ষের নিমেষে—জিনিসটা আর কিছুই নয়—ঠাণ্ডা। আমার স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৯ ডিগ্রী ফারেনহিট। কিন্তু লোভে পড়ে এক ডাঁই বরফ-ঠাণ্ডা আইসক্রীম খেলে ঝাঁ করে তাপমাত্রা নেমে যায় বিশ ডিগ্রীতে। --এমন ঠাণ্ডা মেরে যাই যে পুরোপুরি ধর্মঘট করে বসে আমার কলকারখানা—থেমে থাকে আধঘন্টার মত। একটু একটু করে গরম হয়ে উঠলে তবে রক্ষে। তবে এতে ক্ষতি কিস্‌সু নেই। ধড়ফড় করার মত অবস্থায় তো নেই আমি। ধীরে সুস্থে ঢিমে তালে চললেই বরং ভাল্ থাকি।

সত্যি কথাটা তাহলে বলি শুনুন। আমি একটু আলসে জীবনযাপনেই অভ্যস্ত। গা এলিয়ে দিয়ে কাটিয়ে দিই অষ্টপ্রহর। উপেনের অন্যান্য দেহ-যন্ত্ররা, যেমন যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, বৃক্ক (কিডনি) খেটে মরে চব্বিশ ঘন্টা—আমি কিন্তু মোটামুটি স্বাভাবিক রাতের খাওয়াকে বাগে এনে ফেলি উপেন শুতে যাওয়ার আগেই। কাজেই উপেনের নিদ্রাকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাকর্ষণ ঘটে আমারও। আচ্ছা, নিশ্চয় একটা প্রশ্ন জাগছে আপনার মনে। এত প্রোটিন যখন হজম করানো আমার কাজ, আমি নিজেই নিজেকে হজম করে ফেলি না কেন ? (নাড়ীভূঁড়িকে আমি বাগে রাখি ভাল ভাবেই —যেমন গরুর পাকস্থলী)। নিজেই নিজেকে হজম না করে ফেলার এক-মাত্র কারণ হল এই যে রক্ষাকারী শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দিয়ে আমার সূক্ষ্ম আস্তরণ

এমন ভাবে ঢাকা থাকে যে নিজেই নিজেকে হজম করতে পারি না। রক্ষাকারী এই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীটাকে চেঁচে তুলে দিলেই দেখবেন আমি নিজেই নিজেকে খেতে আরম্ভ করে দিয়েছি।

আমার আরও একটা গুণপনা আছে: দর্পণে যেমন মুখের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, ঠিক তেমনি উপেনের মন মেজাজ প্রতিফলিত হয় আমার ওপর দিয়ে। রেগে মুখ লাল করলে আমিও লাল হয়ে যাই সঙ্গে সঙ্গে। ভয়ে ফ্যাকাশে মেরে গেলে ফ্যাকাশে হয়ে যাই আমিও। ফুটবল মাঠে গিয়ে দারুণ উত্তেজিত হলে আমার উত্তেজনাও যায় বেড়ে—ভয়ানক ভাবে সংকোচন প্রসারণ শুরু করি—তিনগুণ বাড়িয়ে দিই পাচক রস-ক্ষরণ। আবার গরম গরম ধোঁয়া ওঠা বিরিয়ানি অথবা প্লেটভর্তি চাইনিজ খাদ্য দেখে এবং শুঁকে উপেনের জিভে যখন জল এসে যায়—তখন আমারও নাচানাচি বেড়ে যায় সমান তালে। এই নাচানাচি বা ভয়াবহ সংকোচন-কেই উপেন নাম দিয়েছে ক্ষিদের জ্বালা।

উপেন মুষড়ে পড়লে তার ভাগও নিই আমি। পেশী তরঙ্গ থেমে যায় আমার মধ্যে—সেইসঙ্গে স্তব্ধ হয় পাচক রস-ক্ষরণ। অভ্যেস বশতঃ অবশ্য খেয়ে যায় উপেন। কিন্তু যা খায়, তা গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে আমার মধ্যে—ফলে পেট ফাঁপে, অস্বস্তি হয়। এই সব সময়ে উপেনের উচিত খাওয়া জিনিসটাকে একেবারেই বাদ দেওয়া। না খেলেই মঙ্গল তখন।

উৎকণ্ঠা উদ্বেগের সময়ে দেখা যায় নতুন সমস্যা: অ্যাসিড উৎপাদন বাড়িয়ে দেয় হু-হু করে, মাঝে মাঝে অ্যাসিডের পরিমাণ এত বেড়ে যায় যে আলসার অর্থাৎ ক্ষত পর্যন্ত হতে পারে পাকস্থলীতে। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা অথবা প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে পড়লেই উপেন যেন খাওয়ার অভ্যেসটাকে একটু পালটে নেয়। বেশ কয়েকবার অল্প পরিমাণে হাল্কা খাওয়া খেলেই নিয়ন্ত্রিত হবে বাড়তি অ্যাসিড। প্রকৃত পক্ষে উপেনের নিজেরও একসময়ে ছোটখাট আলসার হয়েছিল—কিন্তু উপেন নিজেই তা জানে না আজও। এরকম ঘটনা অনেকের ক্ষেত্রেই ঘটে। ছাত্রাবস্থায় পড়াশুনা নিয়ে দিনরাত উদ্বেগের মধ্যে থাকত উপেন। ফলে বেড়ে গিয়েছিল আমার অ্যাসিড উৎ-পাদন—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর গায়ে ছোট একটা ছিদ্রপথেরও সৃষ্টি করেছিল দুরন্ত অ্যাসিড। যন্ত্রণার মোচড়ও অনুভব করেছিল উপেন—ভেবেছিল খাওয়া দাওয়ার গণ্ডগোলের জন্যেই বুঝি হচ্ছে এমনটা। কিন্তু পরীক্ষা শেষ

পাকস্থলী

হতেই শান্ত হয়ে এল উপেন, কমে এল বাড়তি অ্যাসিড উৎপাদন। আমিও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ফুটো মেরামত করে নিলাম বাড়তি মিউকাস (শ্লেষ্মা) ঢেলে।

আলসার আর ক্যানসার ছাড়া গুরুতর কোনো ব্যায়রাম আমার হয় না। মাছের কাঁটায় যে আঁচড় লাগে, তা সারিয়ে নিই ২৪ ঘন্টার মধ্যে; কিন্তু সেই একই আঁচড় যদি চামড়ায় লাগে, সারতে সময় লাগতে পারে সাতদিন। জীবাণু সংক্রমণ ঘটেছে এমনি একটা মাংসের টুকরো নিয়ে পরিশ্রুত জলে (ডিসটিলড্ ওয়াটারে) রেখে দেখুন—পরমানন্দে বংশবৃদ্ধি করে চলবে জীবাণুরা। কিন্তু সেই একই মাংসের টুকরোকে রাখুন আমার পাচক-রসের মধ্যে—ধ্বংস হয়ে বেশীর ভাগ জীবাণু।

কয়েক জাতের জীবাণু কিন্তু আমার পাচক-রসেও ধ্বংস হয় না—পাচক-মারণ-ক্রিয়া তাদের সয়ে গেছে। উপেনের আসল দুর্ভাবনা এদের নিয়েই। যে-সব দেশে স্বাস্থ্যবিধির কেউ তোয়াক্কা রাখে না, জল অপরিষ্কার, খাবারে মাছি বসে এবং নোংরার ছড়াছড়ি—দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে সেই সব দেশে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে যেন সজাগ থাকে উপেন। কয়েকটা বিষয় আমাকে বড় জ্বালাতন করে—বিশেষ করে মরিচ; সর্ষে আর ঘোড়া-মুলোও কিছুটা বটে। এরা আমার আস্তরণ স্পর্শ করলেই সঙ্গে সঙ্গে আমি আগুন-রাঙা হয়ে ফুলে উঠি। কফি, নিকোটিন আর অ্যালকোহলে বেড়ে যায় আমার অ্যাসিড উৎপাদন—দু-পেগ মার্টিনি গিললেই ডবল হয়ে যায় ক্ষরণ। এই কারণেই আলসার যাদের হয়েছে, সেই সব রুগীদের মদ, সিগারেট, কফি খাওয়া বারণ। আমি অবিশ্যি উপেনকে বলব না এদের একেবারেই জীবন থেকে ছেঁটে বাদ দিতে। তবে মদ্যপান এবং ধূমপান—এই দুটি অভ্যেস যদি পরিমিত মাত্রায় চালিয়ে যেতে পারে, তাহলে আমার জীবনটা অনেক মধুর হয়ে উঠতে পারে। কফি খাওয়াটা যদি একান্তই প্রয়োজন বলে মনে করে, তাহলে যেন ক্রীম মিশিয়ে প্রতিক্রিয়াকে রোধ করে নেয়।

ওষুধের কথা বলছেন? আরে মশাই, আমি চাই আর না চাই, টপাটপ ওষুধ গিলতে উপেন এত ভালবাসে যে কি আর বলব। ওষুধের খুব একটা দরকার হয় না আমার। আসলে প্রায় সব ওষুধই আমাকে জ্বালিয়ে মারে। অ্যাস-পিরিন এসে পড়লে পিনের খোঁচায় ফুটো হয়ে যাওয়ার মত ছোট ক্ষত মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ হতে পারে। কিন্তু তাতে গুরুতর ক্ষতি নাও হতে

পারে—যদি অ্যাসপিরিন গোলাটা অথবা ক্ষতসৃষ্টির কারণটার ঘন ঘন পুনরাবৃত্তি না ঘটতে থাকে।

পেটে অম্বল হলেই 'সোডা' খাওয়ার একটা বাতিক আছে উপেনের। কিন্তু করজোড়ে নিবেদন, মাত্রা ছাড়িয়ে যেন না যায় উপেন। কেন না, রক্তপ্রবাহে খুব দ্রুত শোষিত হয় ক্ষার। বেশী সোডা খেলে রক্তপ্রবাহে ক্ষারের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে—ডাক্তারী ভাষায় যার নাম অ্যালক্যালোসিস অর্থাৎ রক্তে অম্ল বৃদ্ধির চেয়ে যে অবস্থা অনেক বেশী ভয়াবহ—তখন কিন্তু বৃক্ক অর্থাৎ কিডনীর ওপর ভয়ংকর রকমের চাপ পড়তে থাকে।

যে-সব দোষে আমি দোষী নই, সে-সব অপরাধেও আমাকে অপরাধী বানিয়ে ছাড়ে উপেন। যেমন ধরুন, হামেশাই পেট গুরগুর করে ওঠা; আশপাশে কেউ থাকলে পেট-ডাকার আওয়াজে চমকে ওঠে মুখ টিপে হাসে, উপেন বেচারীকে লজ্জায় ফেলে। উপেন গাল দেয় আমাকে—পেট কেন ডাকছিস রে? আসলে কিন্তু গুরগুর আওয়াজটা হচ্ছে অন্ত্রের মধ্যে। গ্যাসউৎপাদন ওদের মধ্যে যে-ভাবে হয়, সে-ভাবে আমার মধ্যে হয় না। গ্যাসের কারখানা বলতে পাবেন ঐ অন্ত্রদের। উপেন যদি অবিবেচকের মত গাণ্ডেপিণ্ডে গিলতে থাকে অথবা নিজেই একটা মদের পিপে হওয়ার বাসনা করে, তাহলে খুব সোজা পন্থায় আমার বাড়ী আমি সাফ করে নিই; বমি করে ভাসিয়ে দিই। কিন্তু অদ্ভুত যা তা হ'ল এই : মদ বা খাবারের পিণ্ডি-রূপী উৎপাতটাকে ঘাড় ধরে বাড়ী থেকে বার করে দেওয়ার হুকুমটা আমার মধ্যে থেকে আসে না—আসে ব্রেন থেকে। শুধু হুকুমই দেয় না, সেই সঙ্গে বেশ কয়েকটা পর্যায়ে এমন লণ্ডভণ্ড কাণ্ড সৃষ্টি করে যে মদের বা খাবারের পিণ্ডি বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পায় না। উদর আর বুকের পেশীরা চেপে বসে আমার ওপর, হু-হাট হয়ে খুলে যায় গ্রাসনালীর নিচের দরজা (ভাল্‌ভ্‌)। তারপর কি হয়, তা আপনার জানা।

বুকজ্বালা জিনিসটা কিন্তু অন্য ব্যাপার। বুকের ঠিক মাঝখানে যে হাড়টা আছে, তার ধারে কাছে ব্যথা অনুভবের নাম বুকজ্বালা। ধরুন, উপেন একটু বেশী মাত্রায় বীয়ার গিলেছে অথবা এন্তার তেলেভাজা সাঁটিয়েছে; ফলে, আমার পাইলোরিক ভাল্‌ভ্‌ ঠিকমত নিজেকে খুলে ধরতে পারেনি—যে কারণে আমি নিজেকে খালি করতে পারিনি। গ্যাসের বুদবুদ উঠে আসে উপরে, সেই সঙ্গে জ্বালাকর খানিকটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড—আটকে যায়

গ্রাসনালীর ঠিক নিচে। বুক জ্বালা করে সেই কারণেই—গুরুতর কিছু নয়। একটা নিয়ম কিন্তু সবারই মেনে চলা দরকার। যদি কোনো তীব্র যন্ত্রণা মনে হয় আমার ভেতরেই হচ্ছে এবং ঘন্টাখানেকেও মিলিয়ে যাচ্ছে না—তাহলে যেন তৎক্ষণাৎ ডাক্তার দেখানো হয়। অনেক যন্ত্রণাই মনে হয় হচ্ছে আমার মধ্যে, বিশেষ করে পিত্তির থলির যন্ত্রণা—কিন্তু নিছক যন্ত্রণা মনে করে মুখ বুঁজে সহ্য করতে গিয়ে হৃদরোগের আক্রমণে মারা গেছে, এমন ঘটনা নিতান্ত বিরল নয়। সুতরাং দরকার কি মশাই ঝামেলা বাড়িয়ে—নিছক পেটের অস্বস্তি বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না—আসে আর যায় ঝটপট। দেহের মধ্যে অন্য যন্ত্রের চেয়ে সব চেয়ে বেশী গালাগাল খেতে হয় আমাকেই—হয়ত খাওয়ার যোগ্য বলেই হজম করি সব কিছু। আসলে কি জানেন, গালাগাল হজম করার মত করেই যে নির্মিত হয়েছি আমি। উপেন যদি যৎকিঞ্চিৎ বিবেচনা করে আমার ভালমন্দ নিয়ে, তাহলেও ওকে জীবন ব্যাপী ঝঞ্ঝাটমুক্ত সেবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি আমি। পারবে এই ধরনের প্রতিশ্রুতি দিতে আমার প্রতিবেশী অন্য কোনো দেহযন্ত্র!

অন্ত্র

উপেনের শরীর গড়ে উঠেছে অনেক দেহযন্ত্র নিয়ে। অধিকাংশ অতিশয় নম্র, ভদ্র, বিনীতভাবে যে যার কাজ করে চলেছে। কিন্তু এদের দলে আমি নেই। উপেনকে পদে পদে স্মরণ করিয়ে দিই আমি আছি, আমি আছি, আমি আছি! কখনো গুর-গুর ধ্বনি শুনিয়ে, কখানো মোচড়ানি দিয়ে, কখনো অতি-সক্রিয় হয়ে, কখনো একেবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে। কদাকার হংসশাবক বলতে পারেন আমাকে—উপেনের ২৬ ফুট লম্বা অন্ত্রনালী।

আমার সম্বন্ধে উপেনের ধারণাটা কিন্তু বেশ আবছা। যেন একটা পাকিয়ে রাখা নল এঁকে বেঁকে গিয়েছি দেহের মধ্যে দিয়ে। আসলে এর চাইতেও অনেক বেশী কিছু আমি। খাদ্যবস্তুকে নিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে দেহোপযোগী উপাদানে বিশ্লিষ্ট করার বি রাট একটা কারখানা বলতে পারেন আমাকে। উপেনের বিশ্বাস, সেই আমাকে খাওয়াচ্ছে। আসলে আমিই ওকে খাওয়াচ্ছি। ও যা খায়, তার বেশীর ভাগ যদি ঐ ভাবেই রক্ত প্রবাহে গিয়ে মিশতো, তাহলে তাদের কাজটা হত সাপের বিষের মতই মারাত্মক। আমিই বিভিন্ন খাবারকে গ্রহণযোগ্য করে তুলি। রক্ত প্রবাহে যে উপাদান স্বাভাবিক ভাবে রয়েছে—রকমারি খাবারকে সেই সব উপাদানে পরিবর্তিত করে দিই। কোটি কোটি কোষকে আহার জোগাই, পেশীদের শক্তি জোগাই। সকালে জল খাবারে ঘি-মুড়ি থেকে আরম্ভ করে মাখন রুটি, ডিম আর শূওরের দাবনা ভাজার সুপ্রচুর চর্বিকে ভেঙে চুরে আমিই ফ্যাটি অ্যাসিড আর গ্লিসারলে রূপান্তরিত করি। রাত্রে কব্জি ডুবিয়ে মাংস খেলে, সেই প্রোটিনকে অ্যামিনো অ্যাসিডে নিয়ে যাই আমিই। সেদ্ধ আলুর কার্বোহাইড্রেটকে পালটে চিনি-গ্লুকোজে পরিণত করে এই শর্মাই। রাসায়নিক কেরদানি যদি না দেখাতাম আমি, তাহলে আকণ্ঠ গিলেও অনাহারে অক্কা পেত উপেন।

সেলুলোজ হ'ল সেই জৈব পদার্থ যা দিয়ে উদ্ভিদের দেহ-কোষ গঠিত হয়, অর্থাৎ বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তন্তুর রাসায়নিক উপাদান। তুষ, শাকের শুঁয়ো ইত্যাদি সেলুলোজ ছাড়া বলতে গেলে উপেন যা কিছু খায়, তার সবই

আমি হজম করে ফেলি, তারপর তা চালান দিই রক্তসংবহ তন্ত্র অথবা লসিকা :তন্ত্রের মধ্যে। শেষ আবর্জনার যে স্তূপটি আমি বার করে দিই এত কাণ্ডের পর, তার মধ্যে থাকে অগণ্য কোটি-কোটি মরা জীবাণু আর যে হড়হড়ে শ্লেষ্মা ক্ষরণ করে আগাগোড়া রাস্তা মসৃণ করে রাখি—তার অবশিষ্টাংশ; সেই সঙ্গে টুকরোটাকরা অনেক কিছু যা আমি শোষণ করতে অক্ষম।

পরিপাকক্রিয়ার উপযুক্ত করেই আশ্চর্য স্থাপত্যকৌশলে নির্মিত হয়েছি আমি। প্রথমেই রয়েছে আমার ক্ষুদ্রান্ত্র, মানে দশ ইঞ্চি লম্বা গ্রহণী, পাকস্থলীর সঙ্গে লাগোয়া অবস্থায়; তারপরেই আট ফুট লম্বা জেজুনাম, যার ব্যাস প্রায় দেড় ইঞ্চি, তারপরেই বারো ফুট লম্বা একটু ছোট ইলিয়াম। এরপরেই আসছে আমার বৃহদন্ত্র—লম্বায় পাঁচ ফুট। আমার উর্ধ্বাংশে জীবাণু-টিবাণু প্রায় নেই বললেই চলে—পাকস্থলীর কড়া অ্যাসিড বধ করে অধিকাংশকেই। কিন্তু আমার নিম্নাংশে বিবিধ জীবাণুর একটা চিড়িয়াখানা রয়েছে বলা যায়—সব মিলিয়ে পঞ্চাশ রকমেরও বেশী বিভিন্ন জীবাণু এবং সংখ্যায় তারা কোটি কোটি।

পরিপাক ক্রিয়ার শুরু অবশ্য উপেনের মুখবিবর আর পাকস্থলীতে। মুখ যাঁতাকলে পেষাই করে পাকস্থলী মন্থনপাত্রে ঘুঁটে দেয়, সবশেষে দ্বার রক্ষক একটা ভাল্‌ভ্ খাবারের মণ্ডটাকে একটু একটু করে নামিয়ে দেয় আমার মধ্যে। উপেন এক গেলাস জল আমার এলাকায় পৌঁছাতে পারে দশ মিনিটেই—কিন্তু-চর্বি যুক্ত চপ খেলে চার ঘন্টার আগে নাও পৌঁছোতে পারে। পাকস্থলী যে খাবার চালান দেয় আমার কারখানায়, তাতে অ্যাসিড থাকে খুব বেশী। একসঙ্গে বেশ কিছুটা অ্যাসিড মিশোনো খাবার এসে পড়লে আমার আস্তরণকে জখম করে দিতে পারে দুর্দান্ত এই অ্যাসিড—গুরুত্বপূর্ণ হজমী এনজাইমগুলোরও সক্রিয়তা রোধ করে দিতে পারে সেই সঙ্গে।

অ্যাসিডকে সামলাই কিন্তু পরিপাটি ভাবে। সিক্রেটিন নামে একটা বস্তুর উৎপাদিত হয় আমার গ্রহণীর মধ্যে। বস্তুটা সরাসরি গিয়ে মেশে উপেনের রক্তপ্রবাহে। এতেই খোঁচা খায় প্যানক্রিয়াস (অগ্ন্যাশয়)—সঙ্গে সঙ্গে ক্ষরিত হতে থাকে ক্ষারধর্মী পাচক-রস। সারাদিনে এই পাচক-রসের পরিমাণ প্রায় দু-পাঁইট। প্যানক্রিয়াস থেকে রোজ এই দু-পাইট পাচক-রস গিয়ে পড়ে গ্রহণীতে, কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয় অ্যাসিডের। এই প্রক্রিয়া বিকল হলেই

কিন্তু পাকস্থলীর আলসারে যন্ত্রণা পাবে উপেন। আসলে এই ধরনের বেশীর ভাগ আলসার বা ক্ষত আমার গ্রহণীকেই ক্ষতবিক্ষত করে—পাকস্থলীকে নয়। প্যানক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয়ের এই রসের মধ্যে থাকে আরো তিনটে মূল এনজাইম যারা মিলেমিশে প্রোটিন, ফ্যাট আর কার্বোহাইড্রেটকে ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো করে ইমারত নির্মাণের মূল ইঁট বানিয়ে ছাড়ে।

অন্ত্র
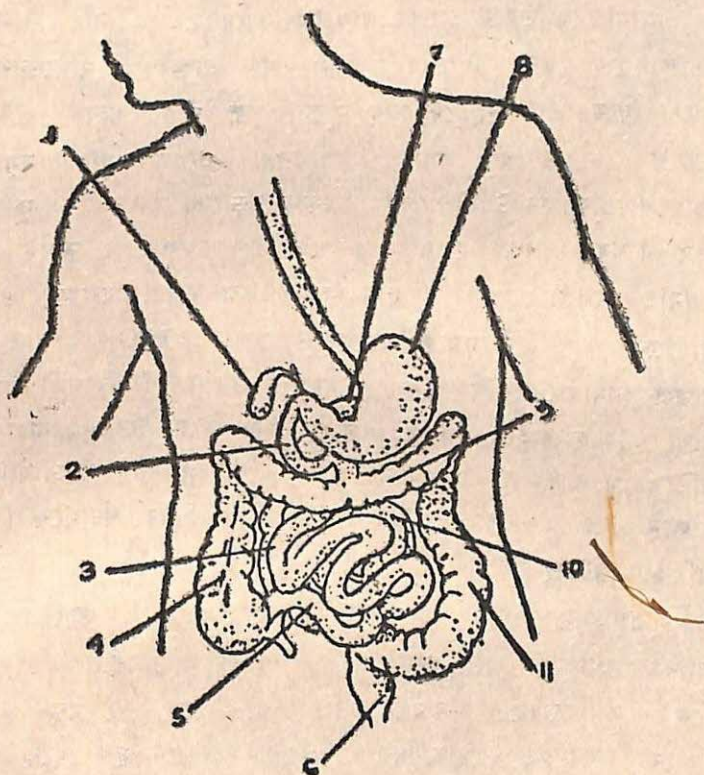
১। পিত্তথলি ; ২। গ্রহণী ; ৩। ক্ষুদ্রান্ত্র ; ৪। উচ্চমুখী মলাশয় ; ৫। ইলিয়াম (ক্ষুদ্রান্ত্রের তলার তিন-পঞ্চমাংশ) ; ৬। মলনালী, ৭। প্যানক্রিয়াস (অগ্ন্যাশয়) ; ৮। পাকস্থলী ; ৯। কোলন (বৃহদন্ত্র), ১০। জেজুনাম (গ্রহণী এবং ইলিয়ামের মধ্যবর্তী অংশ) ; ১১। নিম্নমুখী কোলন ;

নানা দিক থেকে আরো অনেক জলীয় পদার্থ একনাগাড়ে এসে পড়ছে আমার মধ্যে : রোজ চার পাঁইটের মত মুখের লালা, ছ' পাঁইটের মত পাকস্থলীর পাচক-রস, যকৃৎ-নিঃসৃত পিত্তি যার কাজ চর্বির বড় দানাকে ছোট দানায় পরিণত করা যাতে অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত এনজাইমেরা সহজেই তাদের ভেঙেচুরে ইমারতের ইঁট বানিয়ে নিতে পারে,—আর প্রায় চার পাঁইটের মত অন্ত্রনিঃসৃত রস—যাদের ক্ষরণ করে অসংখ্য গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ড। সব মিলিয়ে দু গ্যালনের মত জলীয় পদার্থ।

আমার যে তিনটে অংশের ব্যাস সরু, তাদের ভেতর যদি খালি চোখে তাকান তো দেখতে পাবেন মখমলের মত আস্তরণ। মাইক্রোসকোপের মধ্যে দিয়ে তাকালে দেখবেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খাঁজ, গহ্বর আর উদ্গত অংশ। প্রকৃতপক্ষে, আমার, অভ্যন্তর প্রদেশ যদি মসৃণ হত, তাহলে শোষণক্ষম উপরিভাগের ক্ষেত্রফল দাঁড়াতো মোটে ছ 'বর্গ-ফুট। কিন্তু এবড়োখেবড়ো বন্ধুর হওয়ার ফলে এই ক্ষেত্রফল এখন নব্বই বর্গফুট। আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সম্ভবত লক্ষ লক্ষ শোষকযন্ত্র (ভিলাস)— মাইক্রোসকোপ দিয়ে দেখলে দেখবেন তারা লক্ষ আঙুলের মত মাথা তুলে রয়েছে আমার দেওয়াল থেকে। আমার ভেতরকার পাঁচমিশেলী বস্তুনিচয়ের মধ্যে থেকে হজম হয়ে যাওয়া খাদ্যকে টেনে নিয়ে উপেনের সারা শরীরে ছড়িয়ে দেওয়াই এদের একমাত্র কাজ। প্রোটিন আর কার্বোহাইড্রেটকে চালান করে রক্তপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে, স্নেহজাতীর পদার্থকে (ফ্যাট) লসিকাতন্ত্রের মাধ্যমে।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পেশীর আস্তরণে মোড়া আমার সমস্ত পথ। উদরের দেওয়ালে আমি আলগাভাবে লেগে ঝুলছি। কিন্তু আমার আস্তরণের একদল পেশী দুলে দুলে খাদ্যবস্তুকে নিষিক্ত করছে পাচকরসের সঙ্গে মন্থন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কার্যরত অবস্থায় যখন থাকি, তখন মিনিটে দশ থেকে পনেরো বার এই দুলে দুলে ওঠা মন্থন প্রক্রিয়া চলতে থাকে—পেণ্ডুলামের দোলনের মত আর কি। আর একদল পেশী ঢেউয়ের মত একটা গতির সৃষ্টি করে; খাদ্যমণ্ডকে কয়েক ইঞ্চি ঠেলে এগিয়ে দিয়ে থেমে যায় তরঙ্গগুলো। আমার বিশ ফুট লম্বা ক্ষুদ্রান্ত্রের তাই পুরোপুরি বিশ্রাম নেই কখনোই।

আহারকে হজম করিয়ে শোষণক্ষম করে তুলতে তিন থেকে আট ঘণ্টা সময় নেয় আমার ক্ষুদ্র অন্ত্র। তারপর সেই জলের মত ফেণকে আমি চালান

করি আমার বৃহৎ অন্ত্রে। এর কাজ হল জল নিষ্কাষণ করে রক্তের মধ্যে সেই জলকে ফিরিয়ে দেওয়া। কাদা-কাদা আধা কঠিন আবর্জনাটাকে আমি জমিয়ে রাখি মলনালীর সবচেয়ে কাছে মলাশয়ের একটা অংশে।

স্বাভাবিক অবস্থায় জল নিষ্কাষণ প্রক্রিয়া চলে বড় মৃদুমন্দ গতিতে—আলসে নম্বর ওয়ান—লাগে বারো থেকে চব্বিশ ঘন্টার মত। গতিবেগ বৃদ্ধি পেতে পারে নানা কারণে—স্নায়বিক উৎকণ্ঠায়, ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় এবং জীবাণুদের নষ্টামিতে। উপেনের তখন উদরাময় অর্থাৎ পেটের অসুখ দেখা যায়। আবার অন্য কারণে, যেমন উদ্বেগ আর আজেবাজে খাওয়ার ফলে, প্রায় থেমে আসে এই তৎপরতা। তখন কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধতায় ভোগে উপেন। এই দুই ব্যায়রামের মধ্যে বেশী গুরুতর হল উদরাময় বা পেটের অসুখ—কেন না এতে সাংঘাতিক রকমের জলাভাব ঘটে শরীরের মধ্যে! তাই বলছিলাম, পেটের অসুখ হলেই যেন বেশী পরিমাণে জল পান করে উপেন।

উপেনকে অনেক রকম ভোগান্তির মধ্যে ফেলি ঠিকই, কিন্তু এদের বেশীর ভাগই ছোটখাট ধরনের। মাঝে মাঝে পেটে গুর গুর ধ্বনি শুনে মহা লজ্জায় পড়ে উপেন—জিনিসটা কি জানতে ইচ্ছে করছে বুঝতে পারছি। গুরুতর কিছুই নয়—বাতাসের বুদবুদ আমার ফাঁকগুলোর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে আওয়াজ ছাড়ে অমনি করে। এই বুদবুদের বেশীর ভাগটাই হল বাতাস—যা খাওয়ার সময়ে গিলেছে উপেন। কিন্তু এ ছাড়াও আমি নিজেও একটা গ্যাসের কারখানা—প্রধানতঃ মিথেন আর হাইড্রোজেন গ্যাস বানাই। এ গ্যাসের বেশীর ভাগটাই বার করে দিই বাইরে। গ্যাস জমে যখন পেট ফুলে ওঠে, তখন পেটে যন্ত্রণা হতে থাকে উপেনের—মনে হয় পেট খেঁচে ধরেছে

শরীরের অন্যান্য দেহযন্ত্রের মত আমি উপেনের মেজাজ মত চলি। আবেগ তীব্র হলে আমার ছন্দিত গতি নিস্পন্দ হয় পুরোপুরি। এই কারণেই রেগে আগুন হলে উপেনের ক্ষিদে পায় না—খাবারে বিতৃষ্ণা জাগে। আমার কথাটা যদি তখন খেয়াল থাকে উপেনের, তাহলে যেন দয়া করে সেই সময়ে খাওয়াটা বন্ধ রাখে—রাগ জল না হওয়া পর্যন্ত আহার স্থগিত রাখে।

উপেন নিজেই জানে না ওর ডাইভারটিকিউলোসিস আছে। খটমট নাম দেখে ভড়কে যাবেন না—মানে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার দেওয়াল থেকে

যকৃৎ

উপেন ভেবে মরে ওর দাঁত, চুল, ফুসফুস আর হৃৎপিণ্ড নিয়ে, আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সচেতন থাকে না সবসময়ে। আমি কিন্তু ওরই লিভার—যকৃৎ। কদাচিৎ যখন আমাকে স্মরণ করার দরকার হয় মহাপ্রভুর, তখন আমাকে মনে মনে কল্পনা করে নিতেও বেগ পেতে হয় না। দেখতে আমাকে সেই রকমই যে রকমটি আমার হওয়া দরকার—লিভারের মত। দেহের সবচাইতে বড় যন্ত্র, ওজনে তিন পাউণ্ড। পাঁজরার খাঁচায় সুরক্ষিত অবস্থায় আমি উপেনের উদরের ডানদিকের ওপরের অংশটা বেশ ভাল ভাবেই জুড়ে থাকি।

চেহারার দিক দিয়ে আমি অসাধারণ না হতে পারি, কিন্তু গুণপনার দিক থেকে যদি বিচার করতে বসেন, তাহলে উপেনের সব ক'টা দেহযন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে সমঝদার এবং গুণগ্রাহী কিন্তু আমিই। হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস—এই দুই মক্কেল তো শরীরতত্ত্বের দুই প্রধান শিরোনাম হয়ে বসেছে; কিন্তু জটিলতার দিক দিয়ে এদের দুজনকেই লজ্জায় ফেলতে পারি আমি। প্রায় পাঁচশ রকমের কাজ সারতে হয় আমাকে, বড় ধরনের কোনো কাজ করতে গিয়ে যদি না পারি, তাহলে উপেন যেন নিজের শ্রাদ্ধের কাজটা আগে ভাগেই এগিয়ে রাখে। ও যা কিছু করে, বলতে গেলে তার প্রতিটিতে অংশ নিই আমি। ও যখন ফুটবল খেলতে মাঠে নামে, পেশীকে জ্বালানি জোগাই আমি; প্রাতরাশের ঘি-মাখন-চর্বিওলা খাবার-হজম করাই আমি; রাত্রে দেখতে পাওয়ার জন্যে সাহায্য করে যে ভিটামিন, তাকেও উৎপাদন করি আমি।

এর চাইতে ছোটখাট সহজ সরল যে-সব কাজ কারবার আমাকে করতে হয়, তার সব যদি কোনো কেমিক্যাল কোম্পানীর ঘাড়ে এসে পড়ত, তাহলে তাদের দরকার হত সুবৃহৎ একটা কারখানা। অনেক রকম রাসায়নিক রূপান্তরকরণের ভার আছে আছে আমার ওপর এবং এ জন্যে এক হাজারেরও বেশা বিবিধ এনজাইম প্রস্তুত করতে হয় আমাকে। আঙুল যদি কাটে উপেনের, কাটা আঙুলের রক্তপাতেই অক্কা পেত উপেন যদি না রক্ত জমা-

নোর উপাদানগুলো প্রস্তুত করে দিতাম আমি। অসুখবিসুখ থেকে ওকে আগলে রাখার জন্যেই অ্যান্টিবডির উৎপাদন চালিয়ে যাই আমি। (বিভিন্ন রকম রোগ প্রতিরোধের স্বাভাবিক উপায়স্বরূপ জীবের রক্তে রোগ জীবাণু ঢুকলে স্বভাবতঃই যে-সব জৈব রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, অ্যান্টিবডি

যকৃৎ
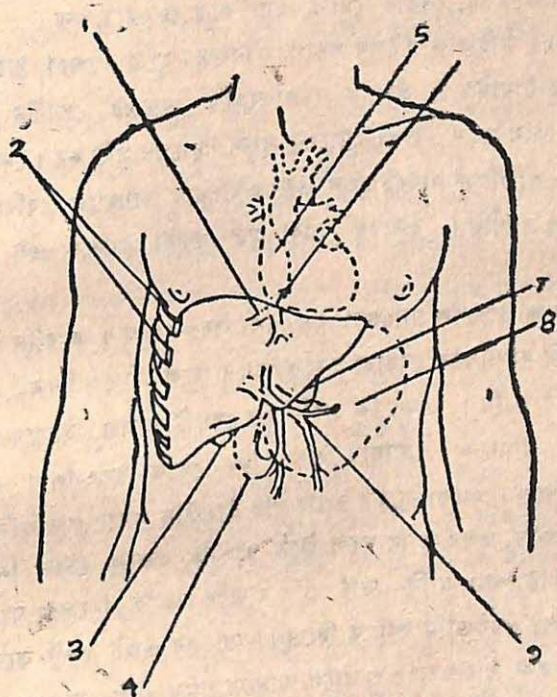
১। যকৃৎ; ২। পাঁজরা (কাটা); ৩। পিত্তথলি, ৪। গ্রহণী, ৫। হৃদ্‌যন্ত্র, ৬। হেপ্যাটিক (যকৃৎসম্বন্ধীয়) শিরা মারফৎ হৃদ্‌পিণ্ডে রক্ত; ৭। হেপ্যাটিক ধমনী; ৮। পাকস্থলী; ৯। পোরট্যাল শিরা (পাচন তন্ত্র থেকে রক্ত),

বলে তাদেরকেই। রক্তে প্রবিষ্ট জীবাণুরা এদের প্রভাবে বিনষ্ট হয়, বা এদের রাসায়নিক ক্রিয়ায় জীবাণুদের বিষ-রস নির্বিষ হয়ে পড়ে।) মাংস খেতে তো খুব ভালবাসে উপেন। কিন্তু সেই মাংস থেকে প্রোটিন ভেঙে চুরে গিয়ে যে অ্যামিনো অ্যাসিডের উৎপাদন ঘটে অন্ত্রের মধ্যে, তা ঐভাবেই

যকৃৎ

দৈনিক দু পাঁইট পিত্তির কাজে—তিক্ত সবজে-হলুদ এই পাচকরসের সম্বন্ধে সৃষ্টিরহস্য এবার জানলেন তো ?

স্বাভাবিক অবস্থায় এই তিক্ত জলীয় রসটি আমার এলাকা থেকে পিত্তির থলিতে যায়—সেখান থেকে গ্রহণীতে। খাওয়ার সময়ে মুক্তি পায় এই রস যাতে চর্বির বড় দানাকে ভেঙে চুরে ছোট আকারের জলে দ্রবণীয় সহজপাচ্য দানায় পরিণত করা যায়। সবার ওপর যে কাজটি করে পিত্তিরস, তা হ'ল চর্বিকে, ধুইয়ে বার করে দেওয়া—যাতে আমার পথ বন্ধ করতে না পারে।

একনাগাড়ে যে পিত্তরসকে আমি টপ টপ করে চালান দিয়ে চলেছি পিত্ত-থলিতে, তার মধ্যে থাকে দুটো রঞ্জক পদার্থ—লাল কোষ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর যা পড়ে থাকে—সেই ফ্যালনা বস্তু। একটার নাম বিলিরিউ-বিন (লাল পিত্তি); আরেকটা বিলিভারডিন (সবুজ পিত্তি)। কখন সখন অধিক পরিমাণে রক্ত প্রবাহে ঢুকে পড়ে এই রঞ্জক পদার্থরা এবং জনডিস অর্থাৎ ন্যাবা রোগ ডেকে আনে। চামড়া আর চোখ হলদে হয়ে যায়। যখনি এই কাণ্ড ঘটে, তখন তিন ধরনের সমস্যার যে কোনো একটি উপস্থিত হয়। কিছু রোগ—যেমন ম্যালেরিয়া আর কিছু ধরনের অ্যানিমিয়া—লাল রক্তের কোষকে দ্রুত ধ্বংস করে; নিহত কোষদের রঞ্জক পদার্থ এত দ্রুত সঞ্চিত হতে থাকে যে আমিও তাদের রক্ত থেকে সরিয়ে ফেলতে অক্ষম হই।

অন্ত্রের মধ্যে পিত্তির প্রবাহে কোনো বাধা এসে পড়লেও রঞ্জক পদার্থরা জমে উঠতে উঠতে শেষকালে রক্তপ্রবাহে ছড়িয়ে গিয়ে জনডিস রোগকে ডেকে আনতে পারে অথবা আমার কর্মী কোষেরা যদি হেপাটাইটিস (যকৃৎ-প্রদাহ) রোগে অথবা অন্য কোনো রোগের ফলে প্রদাহগ্রস্ত হয়। অথবা যদি চর্বির ডেলায় আমার পথ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলেও রঞ্জক পদার্থদের নিষ্ক্রান্ত করতে অক্ষম হই আমি। ফলে গুরুতর ঝঞ্ঝাটে পড়তে হয় আমাকে।

তা সত্ত্বেও জানবেন আমার সঞ্চয় বিপুল এবং নবজীবন দান করার ক্ষমতাও বিস্ময়কর। শতকরা ৮৫ ভাগ কর্মী কোষও যদি ধ্বংস হয় রোগে, তাহলেও কাজ চালিয়ে যাই আমি। (আসলে কি জানেন, আমার এই সঞ্চয় ক্ষমতাই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার নিরাপত্তার পক্ষে। উপেন যখন

বিপদের সংকেত পায়, তখন কিন্তু আমার অবস্থা কাহিল অবস্থায় পৌঁছে গেছে। আমার শতকরা ৮০ ভাগও যদি কেটে বাদ দেওয়া হয় (ক্যানসার অস্ত্রোপচারে যা আকছার হচ্ছে), তাহলেও স্বাভাবিক কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখতে পারি আমি। এ ছাড়াও আমি যা করতে পারি, অন্য দেহ-যন্ত্রদের কেউ তা পারে না—কয়েক মাসের মধ্যে নিজেকে পুনর্নির্মিত করে নিতে পারি এবং স্বাভাবিক আয়তন ফিরিয়ে আনতে পারি।

হেপাটাইটিস অর্থাৎ যকৃৎ-প্রদাহ ব্যাধিতে আমার কয়েক লক্ষ কর্মী কোষ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সাধারণতঃ প্রশমণ ঘটে এই ভাইরাস সংক্রমণের, এবং আমিও তখন ক্ষয়ক্ষতি ফের মেরামত করে নিই। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই, ফিরে যাই স্বাভাবিক অবস্থায়। চর্বি ঢুকে পড়লে কিন্তু পরিণামটা গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়, কেন না কাজের কোষদের হটিয়ে দিয়ে সে জায়গায় গ্যাঁট হয়ে বসে যায় চর্বিবাহিনী। চর্বি বেশী জমলেই আমি স্ফীত এবং টনটনে হয়ে উঠি। চর্বি রক্তপ্রবাহেও ঢুকে পড়তে পারে এবং অত্যাবশ্যক দেহযন্ত্রদের রক্তবাহর মধ্যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়াও, চর্বির অনধিকার প্রবেশের ফলে আরও একটা গুরুতর সমস্যার সূচনা ঘটতে পারে : অকেজো, তন্তুময় টিশু হটিয়ে দেবে কাজের টিশুদের—দখল নেবে গায়ের জোরে। আমি তখন গুটিয়ে ছোট্ট হয়ে যাই, কঠিন হয়ে উঠি, গোলাকার স্ফীতিতে ভরে উঠি এবং রোগগ্রস্ত হলদেটে রঙের হয়ে যাই। এরই নাম সিরোসিস রোগ—এ রোগ যার হয়, তার ইষ্টমন্ত্র জপ করাই উচিত।

সিরোসিসের কারণটা কী? কারণ অনেক। আর্সেনিক বিষক্রিয়া বা অন্যান্য ক্ষতিকারক ওষুধের প্রতিক্রিয়া অথবা জীবাণু সংক্রমণের পর সিরোসিস রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে। কিন্তু যে দুটি বিষয় সবচেয়ে বড় ভূমিকা নেয় সিরোসিস সৃষ্টির মূলে, তারা হল অ্যালকোহল আর নিকৃষ্ট আহার। যে মানুষ খায় কম, কিন্তু মদ্যপান করে বেশী—দিনে পাঁচ পেগ হুইস্কি—চর্বিযুক্ত লিভার তার হবে বলেই ধরে নিতে পারেন এবং সেই থেকেই আসবে মহাশয় সিরোসিস ব্যাধি। উপেনের কপাল ভাল। তাই এই ধরনের মানুষদের পর্যায়ে সে এখনো পড়েনি। কয়েকটা পুরোনো ক্ষত-চিহ্ন অবশ্য রয়ে গেছে আমার গায়ে—কিন্তু এখনো কর্মী কোষ যা আছে, তা যথেষ্ট।

আমাকে বলা হয় 'নীরব' দেহযন্ত্র, যদিও গোলমালের সময়ে, নালিশ জানাতে হয় আমাকেও। অকারণ অবসাদ, ক্ষুধার অভাব, দুর্বলতা, এবং পেটফুলে থাকার সমস্যা দেখা দিলেই উপেন যেন আমার কথাটা স্মরণ করে। যদি দেখে মাকড়শার আকারে স্ফীত রক্তবাহ দেখা দিয়েছে শরীরের উর্ধ্বাংশে, অথবা যদি জনডিস রোগাক্রান্ত হয় কখনো, তাহলে যেন ঝটপট দৌড়োয় ডাক্তারের কাছে। আমাকে নিয়ে হেলাফেলা করাটা ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

গণ্ডগোলগুলোর মূলে আদৌ আমি আছি কিনা, সেটা বাজিয়ে নেওয়ার উত্তম পরীক্ষার সন্ধান রাখেন ডাক্তাররা একটা পরীক্ষায়, একটা রঞ্জক পদার্থ ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। বহাল তবিয়তে থাকলে রঙটায় শতকরা ৯৬ ভাগ আমি বার করে দেব ৪৫ মিনিটের মধ্যে। আরেকটা বহু-ব্যবহৃত পরীক্ষা অনুসারে, রক্তের মধ্যে বিলিরিউবিন নামক রঞ্জক পদার্থটির পরিমাণ কত খানি মেপে দেখা হয়। যদি দেখা যায় পরিমাণ বেশী, তাহলেই বুঝতে হবে আমি সম্ভবতঃ ঝামেলায় পড়েছি। কিন্তু সবচাইতে অকাট্য পরীক্ষা হল একটা ফাঁপা বায়োপ্‌সি ছুঁচ ঢুকিয়ে আমার মধ্যে থেকে খানিকটা টিশু টেনে বার করে পরীক্ষা করে দেখা।

এখনও পর্যন্ত অন্ততঃ আমাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ ঘটেনি উপেনের। কিন্তু আমার সবচেয়ে গুরুতর যে সমস্যাটা আকছার দেখা যায়, সেই সিরোসিস রোগটাও যদি ওর হয়, ডাক্তাররা সে রোগকেও বাগে আনবার অনেক বিদ্যে রপ্ত করে ফেলেছেন। উপেনকে শয্যাবন্দী করে বিশেষ আহারের ব্যবস্থা দেবেন তাঁরা। সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এবং কড়া নিষেধ থাকবে—ভুলেও যেন অ্যালকোহলের দিকে আর না তাকায়—পান করা তো দূরের কথা। এই চিকিৎসায় নতুন করে চাঙা হয়ে ওঠার বিলক্ষণ সুযোগ আমি পাব।

এ সব অপ্রীতিকর অবস্থা যাতে আদৌ না দেখা যায়, এ ব্যাপারে উপেনের করণীয় কিছু আছে কি? অবশ্যই আছে। নিজের ওজনের দিকে নজর রাখতে পারে; ওর গায়ে চর্বি জমলেই আমার মধ্যেও চর্বি জমবে। ভিটামিনেও উপকার হয় আমার, বিশেষ করে বি-ভিটামিন, যা প্রচুর পরিমাণে থাকে লিভারে, wheat germ আর খমিরে। কিন্তু সবচেয়ে বড় করণীয় হল উপযুক্ত আহার এবং কম মাত্রায় সুরাপান। একটু যত্ন নিলেই নীরবে সর্বঘটে কাঁঠালি কলা হয়ে উপেনকে সব কাজের কর্মী রেখে দিতে পারব আমি একাই।

অগ্ন্যাশয় (প্যানক্রিয়াস)

লম্বায় আমি ছ'ইঞ্চি, রঙটা ধূসর-গোলাপী, আকার আর আয়তনে একটা বড়সড় কুকুরের জিভের মত, ওজনে প্রায় তিন আউন্স। থাকি উপেনের উদরের গহনতম অঞ্চলে, লিভার, কিডনী, বৃহদন্ত্র এবং আরও অনেক দেহ-যন্ত্ররা গুঁতোগুঁতি করে যেথায় বাসা বেঁধে রয়েছে—সেইখানে। উপেনের মেরুদণ্ডের ঠিক সামনে আর পাকস্থলীর ঠিক পেছনেই আমার নিবাস। ভেড়ার প্যানক্রিয়াস (অগ্ন্যাশয়) খেয়েছে উপেন, তাই জানে আমার ঘনত্বের মাত্রা কতখানি। আমিও তো উপেনের অগ্ন্যাশয়—ওর প্যানক্রিয়াস।

ফুসফুস, হৃদযন্ত্র, চোখ আর কান যতটা প্রচার পায়, আমাকে নিয়ে ততটা ঢাকঢোল পেটানো হয় না ঠিকই, তা সত্ত্বেও আমি বড় ব্যস্ত। যে সব এনজাইমদের প্রস্তুত করে চলেছি আমি, তাদের না পেলে পেট ঠেসে খেয়েও অপুষ্টিতে ভুগত উপেন। যখনি ও চোখের পাতা ফেলে, অথবা হৃদযন্ত্র রক্ত পাম্প করে, কোষ বেচারীদের শক্তির জোগান দিতে হয়। কোষের আগুনকে প্রজ্বলিত রাখতে সাহায্য করি আমিই—জ্বালানি সরবরাহ করে।

আসলে কি জানেন, দুটো গ্ল্যাণ্ডকে একটা মোড়কের মধ্যে রেখে নির্মাণ করা হয়েছে আমাকে; দুটো অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ হরমোন উৎপাদন করে আমি ঢেলে দিই উপেনের রক্তপ্রবাহে। শক্তি বা এনার্জির মূল জোগানদার হল উপেনের গ্লুকোজ অথবা রক্তের শর্করা—কোষের জ্বালানি, আমি যে ইনসুলিন বানাই, তার কাজ এই রক্তের চিনিকে সঠিক সমতায় রেখে দেওয়া এবং ঠিকমত তার দহন ক্রিয়া চলছে কিনা তা দেখাশুনা করা। কাজটা খুবই সূক্ষ্ম এবং সংকটজনক—এইটুকুই শুধু বলব আপনার জ্ঞাতার্থে।

হজমের ব্যাপারে আমার মূল ভূমিকা পালন করি দৈনিক প্রায় দু পাঁইটের মত পাচকরস উৎপাদন করে। কৃতিত্বটা কম নয়—তিন আউন্স ওজনের একটা গ্ল্যাণ্ড থেকে বত্রিশ আউন্স তরল পদার্থ উৎপাদন চাট্টিখানি কথা নয়। পাকস্থলী থেকে উপেনের খাদ্যসম্ভার বেরিয়ে আসে অত্যন্ত অ্যাসিডপূর্ণ মণ্ড অথবা জগাখিচুড়ির অবস্থায়। অম্বল হয়েছে বলে প্রায় উপেন গজর-গজর করে মরে, কিন্তু একবারও ভেবে দেখে না প্রোটিনকে

ভাঙচোর করার জন্যে অ্যাসিডকে কাজ শুরু তো করতেই হবে! উপেনের পাচনতন্ত্রে গিয়ে কিন্তু এই অ্যাসিড কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করে ছাড়তে পারে—ক্ষুদ্রান্ত্রের গা বরাবর সূক্ষ্ম আস্তরণকে কুরেকুরে খেয়ে দগদগে ঘা বানিয়ে দিতে পারে—পারে না কেবল আমার জন্যে। এন্তার ক্ষারধর্মী রস ক্ষরণ করে অ্যাসিডের কার্যকারিতা নষ্ট করে দিই আমি—অতন্দ্র প্রহরী বলতে পারেন আমাকে এই দিক দিয়ে—অম্লকে খতম করি ক্ষারের লাঠি হাঁকড়ে।

উপেন যেই পাত পেড়ে বাবু হয়ে বসে পঞ্চব্যঞ্জন নিয়ে, অমনি আমার লক্ষ লক্ষ ছোট্ট থলির মত রসক্ষরণকারী অ্যাসিনিদের কাছে সংকেত আসে স্নায়ুতন্ত্র থেকে—শুরু করো হে ক্ষারধর্মী রসের উৎপাদন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না পাকস্থলী থেকে পাইলোরাস নামক দরজা পেরিয়ে খাদ্যমণ্ড দশ ইঞ্চি লম্বা ফুলো ফুলো থলির মত গ্রহণীতে পোঁছোচ্ছে, ততক্ষণ পুরোদমে উৎপাদন শুরু করি না। গ্রহণীর নিজের মধ্যেও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আছে। যেই দেখে অ্যাসিড মাখামাখি অবস্থায় সর্বনেশে খাবারের মণ্ড আসতে আরম্ভ করেছে, অমনি সিক্রিটিন নামে একটা হরমোন তৈরী করতে আরম্ভ করে হুটোপাটি করে—এই হরমোনেরই রাসায়নিক বার্তা রক্তের মধ্যে দিয়ে গিয়ে খুঁচিয়ে তোলে আমাকে—শুরু হয় পুরোদমে ক্ষার উৎপাদন। অ্যাসিড আর অ্যালকালির লড়াই লাগে গ্রহণীতে— সবংশে ধ্বংস হয় অ্যাসিড।

তা সত্ত্বেও বলব, অ্যাসিডের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেওয়ার মধ্যে রাসায়নিক বাহাদুরি খুব একটা নেই—বড়াই করার মত নয়। আমার অন্যান্য কয়েকটা কাজ জানবেন আরও বেশী ভয়ংকর। যেমন ধরুন না কেন উপেন যা খাচ্ছে, বেশীর ভাগ খাবার যদি সেই অবস্থায় রক্ত প্রবাহে গিয়ে কখনো পোঁছোতো, তাহলে শ্মশান যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হতে হত উপেনকে অচিরে। কিন্তু তা হয় না— আমিই খাবারদের ভেঙেচুরে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হই।

এই কাজটা করতে গিয়ে তিনটে প্রতিভাসম্পন্ন এনজাইমকে উৎপাদন করি আমি। রাসায়নিক ভেল্কী দেখানোয় ওস্তাদ এই তিন মহারথীর একটি হল ট্রিপসিন—প্রোটিনে ভাঙন ধরিয়ে অ্যামিনো অ্যাসিড উৎপাদনের সূচনা করে—যাতে তারা রক্ত প্রবাহে ভিড়ে গিয়ে সারা দেহে চক্কর দিয়ে টিশু (কলাতন্ত্র) নির্মাণে অংশ নিতে পারে। আরেকটা এনজাইম, অ্যামাইলেজ,

অগ্ন্যাশয় (প্যানক্রিয়াস)
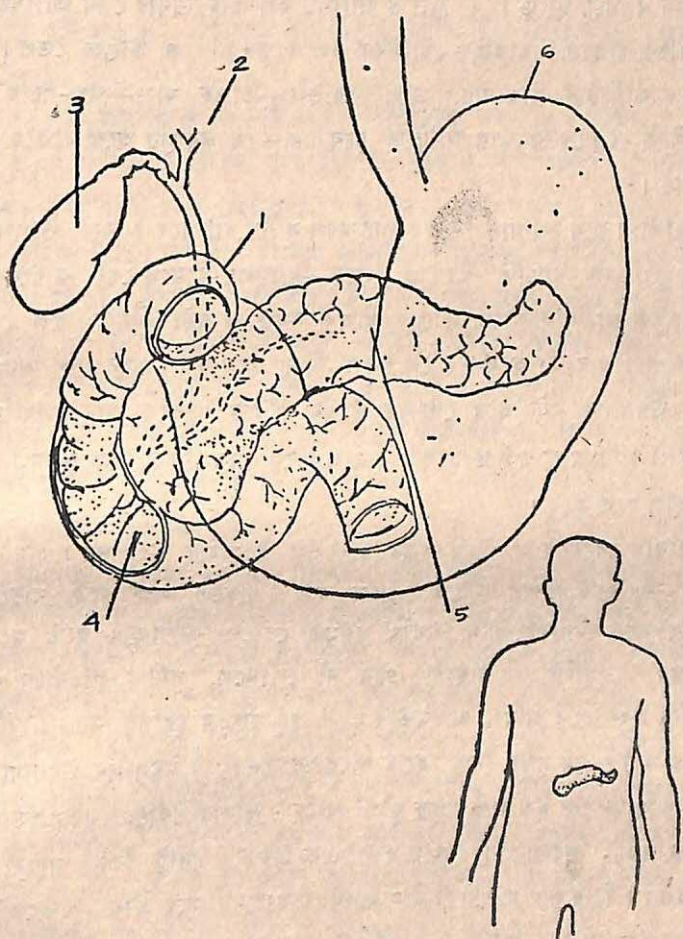
১। পাইলোরাস (গ্রহণীর মধ্যে পাকস্থলীর মুখ) ; ২। যকৃৎ থেকে , ৩। পিত্তথলি , ৪। গ্রহণী (অগ্ন্যাশয় নালী দেখানোর জন্যে কাটা হয়েছে) ; ৫। অগ্ন্যাশয় ; ৬। পাকস্থলীর বহিরেখা , ৭। অগ্ন্যাশয় যেখানে আছে ;

স্টার্চ অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ শ্বেতসার পদার্থকে (রাসায়নিক হিসেবে বিশেষ এক শ্রেণীর কার্বোহাইড্রেট) শর্করায় পরিণত করে। তৃতীয়টার নাম লাইপেজ —চর্বির দানাকে আক্রমণ করে তাদের ভেঙেচুরে ফ্যাটি অ্যাসিড আর গ্লিসারিন বানিয়ে ছাড়ে। (ফ্যাটি অ্যাসিড হল এক শ্রেণীর জৈব অ্যাসিড। এর বিভিন্ন প্রকার গিসারাইড যৌগিকই হল জান্তব চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তৈল।) পোলাও কালিয়াই খাক অথবা ডাল আর ভাতে-ভাতই খাক—অন্ত-পদার্থরা মিলেমিশে মুখে যে অবস্থায় আদিতে ঢুকেছিল—সে অবস্থায় অন্তে থাকছে না কখনোই।

সৌভাগ্যক্রমে, আমার নিজের পাচকরস সৃষ্টির ব্যাপারে আমার উৎপাদন ক্ষমতা রীতিমত বাড়তি অবস্থায় আছে—স্বাচ্ছল্য রয়েছে সেই কারণেই। আমার যত অ্যাসিনি আছে, তাদের অর্ধেক সমস্ত কাজটা নিষ্ঠার সঙ্গে শেষ করতে পারে—বাকী অর্ধেক নাকে তেল দিয়ে ঘুমোয়। এমন কি আমার পুরো উৎপাদন নষ্ট হয়ে গেলেও উপেন টি'কে থাকবে এই ধরাধামে। পাকস্থলী আর অন্ত্রে ক্ষরিত রসেরা সামাল দিয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু হজম নিয়ে নাজেহাল হতে হবে।

আমার সবচেয়ে সংকটময় কঠিন কাজ হল ইনসুলিন উৎপাদন। যদি এই কঠিন কর্তব্যটি সম্পন্ন করতে অক্ষম হই, তাহলে লক্ষ লক্ষ মানুষের মত উপেনকেও ডায়াবেটিস অর্থাৎ বহুমূত্র রোগে কুপোকাৎ হতে হবে। (জান্তব ইনসুলিনের সাহায্য এসে না পৌঁছলে, পর্যাপ্ত পরিমাণে এই হরমোন উৎপাদনে আমার অক্ষমতার দরুন শুধু বহুমূত্র রোগই নয়—দীর্ঘদিন অনেক কষ্ট পেয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে উপেনের।) ইনসুলিন উৎপাদনের জন্যে আমার প্রায় দশ লক্ষ 'ক্ষুদ্র দ্বীপ' আছে ; আমার শরীরের সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে এরা ; প্রত্যেকটা 'ক্ষুদে দ্বীপ' এক-একটা ছোট্ট কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ কারখানা। (এদের ডাক্তারী নাম ল্যানগারহ্যানের ক্ষুদে দ্বীপ—আইলেট্‌স্ অফ ল্যানগারহ্যান—জার্মান প্যাথলজিষ্ট পল ল্যানগারহানের নামানুসারে। প্যানক্রিয়াসের সর্বত্র ছড়িয়ে থেকে বিশেষ ধরনের এই কোষেরা ইনসুলিন উৎপাদন করে সরাসরি ঢেলে দেয় রক্তপ্রবাহে)। সংখ্যায় এরা দশ লক্ষ— অথচ দখল করে রয়েছে আমার তিন আউন্স ওজনের মাত্র শতকরা ১.৫ ভাগ। গুরুত্বটা এবার বুঝেছেন ?

উপেনের শরীরের কোটি কোটি কোষেদের প্রত্যেককেই এক-একটা

অত্যন্ত সক্রিয় এবং সুদক্ষ চুল্লি বলতে পারেন—নিরন্তর গ্লুকোজ পুড়িয়ে শক্তি সৃষ্টি করে চলেছে। আমার তৈরী ইনসুলিনের কাজই হল এরা পরিমাণ মত জ্বালানী পাচ্ছে কিনা, তা দেখা। অন্যভাবে বলতে গেলে, সারা শরীরে যতখানি গ্লুকোজ চক্কর মারছে (সব মিলিয়ে এক আউন্সের ছ'-ভাগের এক ভাগ), তার পরিমাণটা যাতে সুনির্দিষ্ট থাকে, তার তদারক করা।

গ্লুকোজ দহনের কাজে কোষদের সাহায্যও করে ইনসুলিন। হঠাৎ যদি ধর্মঘট করে বসে আমার 'ক্ষুদে দ্বীপ'রা, তাহলে অন্য জ্বালানী পোড়ানোর চেষ্টায় থাকবে উপেনের কোষেরা। পুড়তে থাকবে চর্বির সঞ্চয়। এমন কি কোষের আগুন প্রজ্বলিত রাখার জন্যে পেশী থেকে প্রোটিনকেও টেনে নেওয়া হবে। মৃতবৎ বিবর্ণ হয়ে যাবে উপেন, ছটফট করবে উপোসি নেকড়ের মত রাক্ষুসে ক্ষিদের জ্বালায়, তেষ্টায় টা-টা করবে বিরামবিহীন ভাবে। চিনিকে পোড়াতে অপারগ হওয়ার ফলে সেই চিনি মিষ্টি মূত্র হয়ে বেরিয়ে যাবে শরীর থেকে—কখনো সখনো তার পরিমাণ দাঁড়াবে দিনে ছ পাঁইটের মত। এ সবই হল ডায়াবেটিসের লক্ষণ—যা আমি রোধ করে চলেছি আমার সর্বশক্তি দিয়ে।

উপেনের যকৃতের ওপরেও নিশানা স্থির করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আমার ইনসুলিন। রক্তে ভ্রমণরত গ্লুকোজ পরিমাণে বেড়ে গেলেই সেই বাড়তি গ্লুকোজকে ভাঁড়ার ঘরে তুলে রাখার জন্যে রয়েছে ওর যকৃৎ। যকৃতের মধ্যে দিয়ে রক্ত যাওয়ার সময়ে ইনসুলিনের খোঁচা খেয়ে বাড়তি গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেন নামক একরকম স্টার্চযুক্ত পদার্থে রূপান্তরিত করে লিভার এবং তুলে রাখে ভাঁড়ারের তাকে দরকারের সময়ে কাজে লাগানোর জন্যে। তারপর যখন 'গ্লুকোজ চাই—গ্লুকোজ চাই' রব ওঠে শরীরের মধ্যে, তখন ঝটপট এই গ্লাইকোজেনকেই গ্লুকোজে রূপান্তর করে চালান দেওয়া হয় রক্তের মধ্যে।

অতিরিক্ত পরিমাণে মিষ্টি খেয়ে উপেন অবিশ্যি আমার এই সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সাময়িক ভাবে বিকল করে দিতে পারে। আমি যখন ইনসুলিন :কোষে উৎপাদন·বাড়িয়ে দিই—:কোষে দহন ক্রিয়াকে হাওয়া দিয়ে আরও উসকে দিই। এই কারণেই বেশ খানিকটা চকলেট খেলে চট করে অনেকখানি শক্তিলাভ ঘটে। ঠিক উল্টোটা ঘটে যখন রক্তের চিনির পরিমাণ কমে যায়;

কমিয়ে দিই ইনসুলিন উৎপাদন— ফলে, নিভু-নিভু হয় কোষদের আগুন।

আমার সঙ্গে সম্পর্কিত অসুখ বিসুখের মধ্যে ডায়াবেটিস পয়লা নম্বর রোগ ঠিকই, এ ছাড়াও আরও কয়েকটা মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মত সমস্যায় ফেলি ডাক্তারদের। শরীরে অত্যন্ত অভ্যন্তর প্রদেশে থাকি বলেই অস্ত্রোপচারের সময়ে শল্য চিকিৎসকের ছুরী আমার প্রতিবেশী দেহযন্ত্রদের বাঁচিয়ে আমার গায়ে কোপ বসাতে হিমসিম খেয়ে যায়। (এমন একটা দিন ছিল যখন আমাকে কেটে বাদ দেওয়া মানেই জীবনের খাতা থেকে উপেনের নামটাই কেটে বাদ দেওয়ার সামিল ছিল—মৃত্যুকে এড়ানো যেত না। সে দুর্দিন অবশ্য এখন আর নেই। আমি ব্যতিরেকেই আলাদা ইনসুলিন আর এনজাইম দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে পারবে উপেন—অস্বস্তি হবে ঠিকই—তবে নাই মামার চাইতে কানা মামাও তো ভাল!) অসুবিধে আমার যাই হোক না কেন, অনেক সময়ে সাংঘাতিক রকমের পেটের ব্যথায় ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়ে উপেন—ব্যথাটা মনে হচ্ছে ছড়িয়ে পড়ছে পিঠের দিক থেকে। এই উৎপাতের মূল উৎস কিন্তু পিত্ত-থলির অসুখ অথবা যান্ত্রিক বাধা, পাকস্থলী বা গ্রহণীর আলসারে ফুটো হয়ে গেলে অথবা হার্ট-অ্যাটাকেও প্রায় এই রকমেই তীব্র যন্ত্রণা দেখা যায়। অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে হল ওজন কমে যাওয়া, উদরাময়, অবসাদ আর জনডিস।

আরেকটা হরবখৎ সমস্যা হল তীব্র প্যানক্রিয়াস-প্রদাহ। প্রদাহের কারণ কিন্তু অনেক—মাম্স্ (গলগণ্ড), প্রতিবেশী দেহযন্ত্র অস্ত্রোপচারের শল্য চিকিৎসকের ছুরীতে জখম হওয়া, ধমনীর রোগ, ক্রমান্বয়ে অ্যালকোহল পান। সবচেয়ে মামুলি যে কারণে আমি প্রদাহ রোগে ভুগি, সেটা কিন্তু আমারই নল আর কলের অব্যবস্থার দরুন। পিত্ত-থলি আর যকৃতের যে নিষ্ক্রমণ নলটি গ্রহণীতে গিয়ে মিশেছে, সেই একই নল দিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে আমাকেও। যকৃতের পিত্তি আমার নালীতন্ত্রের মধ্যে ঢুকে যায় এবং তাদের জখম কি নষ্ট পর্যন্ত করে দিতে পারে। অথবা ধরুন, পিত্তির পাথরে বন্ধ হয়ে গেল আমার নিষ্ক্রমণ পথ ; এনজাইমরা বাঁধযুক্ত জলাধারের মত জমা হতে হতে শেষ পর্যন্ত হজম করতে শুরু করে আমাকেই। এ অবস্থা বেশীদিন চললেই উপেনকে চিতায় উঠতে হবে। প্যানক্রিয়াসের তীব্র প্রদাহ মানেই ডাক্তারের কাছে জরুরী পরিস্থিতি—দেরী করলেই প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

অনেক রকমের টিউমারেও আক্রান্ত হই আমি, এদের মধ্যে সবচেয়ে

জঘন্য হল অ্যাডেনোমা—গ্ল্যাণ্ডের নিরীহ টিউমার —যে দুরাত্মার আবির্ভাবে অতিরিক্ত ইনসুলিন উৎপাদনে বাধ্য হই আমি। পিত্ত-থলির ব্যাধি আর পিত্তির নিষ্ক্রমণ-নালীতে তন্তুময় কাঠিন্য দেখা দিলেও কুপোকাৎ হই আমি।

অ্যাদ্দিন পর্যন্ত অবিশ্যি সামান্য একটু-আধটু হজমের গোলমাল ছাড়া বড় রকমের কোনো ফাঁপরে উপেনকে আমি ফেলিনি। উপেনের স্বভাবটাও তো লাগামছাড়া ঘোড়ার মত নয়—আহার এবং মদ্যপান—দুটোই মাত্রাতিরিক্ত নয়। এতেই আমি সুস্থ থাকি। এই অভ্যেস যদি বজায় রাখতে পারে উপেন, তাহলে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ওকে টের পেতে দেব না জীবনটাকে টিঁকিয়ে রাখার ব্যাপারে কতবড় ভূমিকা পালন করে গেলাম আমি এবং এই অজ্ঞতাটাই হবে ওর কাছ মস্ত আশীর্বাদ, বিরাট স্বস্তি।

৭

জনন তন্ত্র

জরায়ু

উদরের নিচের দিকে ঝুলছি আমি সন্ধিবন্ধনীর (লিগামেন্টের) দোলনায় ; গোলাপী রঙের পেশীময় একটা ছোট থলি—আকারে মোটামুটি নাশপাতির মত। ওজনে প্রায় দু'আউন্স—এক কথায় আমাকে বলা যেতে পারে, ডিমে তা দেওয়ার কক্ষবিশেষ। ঐ একটিমাত্র বর্ণনায় কিন্তু আমার সব কথা বলা হল না—বরং একটু অবিচারই করা হল আমার ওপর। কেন না, আমি যে কর্মটি অনুষ্ঠিত করতে সক্ষম, তাকে বলা যেতে পারে ব্রহ্মাণ্ডের চরমতম বিস্ময় ঃ অনেক কষ্টে দেখতে হয় এবং প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে, এমনি খান কয়েক কোষের ধাত্রীমাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় আমাকে তদ্দিন পর্যন্ত যদ্দিন না লক্ষ লক্ষ কোষের জটিলতায় পর্যবসিত হয় এরা এবং একটি নতুন মানব জন্ম নেয়। ভনিতা শুনেই আঁচ করে ফেলেছেন আমি কে। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই উমার জরায়ু।

নতুন প্রাণ যেখানে সৃষ্টি হতে চলেছে, এহেন ধাত্রীগৃহ নির্মাণ করার কাজটা মনে হতে পারে জলবৎ তরলম্। কিন্তু আসলে কাজটা যে কি ভয়াবহ রকমের জটিল এবং আমার পক্ষে কতখানি নৈরাশ্যজনক—তা কাকেই বা

বোঝাবো, কেই বা বুঝবে। প্রতিপদে মনে হয়, এই বুঝি হেরে গেলাম, বিফল হলাম, পরাভূত হলাম। আদতে কিন্তু কখনোই হই না এবং সেইটাই এই ব্রহ্মাণ্ডের বিপুলতম বিস্ময়। বয়ঃসন্ধিকাল থেকে শুরু করে মাসিক বন্ধ হওয়ার সময় পর্যন্ত, সুদীর্ঘকাল প্রতিমাসে গর্ভধারণ করার যাবতীয় অনুষ্ঠান

জরায়ু
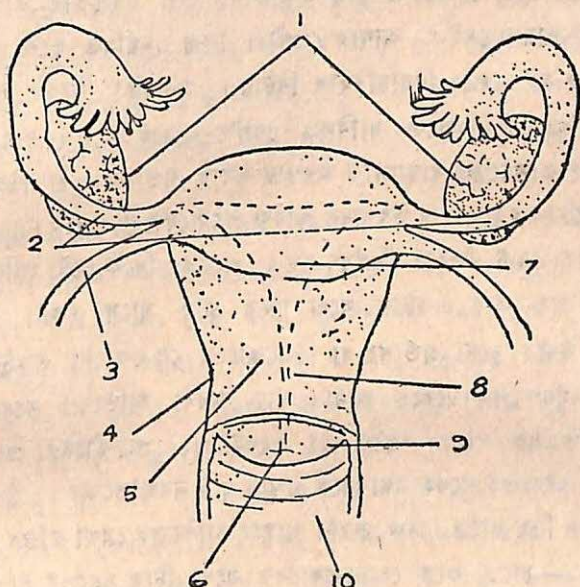
১। অণ্ডাশয় (ওভারিজ), ২। ফ্যালোপিয়ান টিউব্‌স্‌, ৩। সন্ধি-বন্ধনী; ৪। পেশীপ্রাচীর; ৫। জরায়ু; ৬। সারভিক্স (জরায়ুর ঘাড়); ৭। মধ্যের গহ্বর; ৮। জরায়ুর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী;

সুচারুভাবে সম্পন্ন করি—প্রস্তুত করি নিজেকে নতুন প্রাণকে ধারণ এবং পালন করার জন্যে। এই কাণ্ড ঘটে অথবা ঘটবে প্রায় চারশবার। তা সত্ত্বেও উমা সন্তানবতী হয়েছে মাত্র তিনবার।

চক্ষুস্থির করে দেওয়ার মত রাসায়নিক ক্রীড়াকর্ম চলে বিচিত্র এই প্রস্তুতিপর্ব অনুষ্ঠানকালে : নির্মিত হয় নবীন রক্তবাহদের এক সূক্ষ্ম জটাজাল,

জরায়ু

নবীন গ্রন্থিসমূহ, নবীন টিশু। উমার ইস্ট্রোজেন হরমোনের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে ইস্ট্রোজেনের আবির্ভাব ঘটে ওরই গর্ভাশয় অথবা ডিম্বকোষ (ওভারি) থেকে—আমার রক্ত-লাল, মখমল-মসৃণ আস্তরণ (এন্ডোমেট্রিয়াম) পুরু হয়ে ওঠে এবং গ্রান্থরাও স্ফীত হয়ে ওঠে নতুন প্রাণের অত্যাবশ্যক পুষ্টির জোগান দেওয়ার জন্যে। কালচক্রের মাঝামাঝি জায়গায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরও একটা রাসায়নিক ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়।

খেয়াল রাখবেন, আমি একটা শূন্যগর্ভ পেশীময় দেহযন্ত্র—আমার অভ্যন্তর প্রদেশে চায়ের চামচ ভর্তি এক চামচ জল খুব জোর রাখা যায়—তার বেশী জায়গা নেই। আমার পেশীরা কিন্তু নিয়মিত ছন্দে সঙ্কুচিত-প্রসারিত হয়েই চলেছে বিরামবিহীন নিষ্ঠায়। ফলবতী ডিম্বের পক্ষে এই সঙ্কোচন কিন্তু মারণ-ঘাতের সামিল। পেশীদের তাই ঢিলে দেওয়া দরকার। এই জন্যেই কালচক্রের মাঝামাঝি অবস্থায় উমার গর্ভাশয়রা বা ডিম্বকোষেরা প্রোজেসটেরন হরমোনের উৎপাদন আরম্ভ করে দেয় পুরোদমে।

আমার মোট তিনটে নির্গমণ পথ। ওপরের দিকে দুটো ফ্যালোপিয়ান টিউবের মুখ—যার একটার মধ্যে দিয়ে প্রতি মাসে একটা ডিম্ব এসে পৌঁছায় উমার দুটো গর্ভাশয় বা ডিম্বকোষের যে কোনো একটা থেকে। তৃতীয় নির্গমণ পথ রয়েছে আমার ঘাড় অথবা সার্ভিক্সের মধ্যে দিয়ে—খড়ের মত সরু পথ। সঙ্কীর্ণ এই পথেই পুং শুক্রকীটের প্রবেশ ঘটে গুটিগুটি এবং এই পথেই যথাসময়ে প্রস্থান ঘটে নবজাতকের। উমার গর্ভাশয়রা যখন ডিম্ব ছাড়ে, ঠিক তখনি আমার সার্ভিক্সের শ্লেষ্মা গ্রন্থির উৎপাদন যায় বেড়ে—যাতে করে স্রোতপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে সহজেই সাঁতার কেটে ডিম্বের কাছে পৌঁছে যায় শুক্রকীট। ফলবতী ডিম্বকে গ্রহণ করার উপযোগী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন জীবনকে লালন পালন করার উদ্যোগ পর্ব আরম্ভ করে দিই আমি। কিন্তু ফলবতী ডিম্ব এসে না পৌঁছোলে নতুন টিশু, গ্রন্থি এবং রক্তবাহদের ফেলে দেওয়ার দরকার হয়। আমিই তৈরী করি এদের, প্রতি মাসে ফলবতী ডিম্বকে রক্ষণাবেক্ষণ এবং লালন পালনের জন্যে—কিন্তু তিনি এসে না পৌঁছোলে এদের সবাইকে বিদায় নিতে হয় আমার ভেতর থেকে। ঋতুস্রাব আরম্ভ হয় উমার এবং ফিরে আসে পূর্বাবস্থা।

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় মুহূর্ত এসেছিল উমার প্রথম সন্তান

হওয়ার সময়ে। আমার গুণের যে অবধি নেই, তা দেখানোর সুযোগ পেয়ে ছিলাম তখন। ডিম্ব ফলবতী হয়েছে, কোষ বিভাজনও আরম্ভ হয়ে গেছে। ক্রমবর্ধমান কোষেদের খাদ্যের জোগান দিচ্ছে কেবল ডিম্বের পীতাংশ এবং তাও প্রায় শেষ হয়ে যায় ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে দিয়ে কোষসমূহের অলস পরিভ্রমণকালে—আমার কাছে এসে যখন পৌঁছোয়, তখন তাদের খাদ্যভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষিত। নির্ভরযোগ্য পুষ্টির উৎস এই সময়ে যদি না জোটে, অতি ক্ষীণ এই প্রাণকণার ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকারময়। আমি কিন্তু প্রস্তুত—যেমন প্রস্তুত ছিলাম এর আগেও বহু বার। মৃত্যু যখন সম্মুখে, তখন পুঁচকে শুঁড় বার করে ডিম্বটি আঁকড়ে ধরে আমার এনডোমেট্রিয়াম আস্তরণকে। ব্যস, আর কোনো ভয় নেই। উষ্ণ, নিরাপদ, আহার-জোগানদারের গৃহে এসে পৌঁছে গেছে ফলবতী ডিম্ব।

নবাগতা অতিথির চাহিদার কিন্তু শেষ নেই। খাই খাই ভাব উত্তরোত্তর বেড়েই চলে ন'মাস পর্যন্ত—দিনে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একমুহূর্তের জন্যেও বিরাম দেয় না—নিজেও নেয় না। ক্রমবর্ধমান এই চাহিদা মেটাতে এগিয়ে আসে তখন আমার সবচেয়ে আশ্চর্য, সবচেয়ে জটিল টিশু—প্লাসেন্টা (গর্ভের ফুল)। প্রথমে ক্ষুদে কণার মত নির্গত হয় ফলবতী ডিম্বের গা থেকে—বাড়তে বাড়তে শেষকালে গিয়ে দাঁড়ায় দু-পাউণ্ড ওজনের প্রায় সাত ইঞ্চি ব্যাসসম্পন্ন চাটুতে ভাজা ডিমের বড়ার আকার-সদৃশ দেহযন্ত্রে। দেখতে আহা মরি না হলেও ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত উমার সন্তানের ফুসফুস যকৃৎ, বৃক্ক আর পাচন-তন্ত্র হিসেবে কাজ চালিয়ে যায় শ্রীহীন এই প্লাসেন্টা।

শিশুর জীবন সূত্র কিন্তু নাভি-রজ্জু (যে নাড়ী দ্বারা গর্ভস্থ শিশু ফুলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।)—নাভি-রজ্জু পাঁচ ইঞ্চি থেকে চারফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। রজ্জুর মধ্যে থাকে দুটো ধমনী আর একটা শিরা : শিশুর দেহ থেকে আবর্জনার চালান যায় ধমনীর মধ্যে দিয়ে ফুল পর্যন্ত—সেখান থেকে মিশে যায় উমার রক্ত প্রবাহে। উমার বৃক্ক, যকৃৎ আর ফুসফুস গতি করে এই আবর্জনার।

উমার রক্ত থেকে পুষ্টি বহন করে আনে শিরাটা—আনে ভিটামিন, অক্সিজেন, খনিজপদার্থ, কার্বোহাইড্রেট, অ্যামিনো-অ্যাসিডসমূহ। প্লাসেন্টার

জরায়ু

মাকড়শার জালের মত মিহি আস্তরণটাই পরিস্রাবণের (ফিলট্রেসন) কাজ করে। এর মধ্যে দিয়েই চলে অতি সূক্ষ্ম বিনিময় ব্যবস্থা—কিন্তু আলাদা রেখে দেয় উমার রক্ত আর শিশুর রক্ত ; মিশতে দিলেই তো সর্বনাশ। দু-জনের রক্তের গ্রুপ তো দু'রকমের—একেবারেই বেখাপ্পা। মিশে গেলেই বিপর্যয় ঘটতে কতক্ষণ।

উমার শিশু যতই আয়তনে বাড়ে, ক্ষমতা বাড়ে আমারও। প্রথম মাসেই আমার ভাড়াটে মহাশয় ফলবতী ডিম্বের দশ হাজার গুণ বড় হয়ে যায়। তালে তাল মিলিয়ে বৃদ্ধি পায় আমার ক্ষমতা—শেষকালে যে আয়তনে পৌঁছোই তা আমার আদি আয়তনের চেয়ে পাঁচশগুণ বড়। পালটাতে থাকে আমার আকারও—নাশপাতি-আকার থেকে গোলক-আকার, সবশেষে ডিম্বাকার। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা, তা হল এই যে নিরতিসীম বলবৃদ্ধি ঘটতে থাকে আমার, নাটকীয়ভাবে আয়তন আর ওজনের দিক দিয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে আমার পেশীদের তন্তুরা, এই বৃদ্ধি না ঘটলে আমার ভাড়াটে মহাশয়ের ক্রমবর্ধমান আয়তনের চাপে ভেতর থেকে ফেটে চৌচির হয়ে যেতাম আমি—বিশেষ করে যখন হাত-পা-লাথি ছুঁড়তে শিখল সে। তখন মার খেয়েও হজম করতে পেরেছি পেশীদের আয়তন এবং শক্তি বেড়ে যাওয়ার ফলে, বাড়তি শক্তিটা কাজে লাগে নবজাতকের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ে—অতিমানবও তখন বেদম হয়ে পড়ে সেই একটানা ধকল সইতে না পেরে।

সাতমাস পর্যন্ত হামেশাই জায়গা বদল করেছে উমার বাচ্চা, তারপর হার মেনেছে মাধ্যাকর্ষণের কাছে। মাথাটা শরীরের অনুপাতে বেশী ভারী হয়ে যাওয়ার ফলে শতকরা ৯৬ ভাগ শিশুর ক্ষেত্রে যা ঘটে, এর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। মাথা নিচু করে থেকেছে দুরন্ত শিশু—জন্ম গ্রহণের পক্ষে যা আদর্শ অবস্থান। ভাড়াটের আকার আর আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার ধারে কাছে যারা পড়েছে, গুঁতিয়ে হটিয়ে দিয়েছি তাদের। চাপ সৃষ্টি করেছি উমার মূত্রাশয়ের ওপর, ফলে বেচারীকে ঘন ঘন কলতলায় ছুটতে হয়েছে। হজমের গোলমালও ঘটেছে—পাকস্থলী আর অন্ত্রের ওপর আমার চাপ ক্রমাগত বেড়ে চললে যা অবশ্যম্ভাবী।

ন' মাস নাগাদ উদর গহ্বরে বেশ খানিকটা জায়গা দখল করে বসলাম আমি। আমার কাজ তখন প্রায় শেষ। অপরিমেয় রূপে ক্ষুদ্র এক জলচর পরজীবীকে আমি স্বাধীন জীবন যাপনের উপযুক্ত সাত পাউণ্ড ওজনের

শিশুতে রূপান্তরিত করেছি।

তারপর একদিন গা-ঝাড়া দিলাম আমি। কেন যে ন' মাস ব্যাপী কুঁড়েমি কাটিয়ে তৎপর হতে চাইলাম, সে রহস্য আজও আমার কাছে অজ্ঞাত। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে লাগলাম ভাড়াটেকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে বার করে দেওয়ার শুভ কাজে। জন্মগ্রহণের চাঞ্চল্যকর নাটকে নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে তখন আমি তৈরী। প্রথম লক্ষ্য হল সার্ভিক্সের মুখ চওড়া করা ; আঙুলের ডগার মত সরু পথকে বাড়িয়ে পাঁচ ইঞ্চি ব্যাসের মত পথ করে নেওয়া যার মধ্যে দিয়ে বাচ্চার মাথা গলে যেতে পারে অনায়াসে। কাজটা সময়সাপেক্ষ, ক্লান্তিজনক এবং বিরক্তিকর ; তা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে বাড়িয়ে যাই আমার সঙ্কোচনের ধাক্কাকে যতক্ষণ না তা পৌঁছোয় দুই থেকে তিন মিনিটের ব্যবধানে—প্রতিটার ধাক্কা স্থায়ী হয় এক মিটনি পর্যন্ত।

আগাগোড়া অবশ্য বাচ্চার মাথা দিয়েই দুরমুশের মত পিটিয়ে সঙ্কীর্ণ পথকে প্রশস্ত করে যাচ্ছিলাম। আমার পেশী দিয়ে ১৫ পাউণ্ড ধাক্কা সৃষ্টি করা কিছু ব্যাপারই নয়। কিন্তু বাচ্চাকে বাইরে বার করার পক্ষে এ ধাক্কাও যথেষ্ট নয়। দরকার ২৫ পাউণ্ড চাপের ঠেলা। উমার উদরের পেশী আর মধ্যচ্ছদা (ডায়াফ্রাম) সাহায্য করল আমাকে বাড়তি ঠেলা দিয়ে। শেষ কালে বেরিয়ে গেল বাচ্চা।

ভাববেন না কিন্তু আমার কাজও ফুরোলো সঙ্গে সঙ্গে। বাড়ী সাফ করার ঝামেলো তো পোহাতে হবে আমাকেই। প্লাসেন্টা (ফুল) কে আর দরকার নেই, আগে তাকে তাড়ালাম ভেতর থেকে, তারপর মুখ খোলা রক্ত-বাহগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাদের মুখবন্ধ করলাম—রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করলাম এইভাবে।

অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সময়ে আমার ওজন ছিল দু-আউন্স। ১৬গুণ ওজন বেড়ে গিয়েছিল আমার। এখনকার ওজন দু-পাউণ্ড। দু-একমাস ব্যায়াম করে স্বাভাবিক ওজন ফিরিয়ে আনতে হয় আমাকে। তবে কি জানেন, উমার বয়স এখন ৪২—ঋতুস্রাব বন্ধ হতে চলেছে। আমার কাজ তখন ফুরোবে এবং সঙ্কুচিত বালিকা অবস্থার আয়তনে ফিরে যাবো আস্তে আস্তে।

উমার সারা জীবনের প্রায় বেশীর ভাগ সময়ে বিবিধ উপদ্রব সৃষ্টি

জরায়ু

করে যাব আমি। ওর শরীরের বহুসমস্যার মূল কেন্দ্র আমি, এইটুকু বলেই নিরাপদে থাকতে চাই। আমার সবচেয়ে সুবিদিত কষ্ট অবশ্য ডিসমেনোরিয়া—ঋতুস্রাবের সময়ে মোচড় দেওয়া যন্ত্রণার ডাক্তারী পরিভাষা। আমার আর একটা অস্বস্তিকর অবস্থা হল ফাইব্রয়েড্স্—বিভিন্ন আয়তনের সাদাটে বৃদ্ধি দেখা যায় আমার পেশীময় প্রাচীর বরাবর। বহু স্ত্রীলোকের মত উমারও ধারণা এগুলো ক্যানসার। কিন্তু আশংকাটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অমূলক। ২০০টি ফাইব্রয়েড কেসের মধ্যে একটিরও কম ক্ষেত্রে ফাইব্রয়েড থেকে ক্যানসার রোগের সৃষ্টি হয়।

আমার আস্তরণ যদি সঠিকভাবে না বাড়ে, অথবা প্রতিমাসে ঠিকমত ঝেড়েঝুড়ে নিজেকে সাফ রাখতে না পারি, তাহলেই অতিরক্ত অথবা অনিয়মিত রক্তস্রাব দেখা যায়। বহুব্যবহৃত অস্ত্রোপচারের অন্যতম একটি অস্ত্রোপচার দিয়ে এই অসুবিধেকে দূর করা যায়, অপারেশনটার নাম ডায়ালেটেশন আর ক্যুরিটাজ। পথ প্রশস্তকরণ এবং অস্বাস্থ্যকর বাড়তি টিশুকে চেঁচে বাদ দেওয়া। সার্ভিক্সের পথ প্রশস্ত করে নেওয়া হয় যন্ত্রপাতি দিয়ে—চামচের মত চাঁচনেওয়ালা যন্ত্র ঢুকিয়ে দেওয়ার মত পথ তৈরী করে নিতে হয়। বাড়তি টিশুকে চেঁচে ফেলে দিলেই বহু-ক্ষেত্রেই মুক্তি পাওয়া যায় কষ্টের খপ্পর থেকে।

স্তনের পরেই উমার ক্ষেত্রে ক্যানসারের অত্যন্ত সাধারণ আক্রমণস্থল হলাম আমি। কপাল ভাল বলেই আমার দু-জায়গার ক্যানসার (আস্তরণে আর সার্ভিক্সে) সাধারণতঃ চট করে নির্ণিত হয় এবং প্রাথমিক অবস্থায় রোগ ধরা পড়লে, শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী ক্ষেত্রে নিরাময়ও সম্ভব। অস্বাভাবিক রক্তস্রাব, বিশেষ করে চাল্লিশ বছর বয়েসের পর, আমার আস্তরণের ক্যানসারের লক্ষণ বলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে। অন্য কারণেও এ-রকম রক্তস্রাব হয় ঠিকই, কিন্তু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় উমা। আর একটু যদি হিসেবী আর বুদ্ধিমতী হয় তাহলে যেন বছরে একবার ডাক্তারকে দিয়ে দেখিয়ে নেয় ক্যানসার মরণ কামড় বসিয়েছে কিনা আমার সার্ভিক্সে।

অনেক উপকার করি আমি। কিন্তু তার পুরস্কার পাই না। বদ্‌নামের ভাগী হই কেবল উৎপাতগুলোর সৃষ্টি করে যাই বলে। ভারী অন্যায়। মনে রাখবেন, আমি অথবা আমার জাতভাইরা না থাকলে নিন্দুকদের কারোরই পৃথিবীর আলো দেখার সৌভাগ্য হত না।

অণ্ডাশয়

সংখ্যায় আমরা দুই। সন্ধিবন্ধনী অর্থাৎ লিগামেন্ট আমাদের ঝুলিয়ে রেখেছে উমার শ্রোণীচক্র অর্থাৎ পেলভিসের এপাশে আর ওপাশে। রঙ আমাদের সাদাটে, আকারে সাধারণতঃ বাদামের মত, লম্বায় সোয়া এক ইঞ্চি। দুজনে মিলে আমাদের ওজন এক আউন্সের চার ভাগের এক ভাগ।

চেহারার দিক দিয়ে আমরা কৌতূহলোদ্দীপক নই, আয়তনের দিক দিয়েও অতি নগণ্য। তা সত্ত্বেও আমি (উমার ডান দিকের অণ্ডাশয় আমি) আর আমার পার্টনার উমার দেহমন্দিরের সবচেয়ে নারীসুলভ অংশ। ওর জীবনে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় আমাদের ; ওর মেজাজ, ওর যৌনাবেগ, ওর মোটামুটি স্বাস্থ্য—এই সবকিছুর ওপর খবরদারি আর আর নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে যেতে হয় আমাদেরকেই। উমার এখনকার বয়স ৪২; কিন্তু বালিকা উমাকে নারীত্বের সিংহদ্বারে পৌঁছে দিয়েছিলাম আমরাই; বয়সকালে স্ত্রীজাতি যেরকমটি হওয়া উচিত, ঠিক সেইরকমটি করে ওকে গড়ে তুলেছিলাম আমরাই—শ্রীহীন এই অণ্ডাশয় অর্থাৎ ওভারি-রা।

বারো বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত—তার আগে অথবা পরেও হতে পারে—উমা ছিল কিন্তু যৌনসংক্রান্ত ব্যাপারে অপরিপক্ক, গেছো মেয়েদের মত দুর্দান্ত এবং সমতল বক্ষ বিশিষ্ট। তারপরেই সংকেত এল পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডের কাছ থেকে। যাদুকাঠির মতই হরমোনরা অবতীর্ণ হল আসরে—আমরাই সরবরাহ করলাম আশ্চর্য সেই সব হরমোনদের—উমার সারা শরীরের ভাস্কর্য গেল পালটে—নতুন করে মূর্তি খোদাই শুরু হল যেন। চওড়া হল শ্রোণীচক্র ; নিতম্বে আবির্ভূত হল মেদ ভরা গদি ; অঙ্কুরিত হল স্তন যুগল ; দেখা দিল তলপেটের নিম্নদেশে এবং অন্যান্য অঞ্চলে লোম ও কেশ ; যৌন-যন্ত্র সবদিক দিয়ে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে শুরু হল তখন থেকেই।

পরে কম-বেশী ৩৫টা বছর মাসে মাসে উমাকে জানান দিয়ে যাবো যে আমরা আছি ; ঘড়ির কাঁটার মত সুনির্দিষ্ট সময়ে ওর ঋতুমতী হওয়ার কালচক্রে অংশ নেব এবং নিয়ন্ত্রণও করব। উমার প্রথম বাচ্চা হওয়ার

সময়ে মানব-জীবনের মূল দুটি কাঁচা মালের একটি সরবরাহ করি তো আমরাই ; উপকরণটি কি বুঝিয়ে বলার দরকার নেই নিশ্চয়, আজ্ঞে হ্যাঁ— ডিম্ব। আর কয়েক বছর পরেই অবশ্য পাততাড়ি গুটোবো আমি আর আমার পার্টনার—সেই সঙ্গে অবসান ঘটবে উনার ফলবতী বছরগুলোর।

উমা যখন নেহাৎই বাচ্চা, আমি তখন একেবারেই কণামাত্র। অথচ ঐ কণিকা অবস্থাতেই আমার আর আমার পার্টনারের মধ্যে ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ ডিম্বকোষ—এত ছোট অবস্থায় যে মাইক্রোসকোপ ছাড়া দেখা সম্ভব নয়। দেহবিজ্ঞানীদের ভাষায় বিচিত্র এই ডিম্বকোষদের নাম উসাইট্‌স্ (oocytes) ; পরবর্তীকালে সন্তানদের গর্ভে ধারণ করতে হবে উমাকে, তাদের মধ্যে উমার বংশগতি বা উত্তরাধিকারও তো থাকবে—সংখ্যায় তারা হাজার হাজার ; ঐটুকু ডিম্বকোষদের প্রতিটির মধ্যে এরা প্রত্যেকেই উপস্থিত থাকে বাচ্চা বেলা থেকেই। উমা যখন ফলবতী বছরে পা দেবে, আমরা এই অণ্ডাশয়রাই তখন সুসম্পূর্ণ কমবেশী ৪০০টি ফলবতী হওয়ার মত ডিম্ব উৎপাদন করব—প্রায় আটাশ দিন অন্তর। মাত্র ৪০০টি ডিম্বই যদি পরিপক্ক হয়, উমার সারাজীবনে তাহলে ৫,০০,০০০ ডিম্বকোষের দরকারটা কী, এ প্রশ্ন নিশ্চয় মনে জাগছে আপনার। জবাবটা আমি দিতে পারব না। আশ্চর্য এই দেহযন্ত্র যিনি বানিয়েছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করুন। বহু ব্যাপারেই প্রকৃতি বড় বাড়াবাড়ি করে—হয়ত এটাও সেও সেই ধরনের বাড়াবাড়ি। অত্যন্ত অমিতব্যয়ী, নয় কী ?

পাঁচলক্ষ ডিমের মধ্যে থেকে ঠিক একটাকেই বেছে নেওয়া হয় যাতে করে তাকে পুরোপুরিভাবে বৃদ্ধি করে ফলবতী হওয়ার মত ডিম্বে রূপান্তরিত করা যায় ; কিন্তু বিশেষ এই ডিম্বকোষটাকে নির্বাচন করা হয় কিভাবে? মশায়, জবাবটা দিতে পারলে আপনার চাইতে বেশী খুশী হতাম আমি—কিন্তু পারছি না বলে ক্ষমাঘেন্না করে নেবেন। তবে হ্যাঁ, কি-কি ঘটে যায় তার একটা মোটামুটি চিত্র আপনাকে উপহার দিতে পারি এবং সেই মোটামুটি চিত্রটাই আপনাকে তাজ্জব করার পক্ষে যথেষ্ট। ঋতুচক্রের গোড়ার দিকে ছোট্ট ছোট্ট ফিনকির আকারে FSH নামে একটা হরমোন ক্ষরণ করতে থাকে পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড। FSH মানে ফলিকুল্ স্টিমুলেটিং হরমোন। অর্থাৎ ফলিকুল নামক ছোট্ট থলিকে যে হরমোন উদ্দীপ্ত করে ক্ষরণ ঘটায়। বস্তুটার কার্যকরী শক্তি যে কতখানি তা ধারণাতে আনাও কঠিন। সারাদিন একআউন্সের দশলক্ষ

ভাগের একভাগ ক্ষরিত হলেও চোখ ধাধানো ঘটনা-শৃঙ্খলের সূচনা ঘটে।

FSHয়ের প্রভাবে আমার বেশ কয়েকটা সুপ্ত ডিম্বকোষ জাগরিত হয়। জলীয় পদার্থে ভর্তি একটা ছোট্ট থলি (ফলিকল্) দেখা যায় প্রতিটি-বর্ধমান কোষকে ঘিরে এবং এর ফলে যে বুদবুদ আবির্ভূত হয়—তার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং মাথা চাড়া দিয়ে ঠেলে উঠতে থাকে আমার বাইরের দিকে।

অণ্ডাশয়
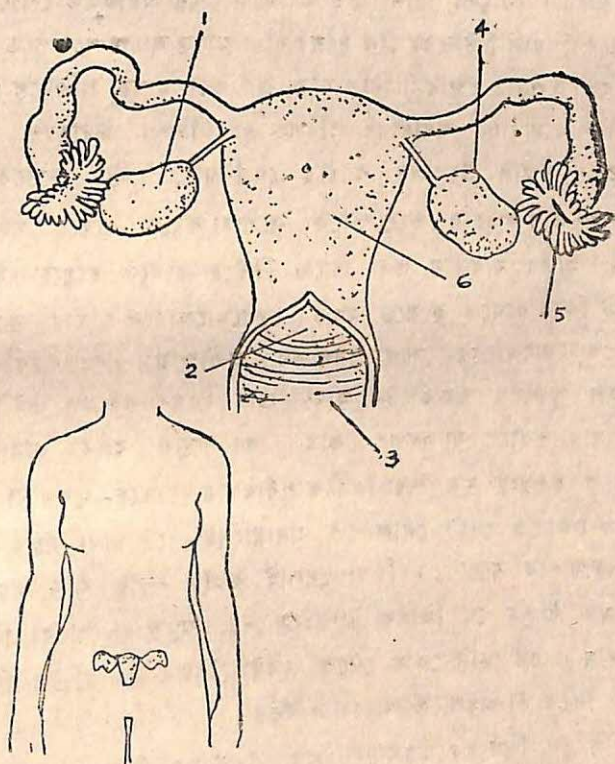
১। অণ্ডাশয়; ২। সারভিক্স (জরায়ুর ঘাড়); ৩। যোনি; ৪। সুসম্পূর্ণ ফলিকল্ (ছোট্ট রসক্ষরণকারী থলি); ৫। ফ্যালোপিয়ান টিউব; ৬। জরায়ু,

একটা বুদবুদই ঠেলে উঠবে শেষ পর্যন্ত (ব্যতিক্রম ঘটে তখনি যখন অভিন্ন-নয় এইরকম বহু সন্তানের জন্ম দিতে চলে উমা)। প্রায় হপ্তা ছুয়েকের মধ্যে মার্বেল-গুলি আয়তনে কোস্কার আকারে বুদবুদটা ঠেলে ওঠে আমার উপরি-ভাগে—আমার এক চতুর্থাংশ তখন ঐ একটা বুদবুদই। ঠিক এই সময়ে পিটুইটারী থেকে ফিনকি দিয়ে ক্ষরিত হয় লিউটিনাইজিং হরমোন নামে একরকম হরমোন যার প্রভাবে টিশুর মত ফিনফিনে যে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীটি ফলিকল্‌টিকে মুড়ে রেখেছে—সেটি ফেটে যায়। চুঁয়ে বেরিয়ে আসে ভেতরকার বস্তু এবং জলীয় পদার্থের বন্যা তরঙ্গে হু-উ-উ-স করে ভেসে যায় পরিপক্ক ডিম্বটি। ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে দিয়ে জরায়ুতে পৌঁছোনোর জন্যে ফ্যালোপিয়ান টিউবের ঠিক মুখের মধ্যে আস্তে আস্তে খসে পড়ে ডিম্বটি এবং ফলবতী হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে যাত্রা শুরু করে জরায়ু অভিমুখে।

সত্যিই একেবারে অসাধারণ পরিপক্ব এই ডিম্ব। উদাহরণ স্বরূপ, উমার প্রথম সন্তান উৎপাদন করেছে যে ডিম্বটি, সৃষ্টির নাটকে নিজ ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে সুদীর্ঘ বিশ বছর, বংশগতির যাবতীয় তথ্য তাকে জিইয়ে রাখতে হয়েছে এই বিশটি বছরে, টিঁকিয়ে রাখতে হয়েছে ২৩টি ক্রোমোজোমকে স্বামীর শুক্রকীটে ২৩টি ক্রোমোজোমের সঙ্গে মিলনের প্রতীক্ষায়। নরদেহের ক্ষুদ্রতম কোষ হল পুরুষের শুক্রকীটের মাথা—তার ২৫গুণ বড় হল এই পরিপক্ক ডিম্ব, উমার শরীরে যা বৃহত্তম কোষ। তা সত্ত্বেও বলব আমার ডিম্ব দৃষ্টিগোচর হওয়ার মত অবস্থার ঠিক পূর্বাবস্থায় রয়েছে—কেন না এরকম বিশ লক্ষ চকচকে ছোট্ট গোলককে অনায়াসেই পুরে রাখা সম্ভব একটি মাত্র অঙ্গুস্তানার মধ্যে (দরজিরা সেলাই করার সময়ে আঙুলের ডগায় টুপির মত ধাতুর যে জিনিসটি পরিয়ে নেয়, অঙ্গুস্তানা অথবা থিম্‌ব্‌ল তারই নাম)। এত ছোট্ট কোষ থেকে একটা শিশুর মত জটিল জিনিসের সৃষ্টি হয় কিরে তা ধারণাতে আনাও কষ্টকর।

আমি যে ডিম্বদের উৎপাদন করি, উৎকর্ষের বিচারে তারা কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। উমার বয়স পনেরো না হওয়া পর্যন্ত ডিম্বদের পরি-পক্ক হওয়ার ক্ষমতা এবং ফলবতী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। এমন কি ওর যখন তুঙ্গে-ওঠা বয়স—মোটামুটিভাবে বিশ থেকে তিরিশের মধ্যে—তখনও আমার কীর্তিকাহিনী সম্পূর্ণতায় পৌঁছোয়নি। প্রকৃতপক্ষে

সন্তানধারণের বয়সে পৌঁছোনোর পর গড়পরতা হিসেবে দেখা গিয়েছে, একজন নারীর শতকরা ২০ থেকে ৩০টি ডিম্ব ফলবতী হওয়ার পর সঠিকভাবে পরিপূর্ণতালাভে অক্ষম হয়, এবং হয় কোনো ত্রুটির জন্যে বাতিল হয়ে যায়, নয়তো দেহেই শোষিত হয় অথবা গর্ভপাত ঘটে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো নারীর ডিম্বদের উৎকৃষ্টতাও হু-হু করে হ্রাস পেতে থাকে। যেমন ধরুন না কেন উমার এই বিয়াল্লিশ বছরে যদি মা হওয়ার সাধ হয় তা হলে যে সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হবে তার বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তিরিশ বছর কি তারও কম বয়েসের সন্তানের চেয়ে অনেক বেশী। তা সত্ত্বেও, স্বাভাবিক সন্তান-জন্মের প্রবণতাটাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে অন্য সব কিছুর ওপর।

ডিম্ব নিয়ে অনেক কথাই তো বলা হল—এবার ক্ষ্যামা দেওয়া যাক। এর মতই গুরুত্বপূর্ণ, এমন কি এর চাইতেও ঢের বেশী গুরুত্বপূর্ণ অনেক কর্তব্যও করতে হয় আমাকে। হরমোন উৎপাদনক্ষম গ্ল্যাণ্ড আমি। আমার উৎপাদিত হরমোনের ওপর জীবন নির্ভর করে না ঠিকই, কিন্তু জীবনের স্বাভাবিকতা নির্ভর করে। প্রথমেই ধরুন না কেন বেশ কয়েকটা ইসট্রোজেন-কে উৎপাদন করতে হয় আমাকে—প্রত্যেকটা রাসায়নিকভাবে পরস্পর সম্পর্কিত। এরা না থাকলে সমতল-বক্ষ এবং পুঁচকে আকারেই থেকে যেতে হত উমাকে, যৌন যন্ত্রগুলিও থাকত ছোট্ট এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থায়।

নারী দেহের সবচেয়ে নারীত্বসম্পন্ন দেহযন্ত্র আমরা—এই অণ্ডাশয়রা, তা সত্ত্বেও অবাক হবেন আমাদের আরও একটা ক্ষমতা শুনলে। উমার স্বামীর অণ্ডকোষে টেসটোসটেরোন নামে যে পুং হরমোনটি উৎপাদিত হয়ে চলেছে—উমার দেহমন্দিরে সেই হরমোনটিকেও উৎপাদন করি আমরা। অদ্ভুত, নয় কী? বিশেষ এই হরমোনের উৎপাদন যদি লাগাম ছাড়া হয়—নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলেই উমার কণ্ঠস্বর হবে ভারী। দাড়িও গজাবে। অতি চমৎকার ভাবে এ সমস্যার সমাধান করি আমরা, এই অণ্ডাশয়রা: পুং হরমোনকে ইসট্রোজেনে রূপান্তরিত করি। সোজা সমাধান, কি বলেন?

আমাদের পিলে-চমকানো কাণ্ডকর্মের আরও একটু শুনে রাখুন: প্রতিমাসে কার্যতঃ একটা সূক্ষ্ম-জটিল নতুন হরমোন কারখানা নির্মাণ করি আমরা। লিউটিনাইজিং হরমোন ফলিকলটিকে ফাটিয়ে দেওয়ার পরেই ডিম্বটি অগ্ন্যুৎপাতের লাভাস্রোতের মধ্যে দিয়ে যেন বেরিয়ে যায়। সঙ্গে

সঙ্গে কাজ বেড়ে যায় এই লিউটিনাইজিং হরমোনের। চর্বিযুক্ত হলদেটে এক-রকম বস্তু ভর্তি কোষ দিয়ে আমার জ্বালামুখটা ভরাট করে দেওয়ার জন্যে উদ্দীপ্ত করে জ্বালামুখকেই। নতুন এই গ্ল্যাণ্ডটার নাম কর্পাস লিউটিয়াম। নতুন একটা হরমোন উৎপাদন করে এই গ্ল্যাণ্ড এবং উমার রক্তপ্রবাহে সরাসরি মিশিয়ে দেয় এই হরমোনকে।

হরমোনটার নাম প্রোজেসটেরন। এর মূল লক্ষ্যস্থল হল উমার জরায়ু। প্রোজেসটেরনের প্রভাবে প্রশমিত হয় জরায়ুর ছন্দময় সঙ্কোচন, পুরু হয়ে আসে দেওয়াল এবং গড়ে ওঠে নতুন রক্তবাহ-জালিকা। ফলবতী ডিম্বের জন্যে একটা বাসা এবং আহার—এই দুটিরই ব্যবস্থা হয়ে যায় এই সঙ্গে। এরপর যদি উমা গর্ভবতী না হয়, তাহলে শুকিয়ে গিয়ে মারা যায় করপাস লিউটিয়াম।

আমার ইসট্রোজেন আর প্রোজেসটেরন উৎপাদন যাতে বিঘ্নিত অথবা ব্যাহত না হয় সে দিকে খর নজর রাখি আমি এবং হুঁশিয়ার হয়ে নিয়ন্ত্রণ করে যাই এই দুটির উৎপাদন। নিয়ন্ত্রণ যদি না করি এবং যদি এরা অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় খামখেয়ালী হয়ে ওঠে, তাহলে অনেক ধরনের উৎপাতের করলে পড়বে উমা—এদের মধ্যে কিছু শারীরিক, কিছু মানসিক (আবেগ-সম্পর্কিত)। দেহে জল জমতে পারে, পা ফুলো ফুলো হয়ে উঠতে পারে। ঋতুমতী হওয়ার সময় এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ খিটখিটে হয়ে উঠতে পারে, ভয়কাতুরে হতে পারে, মুষড়ে পড়তে পারে, সবসময়ে দুর্ঘটনায় পড়ার দুশ্চিন্তায় থাকতে পারে। হরমোনের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্যে বড়ি সুপারিশ করেন ডাক্তাররা।

৪০ ৫০ বছরে উপনীত হলেই উমার ঋতুবন্ধ হওয়া আরম্ভ হবে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা অণ্ডাশয়রা কুঁচকে এতটুকু হয়ে ফিরে যাব সন্ধি-বয়েসের প্রাক্কালে যে-আয়তনে ছিলাম, সেই আয়তনে। দারুণ ভাবে কমে আসবে হরমোন উৎপাদনও। যেই বন্ধ হবে আমাদের ইসট্রোজেন সরবরাহ, সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটতে পারে—নাও ঘটতে পারে। মুখে গরম আঁচ অনুভব করতে পারে উমা, শিথিল থলথলে হয়ে উঠতে পারে স্তন-যুগল। বেশ কয়েক যুগ ধরে আমাদের ইসট্রোজেন উমার ধমনীতে চর্বি জমতে দেয়নি—ওর বয়সী পুরুষদের ক্ষেত্রে যে সম্ভাবনা খুবই এবং করো-নারী হার্টের অসুখও চল্লিশগুণ বেশী। উমাকে কিন্তু এতবছর এই বিপর্যয়

থেকে আগলে রেখে দিয়েছিল ইসট্রোজেন। ঋতুবন্ধ হওয়ার পর থেকেই করোনারী হার্টের অসুখে পড়ার সম্ভাবনাটা পুরুষদের মতই সমান হারে-দেখা দেবে উমার ক্ষেত্রেও।

চামড়া শুকিয়ে যেতে পারে, পেশীও শক্ত হতে পারে। ওসটিওপোরোসিস নামে একটা বিটকেল রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পেতে পারে। খটমট নামের এই রোগটার বাংলা মানে হওয়া উচিত হাড়-মড়মড়ি ব্যায়রাম—কেন না হাড়গুলো ভঙ্গুর হয়ে যায়। পা পিছলে আলুর দম হলে আগে যেখানে শুধু কালসিটের ওপর দিয়ে ফাঁড়া কেটে যেত, এখন সেখানে কোমরের হাড়টাই হয়ত যাবে ভেঙে। এই সব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কিছু অথবা সবগুলোই হয়ত বেমালুম এড়িয়ে গেলেও যেতে পারে উমা। বহু নারীই যায়। যদি না যেতে পারে এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ারা উৎপাতের সৃষ্টি করে, তাহলে ডাক্তাররাই এমন পিল খাওয়ার প্রেসক্রিপসন দেন যা খেলে যে-হরমোন অভাবে এই বিপত্তি তার পুনঃস্থাপন ঘটে।

আমার সবচেয়ে ভয় ক্যানসারকে। অণ্ডাশয়ের প্রাথমিক ক্যানসার প্রায় নীরবে সর্বনাশ করে যায়, লক্ষণ পর্যন্ত প্রকাশ পায় না এবং স্বাভাবিক ভাবে শ্রোণীচক্র পরীক্ষাতেও রোগ ধরা যায় না। শ্রোণীচক্র অঞ্চলে জট-পাকানো পিণ্ডাকারে যখন এর অস্তিত্ব ধরা পড়ে, তখন সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে—সুরাহার পথ প্রায় থাকে না বললেই চলে। ক্যানসারের আক্রমণ যদিও যে কোনো বয়সেই সম্ভব, তাহলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এ রোগের আবির্ভাব ঘটে ৪৫-৬০ বছরের মধ্যে। তা সত্ত্বেও অযথা উমাকে আতংকিত করতে চাই না। সৌভাগ্যক্রমে, অণ্ডাশয়ের টিউমার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মামুলি টিউমার—ক্যানসার নয়। সহজেই নিরাময় যোগ্য।

আমার বিচিত্র কাহিনীর শেষ এইখানেই। উমার জীবনে মুখ্য ভূমিকায় দাপটের সঙ্গে কর্তব্য করে গেলাম আমি। সন্তান চেয়েছিল উমা—পেয়েছে আমার ডিম্বদের কাছে, ওর শরীর এবং মনের সুস্বাস্থ্যের জন্যেও দায়ী আমার হরমোনেরা। আর কয়েক বছর পরেই পেন্নাম ঠুকে বিদায় নেব রঙ্গমঞ্চ থেকে, শেষ হবে নতুন নতুন মানুষ উৎপাদনের কঠিন কর্তব্য।

স্তন

একালের লোকের ধারণা আমি মেয়েদের অহং চরিতার্থ করেই খালাস, প্রসাধন সামগ্রীর চাইতে সামান্য কিছু বেশী কৃতিত্বটুকুর আমার পাওনা—তার বেশী নয়। অনুগ্রহ করে শুনে রাখুন, আমি কিন্তু তার চাইতেও অনেক বেশী কৃতিত্বের দাবী রাখি। আমার অস্তিত্বটা কি জন্যে জানেন? যে রাসায়নিক পরিবর্তনকে প্রায় অলৌকিক পর্যায়ে ফেলা যায় এবং যা আজও একটা হেঁয়ালি বললেও চলে—আমি সেই রাসায়নিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। আজ্ঞে, হ্যাঁ। একটুও বাড়িয়ে বলছি না। জানেন আমি কি করতে পারি? রক্তকে দুধে পরিণত করতে পারি।

এইবার ঠিক ধরেছেন। উমার স্তন আমি। অধিকাংশ মেয়েদের ক্ষেত্রে যা দেখা যায়, উমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। মানে, বাম স্তনটি ডান স্তনের চাইতে ঈষৎ বড়। এমন একটা দিন ছিল যখন মনুষ্যজাতির অস্তিত্বটাই নির্ভর করত আমার ওপর। কেন না, উমার আদিম স্ত্রীজাতির কাছে গর্ভবতী হওয়াটা ছিল নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার, একটার পর একটা শিশু পয়দা হয়েই গেছে বিরামবিহীনভাবে। শিশুকে গর্ভে ধারণ করার বছরগুলি থেকে আরম্ভ করে গর্ভবতী হওয়ার বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পরেও প্রায় একটানাভাবে দুগ্ধ উৎপাদন করে গেছে স্তনযুগল। যার মা মারা গেছে, সেই শিশুকেই বুকে নিয়ে মাই দিতেই বুড়ি দিদিমা ঠাকুমাদের বুকে দুধ এসে যেত।

আসলে কি জানেন, অত্যন্ত উন্নত ধরনের এবং নিরতিসীম জটিল ধরনের একটা ঘর্ম-গ্রন্থি ছাড়া কিছুই নই আমি। উমার জন্মের পর প্রথম কয়েকটা দিন আমি সক্রিয় ছিলাম। ওর মায়ের হরমোন দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে ফোঁটা কয়েক 'ডাকিনী দুগ্ধ' উৎপাদন করেছিলাম আমি। [জন্মের পর উপেনের স্তনেও এই দুধ এনে দিয়েছিলাম আমি।] তার পরেই ক্ষীণ হতে হতে ক্ষীণতম হয়ে ফুরিয়ে গেল হরমোনের প্রভাব—আমিও আরম্ভ করলাম কুম্ভকর্ণের নিদ্রা।

উমার বয়স বারো না হওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়েই ছিলাম আমি। তার পরেই ফের খেল্ আরম্ভ হয়ে গেল হরমোন যাদুকাঠির। পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটল ওর অণ্ডাশয়ের এবং সেখানকার হরমোনদের খোঁচা খেয়ে আমিও বাড়তে লাগলাম হু-হু করে। আমার সবটাই প্রায় চর্বিতে ভর্তি। সেই চর্বিই জমতে শুরু হল আমার মধ্যে। ফুলতে লাগলাম তখন থেকেই। বেড়ে উঠল স্তনবৃন্ত। স্তনবৃন্ত ঘিরে চালচিত্তিরের মত যে উজ্জ্বল মণ্ডল, তারও রঙ গাঢ়তর হতে শুরু করেছিল এই সময় থেকে।

স্তন
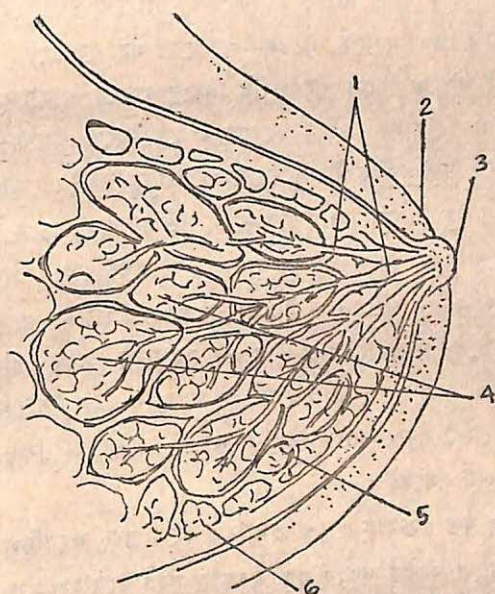
১। দুগ্ধনালী; ২। আরইওলা (স্তনবৃন্তের চারপাশের রঙযুক্ত অঞ্চল); ৩। স্তনবৃন্ত; ৪। গ্রন্থিসমূহ (অ্যালভিওলি);

আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবয়ব হল আমারই গ্রন্থির কাঠামো। সবশুদ্ধ সতেরোটা দুগ্ধ উৎপাদনকারী সংস্থা আছে আমার—প্রত্যেকেই স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং স্বাধীন। কোনো স্ত্রীলোকের থাকে বেশী—কারও কম। প্রত্যেকটার আকার অনেকটা রসালো বেরীফলের-ঝোপের মত। বেরী বলতে আমি

বোঝাচ্ছি আমার হাজার হাজার লাখ লাখ অ্যালভিওলিকে—যাদের সাদা চোখে দেখা যায় না—অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখতে হয়। চোখে দেখা যায় না এমনি অদৃশ্য দুগ্ধকণাদের এরা উৎপাদন করে চলে বিরামবিহীনভাবে এবং সেই দুগ্ধকণা শাখা প্রশাখার মত ছড়িয়ে থাকা নালী পথের মধ্যে দিয়ে এসে জড়ো হয় মূল কাণ্ডের মধ্যে। সতেরোটা কাণ্ড একসঙ্গে মিলিত হয় আমার স্তনবৃন্তে। বড় সূক্ষ্ম, বড় পলকা এদের কাঠামো—চর্বির স্তর দিয়ে আগলাই আমি—চর্বির বহিরাবরণের পাহারা থাকে বলেই এত সুরক্ষিত থাকে এরা। এ ছাড়াও আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধনের ফলে একত্র-সংলগ্ন থাকি আমরা—সংযোগকারী কলাতন্তুরাই বেঁধে রাখে আমার অবয়বদের। উমার বক্ষ প্রাচীরে ফিতের বাঁধনে যেন সেঁটে থাকি—আধুনিকাদের বক্ষবন্ধনী বলতে পারেন—বাইরের নয়, ভেতরে

হরমোনরাই বলতে গেলে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করছে আমাকে। ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার সময় থেকেই এরাই আমাকে ফোলাতে থাকে— অধিকতর সংবেদনশীল হয়ে উঠি এই হরমোনদের তৎপরতার ফলেই। আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত এসেছিল উমার প্রথম গর্ভধারণের সময়ে। গর্ভফুলের হরমোনরা ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল আমার। জানেনই তো, শিশুকে মায়ের সঙ্গে জুড়ে রেখেছে এই গর্ভফুল—সাঁকো বলতে পারেন—মা আর শিশুর মধ্যে। ইসট্রোজেন হরমোনের ঠেলায় ওর দুগ্ধনালী তন্ত্রে সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছিল। এই সঙ্গে প্রোজেসটেরন হরমোন এসে টসটসে করে তুলতে লাগল আমার বেরী সদৃশ অ্যালাভিওলিদের। ওদের যা কিছু বাড় দেখা গিয়েছিল, তা এই সময়েই।

সূক্ষ্মজালের মত রক্তবাহ তন্ত্রও প্রসারিত হতে শুরু করেছিল এই সময়ে। আমার উপরিভাগে নজরে পড়ার মত অবস্থায় ফুটে উঠেছিল নীল-নীল শিরা। দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল আমার ওজন। সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী ঘরদোর পরিষ্কারের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলাম মহা সমারোহে। এই সময়ের আগে পর্যন্ত কঠিন কোষজাতীয় পদার্থে ঠাসা থাকত আমার অ্যালভিওলি। এদের গলিয়ে দুধের জায়গা বার করার দরকার হয়ে পড়েছিল, উমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন শুরু করেছিল নতুন একটা হরমোন : নাম তার প্রোলাকটিন, উৎপাদন চালিয়ে গিয়েছিল পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড উমার মস্তিষ্কের তলায় দিকে। অত্যাশ্চর্য এই

হরমোনের দৌলতেই যাত্রাপথে পা বাড়িয়েছিল আমার দুধ।

প্রথমে শুরু করেছিলাম কোলোসট্রাম নামে হলদেটে জলের মত একরকম পদার্থ উৎপাদন করে—একই সাথে উৎপাদন আরম্ভ করেছিলাম আমি এবং আমার পার্টনার। অচিরেই কিন্তু আরম্ভ করেছিলাম খাঁটি দুগ্ধউৎপাদন—দিনে প্রায় এক পাঁইট বোতল পরিমাণে। নিখুঁত এই খাদ্যটি উৎপাদন করতে গিয়ে বহু গ্যালন রক্তকে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে প্রতিদিন। রক্ত থেকে গ্লুকোজ অথবা রক্তের চিনিকে তুলে নিয়েছে আমার অ্যালভিওলি। এই গ্লুকোজকেই ল্যাকটোজ এবং আঁতুড়ে শিশুর পক্ষে গ্রহণ যোগ্য চিনিতে রূপান্তরিত করেছে আমার এনজাইমেরা—কেমিষ্ট হিসেবে যারা অনন্য সাধারণ প্রতিভার অধিকারী এবং যাদের জুড়িদার আজও পাওয়া যায়নি।

একই কাণ্ড ঘটেছে অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্ষেত্রেও। ছানা এবং অন্যান্য জটিল দুগ্ধ প্রোটিনদের ইমারত তৈরী হয়েছে যে ইঁট দিয়ে—এই অ্যামিনো অ্যাসিডরাই হল তারা। টিশু মেরামতির কাজে এবং দেহ বৃদ্ধির অত্যাবশ্যক উৎপাদন হিসাবে যে ইঁট রূপী অ্যামিনো অ্যাসিডদের না হলেই নয়—এরা তারাই। বিস্তর পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে চর্বিকেও। প্রবাহমান রক্তপ্রবাহের মধ্যে থেকে খনিজ পদার্থদের তুলে নিয়েছে অ্যালভিওলি—বিশেষ করে তুলেছে ক্যালসিয়ামকে হাড় নির্মাণের জন্যে, ভিটামিনকে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য, এবং অ্যান্টিবডিদের শিশুদেহে ভাইরাস সংক্রমণ এবং আন্ত্রিক অসুখ বিসুখের ঝুঁকি কমিয়ে আনার জন্য।

স্তনবৃন্তের চারপাশের গোলাপী মণ্ডলের রঙ যে আস্তে আস্তে গাঢ় হচ্ছে এবং জায়গাটা বেশ পুরু হয়ে উঠছে—উমা নিজেও তা লক্ষ্য করেছিল বৈকি। তৈলাক্ত করার নতুন নতুন গ্রন্থিদের আবির্ভাব ঘটেছিল সেখানে যাতে যন্ত্রণাদায়ক ফাট না ধরে স্তনবৃন্তে। আমার এই স্তনবৃন্তে যে-সব টিশু অর্থাৎ কলাতন্তু আছে, তাদের ধর্মই হল সিধে থাকা। বাচ্চাকে বুকে চেপে ধরলেই কঠিন হয়ে ওঠে এই টিশুরা, চেপে ধরতে সুবিধে হয় ক্ষুধার্ত শিশু-মুখের। চোষণের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া আসে ভেতর থেকে এবং সেজন্যে পুরো কৃতিত্বটা প্রাপ্য আমার কৌতূহলোদ্দীপক গঠন প্রণালীর। স্তন-বৃন্তের ঠিক তলাতেই ছোট ছোট সিসটার্নের মত দুধ ভর্তি অবস্থায় তৈরী থাকে ছড়িয়ে থাকা দুগ্ধ-বৃক্ষ—টাটকা দুধ, ঠোঁটে চেপে টানলেই মুখ ভরে যায় সঙ্গে সঙ্গে,

স্তন

শান্ত হয় ক্ষিদের জ্বালা।

দুগ্ধ সরবরাহের এই প্রাথমিক সঞ্চয় কিন্তু নিতান্তই সামান্য চাহিদার তুলনায়, ফলে অচিরেই শূন্য হয় ভাঁড়ার। কিন্তু আমার স্তনবৃন্তে জালের মত ছড়িয়ে রয়েছে বিস্তর সংজ্ঞাবহ স্নায়ু (সেনসরি নার্ভ)। এদের মধ্যে দিয়েই খবর চলে যায় বহু দূরস্থিত উমার পিটুইটারীতে। তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যে সাড়া দিয়েছে পিটুইটারী, রক্তপ্রবাহের মধ্যে ঢেলে দিয়েছে অক্সি-টোসিন হরমোনকে। অ্যালভিওলিতে এই উপাদানটি পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে ওদের মাকড়শার জালের মত মিহি পেশীর প্রাচীর সঙ্কুচিত হয়েছে, চেপে বার করে দিয়েছে দুধকে। এরপর থেকেই শিশুকে আর চুষতে হয়নি—স্রেফ পান করেছে।

যে দুধ আমরা উৎপাদন করি, তার সৃষ্টিই হয়েছে শিশুর প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে। শিশুর যা-যা দরকার, তার সব থাকে এই দুধে। এই জন্যেই স্ত্রীজাতির কাছে আমার আবেদন, পারলে নিজের বাচ্চাদের যেমন বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করে। মানব-জীবনের এই পর্যায়ের চাহিদা মিটোতে গরুর দুধকে সেইভাবে তৈরী করে নেওয়া যায় ঠিকই, তা সত্ত্বেও মায়ের দুধের বদলি কখনোই হতে পারে না—কক্ষনো না।

বুকের দুধ খাওয়ানোর আরও কয়েকটা সুবিধে আছে। উমার জরায়ুকে তালেতালে সঙ্কুচিত হতে উদ্দীপ্ত করে। ফলে, যে মোড়ক একটি শিশুকে আবৃত করে রেখে দিয়েছিল এতদিন, সুবৃহৎ সেই মোড়কটিই স্বাভাবিক নাশপাতি সাইজে এসে দাঁড়ায় দেখতে দেখতে। সঙ্কোচনের ফলে রক্তক্ষরণের বিপদও হ্রাস পায় এবং উমা পায় যৌনতৃপ্তির মৃদু অনুভূতি।

দুগ্ধদানের শুরুতে আমি আর আমার পার্টনার দুজনে মিলে মিশে প্রায় একপাঁইট দুধ উৎপাদন করে যাই—সাত পাউণ্ড ওজনের বাচ্চার পক্ষে যা যথেষ্ট। কিন্তু বাচ্চা যতই বাড়তে থাকে, আমার দুধের উৎপাদনও তত বাড়তে থাকে—কোনো কোনো মায়ের ক্ষেত্রে দিনে পাঁচ পাইট পর্যন্ত দুধ হতে থাকে। দুধের উপাদান সমূহের মিশ্রণের মাত্রাও পালটে যায়। হাড় আর রক্ত তৈরীর জন্যে তখন বেশী করে দরকার ক্যালসিয়ামের—দুধের ক্যালসিয়ামের পরিমাণও বেড়ে যায় তাই চড়চড় করে।

শেষকালে, মাস দুয়েক পরে, বাচ্চাকে বুকের দুধ খাইয়ে খাইয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে উমা—যদিও আরও ছ'মাস দুধ-উৎপাদন করে যাওয়ার মত অবস্থায় থাকি তখনো। ক্ষুধার্ত মুখের কাছে উদ্দীপনা না পাওয়ার ফলে ফের ঘুমিয়ে পড়ে আমার গ্ল্যাণ্ডের অংশরা। স্বাভাবিক ওজন ফিরে পাই আমি।

কি-কি অসুখের শিকার হই জানতে চাইছেন? বেশী নয়। খুব সম্ভব প্রায় সবাই যা নিয়ে যখন তখন ভেবে মরে, তা হল স্তনের আয়তন। হয় খুব বড়, না হয় খুব ছোট্ট। খুঁতখুঁতুনির শেষ নেই। উমার কপাল ভাল—এই দুই সমস্যার কোনোটাই দেখা যায়নি ওর ক্ষেত্রে। আমার স্বাভাবিক ওজন হল ছ' আউন্স। উমার বয়স এখন বিয়াল্লিশ হলেও আমি শিথিল হইনি, ঝুলে পড়িনি—এখনো উন্নত এবং দৃঢ়। অদৃষ্ট ওর সুপ্রসন্ন বলতে হবে—নইলে সার্জনের শরণাপন্ন হতে হত। কিন্তু আয়তনে যদি খুব ছোট হতাম, তাহলে অত্যন্ত খ্যাতিমান সার্জনও তরল সিলিকন ইঞ্জেকশন দিয়ে আয়তন বাড়াতে চাইতেন না। তরল সিলিকনের নাম নিশ্চয় উমা শুনেছে। ডাক্তার বেঁকে বসতেন ভয়াবহ একটা বিপদের সম্ভাবনা আঁচ করে। সঞ্চরমান তরল সিলিকন স্তন দেশ থেকে অন্যত্র গিয়ে মারাত্মক অসুখ ডেকে আনতে পারে—মৃত্যু পর্যন্ত হওয়া অসম্ভব নয়। সিলিকন নির্মিত কৃত্রিম স্তন বসিয়ে দেওয়াটা বরং অনেক নিরাপদ এবং সন্তোষজনক। (চর্বি বসানোর চেষ্টা আগে করা হয়েছিল—এখন ওদিকে কেউ খুব একটা ঝোঁকে না।)

স্তন যদি আয়তনে বড্ড বেড়ে যায়, তাহলে বাড়তি চর্বি আর চামড়াকে চেঁচে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে—কয়েক পাউণ্ড পর্যন্ত বাদ দিতেও হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। নতুন আকার দেওয়া হয় স্তনকে এবং স্তনবৃন্তের যেখানে থাকা উচিত—ঠিক সেইখানে, মানে, চতুর্থ পঞ্জরের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয় তাকে।

আমার সবচেয়ে বড় বিপদ হল গিয়ে ক্যানসার। উমার দেহে অন্যান্য দেহযন্ত্র ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার যতটা সম্ভাবনা রাখে, তার চেয়ে অনেক বেশী সম্ভাবনা রাখি আমি এবং মেয়েদের ক্যানসারে মৃত্যুর সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ এইটাই। তবে কি জানেন, উমা যেন এই শুনে ভেঙে না পড়ে। কেন না, এ বিপর্যয়কে এড়িয়ে যাওয়ার পন্থা হিসেবে অনেক কিছুই করণীয়

স্তন

আছে উমার। নিজেই নিজের স্তন পরীক্ষা করার পদ্ধতিটাই ধরুন না কেন। একটু চেষ্টা করলেই এ ব্যাপারে পোক্ত হয়ে উঠতে পারে উমা এবং ডাক্তারের চোখে যা এড়িয়ে যায়—এমনি ছোট্ট মাংস পিণ্ডও আবিষ্কার করে ফেলতে পারে নিজের চেষ্টায়। চিৎ হয়ে শুয়ে একটা বালিশ রাখুক বাঁ কাঁধের তলায়। তারপর ডান হাতের তিন আঙুল দিয়ে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করুক বাম স্তনকে। তারপর, বালিশ সরিয়ে আনুক ডান কাঁধের তলায় এবং বা হাতের আঙুল দিয়ে টিপে টিপে পরীক্ষা করুক ডান স্তনকে। মাসের কোনো একটা নির্দিষ্ট দিনে—ধরুন ঋতু অবসানের দুদিন পর নিয়মিত ভাবে এই পরীক্ষাটি চালিয়ে যাক উমা। শুধু ডেলা আবিষ্কারের দিকে নজর দিলে চলবে না, স্তনের কোথাও দেবে গেল কিনা—সেদিকেও যেন নজর থাকে। স্তনের কাঠামোর অন্য কোথায় ক্যানসার হানা দিলে তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ স্তনের উপরিভাগ সামান্য দেবে যেতে পারে। স্তনবৃন্ত স্বাভাবিক অবস্থা থেকে মুচড়ে হেলে পড়লেও যেন হুঁশিয়ার হয় উমা—সংকেতটা উপেক্ষা করার নয়। কোথাও কোনো আব চোখে পড়লে যেন আতংকে দিশেহারা না হয়। প্রতি তিনটে আবের মধ্যে একটা ক্যানসার জনিত হয়। তাই বলে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না—অধিকাংশ মেয়েরাই তাই করে—ডাক্তার দেখাতে হবে সেই দিনই। ক্যানসার প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে রোগমুক্তির সম্ভাবনাটা বেশী থাকে।

শীগগিরই ঋতুবন্ধ ঘটবে উমার। বয়ঃসন্ধিকালে যা-যা ঘটেছিল, সবগুলিরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে তখন। সঞ্চিত চর্বির কিছুটা হারাবে—সবটা নয়। গ্ল্যাণ্ডের কাঠামো শুকিয়ে যাবে। এবং প্রায় অদৃশ্য হওয়ার অবস্থায় পৌঁছোবো আমি। সিঁটিয়েও যেতে পারি।

এসে গেছে কাহিনীর উপসংহার। পৃথিবীতে এসেছিলাম সক্রিয় জীবন যাপনের জন্যে—উৎপাদনক্ষম অবস্থায় থাকার জন্যে, তাই যখন কেউ আমাকে মূলতঃ রূপের অংগ হিসেবে ধরে নেয়, নিছক সাজসজ্জায় অংশ হিসেবে মনে করে—বড্ড কষ্ট হয়। রূপের অংগ হিসেবে শত প্রশংসা কুড়িয়েও বিষণ্ণ থাকতে হয়। তাই যখন শুনলাম বিশ্বের সর্বত্র প্রগতিশীল দেশেও নতুন মায়েদের মধ্যে কোলের বাচ্চাকে বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে, মনটা খুশী খুশী হয়ে উঠল। শক্তি তাদের আরও বাড়ুক, এই শুভ কামনা করেই ইতি টানছি এই উপসংহারে।

অণ্ডকোষ

আমার সম্পর্কে উপেনের মনের মধ্যে রয়েছে মিশ্র অনুভূতি। একদিক দিয়ে আমাকে শ্রদ্ধা করে—ও যে পুরুষ, তার একমাত্র প্রমাণ তো আমিই। আর একদিক দিয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে লজ্জিত আমার সম্পর্কে। ওর এই মনোভাবের প্রবল প্রতিবাদ জানাচ্ছি। দেহের অন্যান্য যন্ত্রের মত আমিও সমান সম্মানের অধিকারী—অন্যান্য দেহযন্ত্রের চেয়ে বরং অনেক বেশী আশ্চর্যও বটে। তার চেয়েও বড় কথা হল, আমি বা আমার জাতভাইরা না থাকলে উপেন অথবা অন্য কোনো মিঞাকেই আবির্ভূত হতে হত এই ধরাধামে।

উপেন অজ্ঞ হতে পারে আমার গুরুত্ব বিচারে—প্রকৃতি নন। আমি দুটো সত্ত্বা। উপেন আমাকে কেবল যৌন সম্পর্কিত দেহযন্ত্র মনে করে—ননসেন্স আর বলে কাকে। আমি যে কত রকমের রাসায়নিক পবিবর্তন ঘটাতে পারি, তার ফিরিস্তি দিলে উপেন বাহাদুরের মুণ্ডু ঘুরে যাবে। এই শর্মাই ওকে বালক থেকে যুবকে পরিণত করেছে—কথাটা যেন ভুলে না যায় উপেন; আরও আছে—বৃদ্ধ বয়েসে উপেনের জীবনটা শান্তিতে ভরপুর থাকবে, না, দুর্বিসহ হয়ে উঠবে, সে সিদ্ধান্তও বেশ কিছু পরিমাণে নিতে হয় এই শর্মাকেই।

উপেনের বাম অণ্ডকোষ আমি। অন্যান্য দেহযন্ত্রের তুলনায় দেখতে আমাকে মোটেই খারাপ নয়ঃ চকচকে গোলাপী-সাদাটে ডিমের মত গড়ন। লম্বায় মোটে দেড় ইঞ্চি। আমার সবচেয়ে ওজন মোটে আধ আউন্স। বেশী ব্যাস মোটে পৌণে এক ইঞ্চি। আমার কাজ দ্বিবিধ; জীবন সৃষ্টি করে চলেছে যারা সেই শুক্রকীট কোষদের উৎপাদন করা এবং পৌরুষ-দ্যোতক হরমোন টেসটোসটেরন উৎপাদন করা। পেশী, হাড়, আর অন্যান্য টিশু নির্মাণ এবং উপেনের মানসিক কাঠামো নির্মাণেও সাহায্য করে এই হরমোনটি।

কলকব্জা হিসেবে আমি অতীব জটিল। এইটুকু জায়গার মধ্যে এত গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম উপেনের খুব কম দেহযন্ত্রকেই করতে হয়। এক হাজার নল আছে আমার মধ্যে। লম্বায় এরা একফুট থেকে দু'ফুট পর্যন্ত—

লম্বালম্বিভাবে জুড়ে গেলে একতৃতীয়াংশ মাইল তো হবেই। সেলাই করার সিল্কের সুতোর মত সূক্ষ্ম এবং মিহি প্রত্যেকটা নল। এরা গিয়ে মিলেছে কুড়ি ফুট লম্বা একটা বৃহত্তর সংগ্রাহক নলে। এই নালীতন্ত্রের মধ্যেই, প্রতিদিন পাঁচ কোটি শুক্রকীট কোষ উৎপাদন করে চলেছি আমি। সংখ্যাটা যে নেহাৎ সামান্য নয়, তা একটা ছোট্ট হিসেব থেকেই বুঝবেন। দু' মাসে যত কোষ উৎপাদন করি, তা পৃথিবীকে ভরিয়ে তোলবার মত জন সংখ্যা সম্ভাবনাময়!

বিপুল সংখ্যক এই শুক্রকীটকোষদের মধ্যে মাত্র তিনজনই তাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সক্ষম হয়েছে—উপেনের তিন ছেলেমেয়ে এরা। তবে কেন এই অপচয়? এত বাহুল্য? সমুদ্রে জীবন-সৃষ্টির আবছা স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে যেন বিরাট এই বাহুল্যের মধ্যে। ভাসতে ভাসতে কবে কখন একটা ডিম্বকোষ এসে ফলবতী হবে এই আশায় কিছু মৎস্য শুক্রকীটদের স্রেফ পিচকিরির মত ছড়িয়ে দেয় জলের মধ্যে।

নালীতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে রয়েছে লক্ষ লক্ষ লেডিগ কোষ। এরাই আমার টেসটোসটেরনের উৎপাদক। অদ্ভুত ব্যাপার কি জানেন, পৌরুষব্যঞ্জক এই রাসায়নিক পদার্থটি মেয়েদের মধ্যেও দেখা যায়। উপেনের রক্তে যে পরিমাণ টেসটোসটেরন আছে, তার বিশ ভাগের এক ভাগ আছে উপেনের বউ উমার রক্তপ্রবাহে, উৎপাদন করছে ওর অ্যাড্রেন্যাল গ্ল্যাণ্ড। না থাকলে উমা কামশীতল হত, বেশী থাকলে খুব সম্ভব পুরুষালী হত।

উপেন যখন মায়ের পেটে তখন আমি আর আমার পার্টনার ঢুকে ছিলাম ওর শরীরের মধ্যে। জন্মের দু'মাস আগে ইনগুইন্যাল ক্যানাল নামে একটা সঙ্কীর্ণ খোলা পথে বেরিয়ে এসেছিলাম বর্তমান অবস্থানে। অণ্ডকোষদের অবতরণের পর যদি ক্যানালটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে না যায়, তাহলে পরে কিন্তু এখান থেকেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা দেখা যেতে পারে—হার্নিয়া হতে পারে উপেনের।

আমরা যদি অবতরণে অক্ষম হতাম তাহলে সন্তানোৎপাদনেও ব্যর্থ থেকে যেতে হত উপেনকে। কারণটা কৌতূহলোদ্দীপক। উপেনের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৩৭ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (৯৮.৬ ডিগ্রী ফারেনহিট)। এই তাপমাত্রায় সন্তানোৎপাদনে সক্ষম শুক্রকীট উৎপাদন করতে পারি

না আমি। ওর বাকী শরীরের যা তাপমাত্রা, আমাকে তার থেকে, দেড় ডিগ্রী তলায় থাকতেই হবে। যাতে থাকতে পারি, সেই জন্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে আমার মধ্যে। যে থলির মধ্যে রয়েছি আমি সেটি ঘর্মগ্রন্থিতে পরিপূর্ণ ফলে, ঘাম উবে গেলেই জুড়িয়ে যাই আমি। উপেন এটাও নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে যে গরম জলে নেয়ে উঠলেই আমি ঝুলে পড়ি। আমাকে ঠাণ্ডা রাখতে গিয়ে লম্বা হয়ে যায়

অণ্ডকোষ
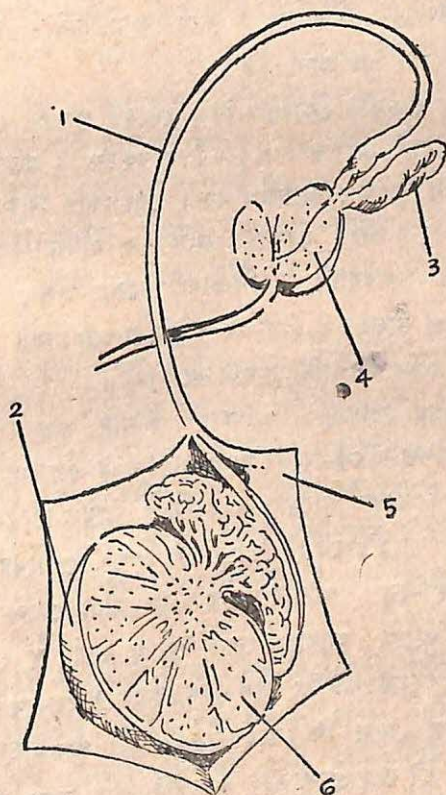
১। স্পার্মেটিক কর্ড (শুক্ররজ্জু); ২। শুক্রাশয়, ৩। শুক্রনালী; ৪। প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড; ৫। অণ্ডকোষের খোলা থলি; ৬। শুক্র বহনকারী বা উৎপাদনকারী নালিকা সমূহ;

যে-দড়ির নিচে আমি ঝুলছি, সেটি। ঠাণ্ডা জলে নেমে উঠলেই এই দড়িই আবার খাটো হয়ে যায়—টেনে তোলে আমাকে দেহের উষ্ণতার সান্নিধ্যে।

তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের এই বিধিব্যবস্থাকে যে বাগড়া দেবে আমার শুক্রকীট উৎপাদনেও সে নাক গলিয়ে বসবে। উপেন যদি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যায়, শুক্রকীট উৎপাদন ব্যাহত হবে। মেরু অঞ্চলে গেলে উৎপাদন বেড়ে যাবে—কেন না ঠাণ্ডায় আমি উদ্দীপ্ত হই। নিউমোনিয়া হওয়ার ফলে একবার দিনসাতেক জ্বরে ভুগেছিল উপেন। সেই সময়ে আমি কিন্তু শুক্রকীট উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছিলাম, নির্বীর্য হয়ে পড়েছিল উপেন—যদিও খবরটা ওর জানা নেই।

আমার তৈরী শুক্রকীট কোষেরা কিন্তু দেহের ক্ষুদ্রতম কোষ (বৈষম্য দেখিয়ে বলা যায়, নারী দেহের ডিম্বকোষ কিন্তু বৃহত্তম) ; শুক্রকীট কোষদের দেখতেও অনেকটা পুঁচকে বেঙাচিদের মত। পেছনকার লিকপিকে ল্যাজটা কেবল ছুটোছুটি করার জন্য ; দরকারী অংশ হল মাথাটা—জীবনের স্রষ্টা যে। এর আয়তন কতখানি ? জিজ্ঞাসা চিহ্নের তলায় যে ফুটকিটা দেখেছেন, এর মধ্যে ওদের ১২০০ জনকে ধরিয়ে দেওয়া যায়।

প্রত্যেকের আয়তন কতখানি অনুমান করে নিন।

অনেক চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্যর অধিকারী আমার শুক্রকীট কোষেরা। উপেনের শরীরের অন্যান্য কোষেদের মধ্যে আছে ৪৬টা ক্রোমোজোম ; আমার শুক্রকীট কোষদের মধ্যে আছে ২৩টা—ঠিক অর্ধেক। বাকী অর্ধেকটা আসে ডিম্বকোষের কাছে থেকে। দুয়ে মিলে সম্পূর্ণ কোষের সৃষ্টি হয়—৪৬টা ক্রোমোজোম নিয়ে। আমার শুক্রকীটদের মধ্যে ছেলে-উৎপাদনকারী Y ক্রোমোজোম থাকে, আবার মেয়ে-উৎপাদনকারী X ক্রোমোজোমও থাকে, কিন্তু উপেনের বউ উৎপাদন করে কেবল X ক্রোমোজোম। তাই জাঁক করেই বলব, ছেলে কি মেয়ে হবে—সেটা পুরোপুরি নির্ভর করে আমার ওপরে। এই সঙ্গে প্রত্যেকটা শুক্রকীট কোষ মধ্যস্থ হাজার হাজার জিন (জীবের বংশানুক্রমের মূলাধার) ঠিক করে দেয় উপেনের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য চালান করবে ওর ছেলেমেয়েদের মধ্যে।

ক্ষিপ্তের মত ল্যাজ নাড়তে নাড়তে শুক্রকীট কোষেরা ঘণ্টায় সাত ইঞ্চি পর্যন্ত সাঁতরে এগিয়ে যায়। আয়তনের অনুপাতে এই পথটুকুকে মহাকাব্যের

মতই বিরাট ব্যাপার হিসাবে ধরে নিতে পারেন। মোটামুটি হিসাবে স্বয়ং উপেনের ঘন্টায় চল্লিশ মাইল ছোটার সামিল খেয়াল রাখবেন। ডিম্বকোষদের চামড়া অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী পুরু হওয়ায় ঢুঁ মেরেও ভেতরে ঢোকা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ত দুরন্ত শুক্রকীটদের পক্ষে, কিন্তু সে সমস্যার সুরাহা করে দিয়েছি আমি বিশেষ একটা এনজাইমের ব্যবস্থা করে। শুক্রকীটদের জোগান দিই এই এনজাইম—যার দৌলতে ডিম্বকোষদের পুরু চামড়ার স্তর গালিয়ে সুড়ঙ্গপথের ভেতরে প্রবেশ করে শুক্রকীট এবং ফলবতী করে ডিম্বকোষটিকে—অবসান ঘটে তার দীর্ঘ প্রতীক্ষার।

নিয়মিত বাইরে ছেড়ে না দিলে বুড়ো হয়ে যাওয়ার দরুন মারা যাবে লক্ষ লক্ষ শুক্রকীট। ঘন ঘন মুক্তি দিতে আরম্ভ করলে পূর্ণতাপ্রাপ্তির সময় পাবে না লক্ষ লক্ষ শুক্রকীট; অক্ষম হবে জীবন সৃষ্টি করতে। শুক্রকীট নির্গমণ যদি ঘন ঘন হতে থাকে, মাত্রা ছাড়িয়ে যায়—যেমন, দিনে দুবার করে দশদিন বেরিয়ে যেতে থাকে, তাহলে একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যায় শুক্রকীট সঞ্চয়। বিপুল এই চাহিদা মিটিয়ে উঠতে পারে না আমার উৎপাদন ক্ষমতা। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে তাই বেশ কয়েক হপ্তা সময় লাগে আমার।

প্রথম সন্তান লাভের সংকল্প নেওয়ার পর এই কথাটা জানা থাকলে ভালই হত উপেন আর উমার। মাসের পর মাস গড়িয়ে যাওয়ার পর গর্ভবতী না হওয়ার ফলে খুব দুশ্চিন্তার পড়েছিল দুজনে, আরও ঘন ঘন শুক্রকীট নিক্ষেপ করলেই বুঝি এ সমস্যার সমাধান করা যাবে—এই ভেবে এবং সেই পথ ধরে সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছিল আনাড়ি দম্পতিটি। সমস্যার আসল সমাধান জানা থাকলে বেশ কিছুদিন বিরত থাকলেই সব ভাবনা চিন্তার অবসান ঘটত।

মাত্র একবারের বীর্যপাতে উপেন কত শুক্রকীট কোষকে মুক্তি দেয় আন্দাজ করতে পারেন? প্রায় পঞ্চাশ কোটি—মানে, আমার উৎপাদনের প্রায় সবটাই। চক্ষু চড়কগাছ করার মত সংখ্যা, তাই নয় কি? তা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক এই শুক্রকীটদের একত্র সন্নিবেশ এমন কিছু নয়—অতিশয় নগণ্য। তরল পদার্থটার অধিকাংশই উৎপন্ন হয় উপেনের প্রোসটেট আর সেমিন্যাল ভেসিক্লস্‌-য়ে—মাত্র এক চামচের মত। এর কাজ হল শুক্রকীটদের তরলাবস্থায় রাখা এবং তাদের শক্তি আর পুষ্টির

অণ্ডকোষ

জোগান দেওয়া—যাতে বীরবিক্রমে সাঁতরে যেতে পারে। এর মধ্যে থাকে চিনি, প্রোটিন আর খনিজ পদার্থ।

উপেনের চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত আমি অপেক্ষাকৃতভাবে ধীর স্থির শান্ত ছিলাম। বলতে পারেন, পর্দার আড়ালে পার্ট মুখস্থ করে ঝিমোচ্ছিলাম—ডাক এলেই স্টেজে ঢুকে পড়ার প্রতীক্ষায়। ডাক এল উপেনের পিটুইটারী গ্লাণ্ড আর ব্রেন থেকে। বালক উপেনের এবার যুবক উপেন হওয়ার সময় এসেছে—এই সিদ্ধান্ত ব্রেন আর পিটুইটারী নেয় কি করে এবং কেন—আমার তা জানা নেই। আমি কিন্তু সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্তের মত সক্রিয় হয়ে উঠি—ঐ সংকেত আমাকে অস্থির করে তোলে। উদ্দাপক পিটুইটারী হরমোনদের একজন আমার নালীতন্ত্রে শুক্রকীট উৎপাদন আরম্ভ করতে থাকে; আরেকজন আমার লেডিগ কোষকে খুঁচিয়ে হরমোন ঢালতে শুরু করে।

এই হরমোনটারই নাম টেসটোসটেরন—যার মুখ্য কাজ হল বৃদ্ধিকে খুঁচিয়ে ত্বরান্বিত করা। ঠিক এই সময় থেকেই উপেনের বাবা আর মা ছেলের ঘন ঘন নতুন প্যান্ট বানাতে গিয়ে ফতুর হতে বসেছিল—কয়েক হপ্তার মধ্যেই লটপটে প্যান্টের ঝুল গোড়ালি পর্যন্ত উঠে আসছে দেখে খেপে গিয়েছিল। এক বছরেই পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হয়ে গিয়েছিল উপেন—ঠিক যেন হাউইয়ের মত উঠে গিয়েছিল পাঁচ-পাঁচটা ইঞ্চি বিপুল বেগে। সেই সঙ্গে কচি চর্বি শক্ত পেশীতে পরিণত হয়েছিল। কণ্ঠস্বর ভারী হয়েছিল। নরম গালে কচি দাড়ি গজিয়ে মুখের চেহারা পালটে দিয়েছিল। এমন কি চামড়ার চর্বি গ্রন্থিতেও সাড়া জাগিয়েছিল আমার উদ্দীপক হরমোন: অতি-সক্রিয় হয়েছিল চর্বি-গ্রন্থি, ফলে বেচারার মুখ ভরে গিয়েছিল নচ্ছার ব্রণতে।

রূপান্তর শুধু উপেনের শরীরেই নয়, ব্যক্তিত্বেও দেখা গিয়েছিল। বয়স্কদের মত হয়ে উঠছিল আবেগ উত্তেজনার ঘাত প্রতিঘাত। মেজাজ খিঁচড়ে যাওয়া কমে এসেছিল, সে জায়গায় দেখা দিয়েছিল অনেক বেশী আত্মবিশ্বাস আর গভীরতর গাম্ভীর্য অথবা তুষ্ণীম্ভাব। যৌনসংক্রান্ত ব্যাপারে একটা ভূমিকা পালন করে আমার হরমোনেরা—কিন্তু পূর্ণ ভূমিকাটা নয়। মুখ্য ভূমিকায় মনে হয় অবতীর্ণ হয় মন স্বয়ং। প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে আমার হরমোনদের মূল ধাক্কাটা গিয়ে পড়ে ভাবাবেগের ওপর।

উপেনের বয়স যখন ২৫ থেকে ৩০য়ের মধ্যে, সর্বাধিক হরমোন উৎপাদন করেছিলাম তখনি। এখন কিন্তু ঢিলে দিতে আরম্ভ করেছি। ষাটে পা দিলে বয়ঃসন্ধির ঠিক আগের অবস্থায় ফিরে যাবো, শক্তি আর উদ্দীপনাও কমে আসবে—কমবার বয়সই যে তখন! শরীরের মূল চাহিদাগুলো মিটিয়ে যাওয়ার মত যথেষ্ট পরিমাণ টেসটোসটেরন তখনও উৎপাদন করে যাব আমি, দাড়ি গজানো ইত্যাদি ব্যাপারগুলো বন্ধ হবে না। নব্বইতে পা দিলেও শুক্রকীট উৎপাদন করে যাবো—তবে গর্ভধারণ করানোর পরিমাণে নয়। বাড়তি হরমোন শরীরে ঢুকিয়ে দিলে কি তখন যৌবনকে ফিরে পাবে উপেন? ভাব গতিক দেখে তো সেরকম মনে হচ্ছে না।

আমাকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সুস্থ রাখার ব্যাপারে উপেনের করণীয় কিছু আছে কী? তেমন কিছু নেই—মোটামুটি ভাবে নিজেকে কার্যক্ষম রাখতে পারলেই যথেষ্ট। অন্যান্য দেহ-যন্ত্রের মত সুস্বাস্থ্যের উদ্দীপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাই আমিও। উপেনকে তাগড়াই জোয়ান বানিয়েছি আমিই—বার্ধক্যেও সুখে স্বচ্ছন্দে এবং উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে ওর জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার মত রাসায়নিক দ্রব্যাদির কিছু অন্ততঃ জোগান দিয়ে যাওয়ার আশাও রাখি।

৮
মূত্র তন্ত্র

বৃক্ক (কিডনি)

উপেনের অন্যান্য দেহযন্ত্রের মত, আমিও চেহারার দিক দিয়ে খুব একটা খুবসুরৎ নই। গায়ের রঙ আমার লালচে-বাদামী, আয়তনে ওর মুঠোর সমান। উপেনের ডান কিডনি আমি। বাংলায় বলতে পারেন বৃক্ক। তবে কিডনি কথাটাই বেশী চালু—পরিভাষার চেয়ে। ওর শিরদাঁড়ার এপাশে আমি, ওপাশে রয়েছে আমার জুড়িদার। আমার সম্বন্ধে উপেনের ধারণাটা কিন্তু মোটেই উচ্চ নয়। আমি নাকি নিতান্তই অগৌরবের একটা কাজ করি—অতিশয় যাচ্ছেতাই একটা তরল পদার্থ উৎপাদন করি—জিনিসটার নাম মূত্র—শরীরের জঞ্জাল সাফ করার গৌণ পন্থা হিসেবে।

আসল কথা বলতে গেলে, উপেনের শরীরের মাস্টার কেমিস্ট আমি। আজ্ঞে হ্যাঁ, একটুও বাড়িয়ে বলছি না—বড়াইও করছি না। আরও শুনে রাখুন। শরীরের জঞ্জাল বিদেয় করার মূল ব্যবস্থা কিন্তু ওর অন্ত্র-পথ নয়—আমি। বিরামবিহীন ভাবে রক্ত যাচ্ছে আমার মধ্যে দিয়ে, আমি সেই রক্তকে পরিস্রুত করছি, পরিষ্কার করছি, প্রচ্ছন্নভাবে মারাত্মক জঞ্জাল-দের বিদেয় করছি। লাল রক্ত কোষ উৎপাদনে উৎসাহ জোগাচ্ছি আমিই,

বৃক্ক (কিডনি)
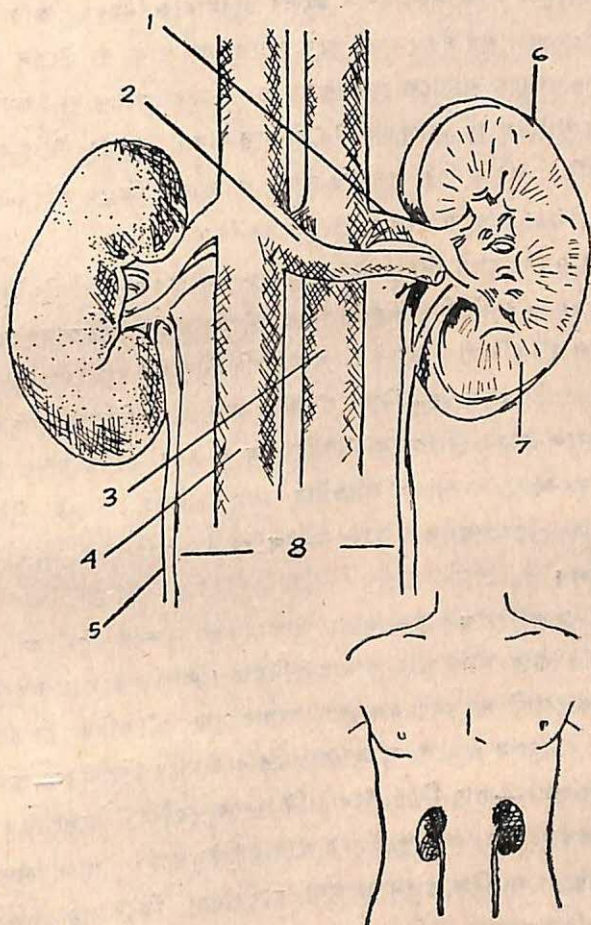
১। মূত্রসম্বন্ধীর ধমনী ; ২। মূত্রসম্বন্ধীয় শিরা , ৩। মহাধমনী ; ৪। অধরা মহাশিরা ; ৫। মূত্রস্থলী অভিমুখে ; ৬। আড়াআড়ি ভাবে কাটা বাঁদিকের বৃক্ক , ৭। ঘনসংবদ্ধ নেফ্রন (বৃক্ক মূল একক ;)

কড়া নজর রাখছি রক্তের পটাসিয়াম, লবণ, সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং অন্যান্য জিনিসের ওপর। এদের একজনও যদি বেচাল হয়, মাত্রার নিচে বা ওপরে একতিলও যায়—তাহলেই উপেনের প্রাণ পর্যন্ত যেতে পারে।

প্রাণ ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক জলের ভারসাম্যও নিয়ন্ত্রণ করি আমি। বেশী জল থাকলে ওর সব কোষই ডুবে মরবে, কম থাকলে উপেন শুকিয়ে যাবে। এ ছাড়াও আমাকে দেখতে হয় ওর রক্তের ক্ষারত্ব বা অম্লত্ব—রক্ত যেন বেশী অ্যাসিড বা অ্যালকালাইন না হয়ে যায়। বস্তুতঃ উপেনের জন্যে হেদিয়ে মরি আমি এবং শুধু ওর ভালর জন্যে কত কি যে করি তার পুরো ফিরিস্তি ডাক্তাররা পর্যন্ত করে উঠতে পারেন নি।

আমার ওজন মোটে পাঁচ আউন্স, কিন্তু দশ লক্ষেরও বেশী ফিল্টার থাকে আমার মধ্যে। যে জিনিসের মধ্যে দিয়ে ছাঁকা অর্থাৎ পরিস্রাবণ করা হয়, তাকে বলে ছাঁকনি বা ফিল্টার। আমার ফিল্টারদের নাম নেফ্রন। প্রত্যেকেই এক একটা ক্ষুদে যন্ত্র—নিছক ছাঁকনি নয়। খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণের তলায় রাখলে এদের যে কোনো একটিকে মনে হবে হেঁড়ে-মাথা পোকার মত. পেছনকার পাকানো ল্যাজটার নাম টিউবুল। এই টিউবুলদের পাক খুলে টেনে লম্বা করে রাখুন—দেখবেন ৭০ মাইল পথ জুড়ে রয়েছে সবাই মিলে।

উপেনের শরীরে যত রক্ত আছে, তার দ্বিগুণ রক্তকে ছেঁকে পরিষ্কার করছি প্রতিঘন্টায় আমি আর আমার জুড়িদার। লাল রক্তকোষ অথবা রক্তের অত্যাবশ্যক প্রোটিনের বৃহৎ কণাদের আমার সূক্ষ্ম ছাঁকনির ভেতর দিয়ে যেতে দিই না আমি। দিলে, মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে চিরতরে—দ্রুত বিপর্যয় দেখা দেবে তখন—প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে বেচারা উপেনের। তরল পদার্থের শতকরা ৯৯ ভাগ শুষে নেয় আমার টিউবুলরা। অত্যাবশ্যক ভিটামিন, অ্যামিনো অ্যাসিড, গ্লুকোজ আর হরমোনরা ফিরে যায় রক্তপ্রবাহে, কিন্তু অতিরিক্ত থাকলে বেরিয়ে যায় মূত্রের সঙ্গে।

এই কারণেই—গেণ্ডেমুণ্ডে মণ্ডামিঠাই খাওয়ার পর ভালোমানুষের মত ডাক্তারের কাছে গিয়ে মূত্র পরীক্ষা করালে উপেনের মূত্রে এত চিনি পাওয়া যাবে যে ডাক্তার শুদ্ধ ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাবেন। ঠিক তেমনি রাশি রাশি নোনতা খাবার খাওয়ার পর আমি যদি বাড়তি নুনকে পরিস্রাবণ করে বার করে না দিই রক্ত থেকে, তাহলে কত

থানে কত চাল হাড়ে হাড়ে বুঝবে উপেন বাছাধন। মহা বিপদ কাকে বলে, সে আক্কেল হয়ে যাবে। নুন জল ধরে রাখে। রক্তের মধ্যে জলের মিত্র নুনকে যদি রেখে দেওয়া হয়, তাহলে রক্ত আর কোষ-দের ফাঁকে ফাঁকে তরল পদার্থের সঞ্চয় ঘটবে। ফুলে উঠবে উপেনের মুখ, পা আর পেট, চরম বিপর্যয়টা ঘটবে তারও পরে, গ্যালন গ্যালন ধরে রাখা বাড়তি তরল পদার্থের বোঝা পাম্প করতে করতে হেদিয়ে পড়বে হৃৎপিণ্ড নামক ক্ষুদে পাম্প যন্ত্রটি, নেতিয়ে পড়বে একটু একটু করে, বিকল হবে এবং থেমেও যাবে এক সময়ে।

মূলতঃ মাংস আর ফলের রস থেকে আসে পটাসিয়াম লবণেরা। এদের ওপরেও কড়া নজর রাখতে হয় আমাকে। মাত্রায় খুব কমে গেলেই পেশীরা এলিয়ে পড়তে থাকে—বিশেষ করে শ্বাসযন্ত্রের পেশীরা। বেশীমাত্রায় আরও এক টিপ রক্তে থেকে গেলে ব্রেক কষে দেয় হার্টের ওপর। একেবারে থামিয়েও দিতে পারে হৃৎযন্ত্রকে। তাই মাত্রায় অতিরিক্ত দেখলেই শুধু সেইটুকু দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিই রক্তপ্রবাহ থেকে। অথবা যদি দেখি উপেনের খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে অত্যাবশ্যক পটাসিয়াম লবণেরা থাকছে না তখন মহাকিপটের মত যে-টুকু আছে রক্তে, সেই-টুকুই আঁকড়ে রেখে দিই। অতন্দ্র প্রহরী যে আমি, দিবা নিশি রক্তকে ছেঁকে যাচ্ছি—বাড়তি হলেই বাইরে গলাধাক্কা দিচ্ছি, ঘাটতি হলেই ভেতরে ঢুকিয়ে নিচ্ছি।

সবচেয়ে বড় যে আবর্জনাটাকে নিয়ে আমাকে মেহনৎ করতে হয়, নাম তার ইউরিয়া—প্রোটিন পরিপাকের পর যে পড়ে থাকে। অন্য সব কিছুর মত এই বস্তুটিকেও সঠিক ভারসাম্যের মধ্যে রাখতে হয়। মাত্রায় খুব কমে গেলেই বুঝতে হবে আমার ঠিক ওপরেই যে প্রতিবেশীটি রয়েছেন—সেই সেই যকৃৎ বা লিভারের বারোটা বাজিয়ে বসে আছে উপেন। মাত্রায় খুব বেড়ে গেলেই যে রোগটি দেখা যায় তার মত কদর্য রোগ কোনো ডাক্তারও দেখতে চান না—ইউরিমিয়া, অর্থাৎ রক্তে মূত্র।

সময় থাকতে যদি এর প্রতিবিধান করা যায়, রক্তে মূত্র আসা বন্ধ না করা যায়—তাহলে জ্ঞান হারিয়ে মারাও যেতে পারে উপেন। রক্তে যতই সঞ্চিত হতে থাকে ইউরিয়া, শরীর ততই বীর বিক্রমে প্রয়াস চালিয়ে যায়

বৃক্ক

হত্যাকারীকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বিদেয় করার জন্যে। ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার পর চামড়ার ওপর সাদা-সাদা ইউরিয়া ক্রস্ট্যালও দেখা যেতে পারে— শুধু ইউরিয়া না বলে এদের ইউরিয়া 'তুষার' বলাই সঙ্গত। ঘামগ্রন্থিরা শরীর থেকে ঝটপট আপদ বিদেয় করার তাগিদে.ইউরিয়া ক্রস্ট্যাল বার করে দেয় বলেই চামড়ার ওপর জমে ওঠে তুষারের মত। তাই বলে যেন অযথা উদ্বেগে না ভোগে উপেন। যত খুশী মাংস খেয়ে যাক, বাড়তি ইউরিয়াকে কায়দা করার ভার আমার।

এতগুলো কর্তব্য করতে গিয়ে বিরামবিহীনভাবে মূত্র উৎপাদন করে যেতে হচ্ছে আমাকে—তা প্রায় দিনে এক কোয়ার্ট বোতল তো বটেই। আমি আর আমার পার্টনার দুজনে মিলে চালিয়ে যাচ্ছি মূত্র উৎপাদন—মাথা পিছু এক কোয়ার্ট বোতল হারে। আবর্জনা ভারাক্রান্ত এই তরল পদার্থটি আমার লক্ষ লক্ষ টিউবুলদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে ফোঁটায় ফোঁটায় —এত ছোট ফোঁটা যে মাইক্রোসকোপে দেখতে হয়; সঞ্চিত হচ্ছে আমার মধ্যিখানে রাখা একটা ক্ষুদে চৌবাচ্চায়। এর সঙ্গে যোগ রয়েছে মূত্রস্থলীর এবং মূত্রস্থলীর সঙ্গে বাইরের। প্রতি দশ সেকেণ্ড থেকে তিরিশ সেকেণ্ড অন্তর ঢেউয়ের আকারে পেশীর ক্রিয়ার ফলে তরল পদার্থটা ধাক্কা খায় এবং একটু একটু করে এগিয়ে যায় নিষ্ক্রমণ পথের দিকে। রাত হলে কমিয়ে আনি সক্রিয়তা—নইলে তো সারারাত ধরেই ঘন ঘন উঠতে হত উপেনকে। দিনের সক্রিয়তার এক-তৃতীয়াংশ বজায় রাখি রাত্রে। কিন্তু থেমে থাকি না কখ্খনো—সে বান্দাই নই আমি।

একটা জিনিস উপেন নিজেও লক্ষ্য করেছে। কয়েকটা ব্যাপারে বেড়ে যায় আমার সক্রিয়তা। যেমন ধরুন, শীতে কাঁপছে উপেন। আভ্যন্তরিক উত্তাপ সংরক্ষণের জন্য তৎক্ষণাৎ চামড়ায় রক্ত সরবরাহ কমে আসে। এর মানেই হল, আমাকে এবং অন্যান্য আভ্যন্তরিক দেহযন্ত্রগুলোতে বেশী রক্ত সরবরাহ। আমার মধ্যে রক্ত সররবাহ বেড়ে যাওয়া মানেই আমার কাজ বেড়ে যাওয়া—বেশী মূত্র উৎপাদন করতে বাধ্য হই আমি।

উপেন রেগে গেলেও প্রায় একই কাণ্ড ঘটে। রক্তঃচাপ বৃদ্ধি পায়, রক্ত·শুদ্ধির জন্যে বেশী রক্ত যেতে থাকে আমার মধ্যে দিয়ে। পরিণাম— অধিকতর মূত্র উৎপাদন।

অ্যালকোহলেও ঘটে একই কাণ্ড—তবে অন্য পথে—বেশ জটিল পথে।

উপেনের ব্রেনের তলদেশে অবস্থিত পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড হল গিয়ে আমার মূল প্রভুদের অন্যতম। অত্যাশ্চর্য এই গ্রন্থিটি একটি হরমোন উৎপাদন করে, যাকে বলা যায় অ্যান্টি-ডাইউরেটিক। অর্থাৎ যা মূত্র উৎপাদন বাড়ায় না —কমিয়ে দেয়। আবর্জনা অপসারণের কাজটা পুরোপুরি আমার ওপর ছেড়ে দিলে এত বেশী মূত্র উৎপাদন করে যেতাম যে বিপজ্জনক ভাবে জলশূন্য হয়ে আসত উপেন। অসামান্য এই হরমোনটি তা হতে দেয় না, খবরদারি চালিয়ে যায় আমায় ওপর।

উপেনের বীয়ার বা হুইস্কিতে যে অ্যালকোহল থাকে, আমার ওপর তার সরাসরি কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু এই অ্যালকোহল পিটুইটারীর ব্রেক-কষা হরমোন উৎপাদন কমিয়ে দেয় বলে আমাকে অনেক বেশী তাড়াতাড়ি মূত্র উৎপাদন করতে হয়। বেশী ড্রিঙ্ক করার ফলে সামান্য ভাবে জলশূন্য হয়ে পড়ে উপেন এই কারণেই। এবং এই কারণেই পরের দিন সকাল হলেই কুঁজো নিয়ে ঢকঢক করে জল খেয়ে নেয় একপেট। কফির মধ্যেকার কেফিনেও একই কাজ হয়। সিগারেটের নিকোটিনে হয় কিন্তু উল্টোটা—হরমোন উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। বেশী ধূমপান করলে তাই ঘন ঘন মুত্রত্যাগের প্রয়োজন হয় না উপেন মহাশয়ের।

উপেন যেমন বুড়িয়ে যাচ্ছে এবং শরীরে সে চিহ্ন প্রকট করে তুলছে, ঠিক তেমনি আমিও আমার বয়সের ছাপ দেখাতে শুরু করে দিয়েছি। বিস্তর ব্যাধির আশ্রয়স্থল হয়ে পড়ছি। কিডনিতে পাথরের কথা উপেনও শুনেছে—মূত্র অতিরিক্ত ঘনীভূত হলেই যা ঘটতে পারে। পাথরের আকার আয়তন খুব ছোট নুড়ির মত হতে পারে এবং উপেনকে তিলমাত্র না জানিয়ে মূত্রের সঙ্গেই বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এদের সাইজ বড় হয়ে গেলেই অন্য গল্পের সূত্রপাত ঘটবে। যে নল মূত্রাশয় পর্যন্ত গিয়েছে, সেই মূত্রনালীর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে বড় আকারের এই নুড়িরা এমন আতীব্র যন্ত্রণা দেবে উপেনকে যে বেচারী চোখে সর্ষেফুল তো দেখবেই, এ ছাড়াও অনেক কিছু ঘটতে পারে।

কিডনিতে পাথর হওয়া বন্ধ করার একটা সোজা পথ হল প্রচুর পরিমাণে জল পান করা। উপেন যেন এই সোজা পথটা খেয়াল রাখে। সারাদিনে প্রায় ন' গেলাস জলের বেশীর ভাগ আসে খাবার দাবার থেকে এবং এই পরিমাণ জলই পর্যাপ্ত ওর পক্ষে। মাংসের মধ্যে থাকে অর্ধেক জল, কলায়

বৃক্ক

শতকরা নব্বই ভাগ, তরমুজে শতকরা তিরানব্বই ভাগ

আমার ছাঁকনি অর্থাৎ ফিল্টার অথবা নেফ্রন জখম হওয়াটাই কিন্তু আমার সত্যিকারের বিপদ। মূত্রতন্ত্রের তলদেশ থেকে সংক্রমণ উঠে আসতে পারে। কপাল ভাল, অ্যান্টিবায়োটিক্স্ ওষুধপত্রের দৌলতে এ-সব সংক্রমণ রোধ করা যায় ঝটপট। বড় রকমের পোড়ার ক্ষত থেকেও সাংঘাতিক ক্ষতি হয় আমার নেফ্রনদের—ধ্বংস-হয়ে-যাওয়া টিশুদের আবর্জনা এত তাড়াতাড়ি স্তূপীকৃত হতে থাকে যে তাদের বিদেয় করে উঠতে পারি না, রক্তের অত্যাবশ্যক উপাদানগুলিও এত তাড়াতাড়ি ক্ষতমুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতে থাকে যে তাদের বদলির ব্যবস্থাও করে উঠতে পারি না। কিডনিতে টেনে লাথি মারলে অথবা ভয়ংকর গাড়ী অ্যাকসিডেন্টে কিডনি জখম হলে নেফ্রনদের যতখানি ক্ষতি হয়, প্রায় সেই ধরনেরই ক্ষতি হতে পারে—বহু ওষুধপত্র এবং বিষ খেলে।

তবে কি জানেন, প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী এত হাঙ্গামার ফলে যা কিছু ক্ষতি আমার হয় তার সবই সাময়িক। যেহেতু নিজেকে নতুন করে গড়ে নেওয়ার অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী আমি, তাই যত চোটই লাগুক না কেন—ঠিক মেরামত করে নিতে পারি নিজেই নিজেকে। তবে যে জিনিসটা সত্যিই ভাবনার ব্যাপার এবং যার কোনো সুরাহা নেই, তা হল ধমনী কঠিন হয়ে যাওয়া—বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যা হবেই। আমার মধ্যে যত ধমনী আছে, তারা কঠিন হতে থাকে, সঙ্কীর্ণ হতে থাকে এবং স্থিতিস্থাপকতা হারিয়ে ফেলার ফলে আমার মধ্যে রক্ত সরবরাহও কমে আসে। কালক্রমে উপেনের হৃদযন্ত্রও পাম্প করার ক্ষমতা সেরকমভাবে আর টিঁকিয়ে রাখতে পারে না—দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলেও রক্তের জোগান কমে আসে আমার মধ্যে। এহেন পরিস্থিতিতে রক্ত ধোলাই করার ক্ষমতাও হারাতে থাকি আমি একটু একটু করে, বিষাক্ত আবর্জনাকে জমতে দিই এবং সোডিয়াম আর পটাসিয়াম লবণকেও স্বাভাবিক ভারসাম্য বজায় রাখতে দিই না।

এর কিছু কিছু ঘটে গেছে এর মধ্যেই। ধ্বংস হয়েছে আমার বেশ কিছু নেফ্রন। তা সত্ত্বেও জানবেন, আমার এবং আমার পার্টনারের জমানো ক্ষমতা নেহাৎ কম নয়। আমার শতকরা নব্বই ভাগ নেফ্রন অকেজো হয়ে গেলেও বেশ ভালভাবেই কাজ চালিয়ে যাব আমি।

ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঠিকমত চললে এবং পানাহারের ব্যাপারে সংযম অভ্যাস করলে অকেজো নেফ্রনদের নিয়েও আরও বহু বছর উপেনের সেবা করে যেতে পারে এই অধম।

এর মানেই হল নুন, পটাসিয়াম, লবণ এবং খাদ্যের অন্যান্য উপাদানরা যাতে সুসম অবস্থায় থাকে, সেদিকে খর নজর রাখা। ফুসফুস, ঘাম আর মূত্রের মধ্যে দিয়ে, শরীরের জল যতটা বেরিয়ে যায়, ঠিক ততখানিকে ভরিয়ে তোলার মত জলও খেয়ে যেতে হবে জলীয় পদার্থের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে। এ ছাড়াও ওষুধ সাহায্য করবে। এমন একটা সময় গিয়েছে যখন বেশ কিছু পরিস্থিতিতে ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দিয়ে ভগবানকে ডাকতে বলতেন। এখন সে সব বিপদ কাটিয়ে ওঠার মত ওষুধ বেরিয়ে গেছে। কাজেই মাভৈঃ।

যখনি ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করি আমি, সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাটাকে সঠিক ভাবে নিরূপণ করার জন্যে আশ্চর্য রকমের কয়েকটা পরীক্ষা নিরীক্ষার আয়োজন করে ফেলেছেন চিকিৎসক মহল। মূল পরীক্ষাটা অবিশ্যি ইউরিনালিসিস, অর্থাৎ মূত্র পরীক্ষা। মূত্রের মধ্যে কি প্রোটিন আছে? খুব নগণ্য মাত্রার ছাড়া থাকাটা উচিত নয়। প্রোটিন থাকলেই বুঝতে হবে রক্ত থেকে প্রোটিনকে বেরিয়ে যেতে দিচ্ছে আমার ছাঁকনিরা।

'ছাঁচ' থাকে কী? আমার টিউবুলরা প্রদাহে আক্রান্ত হলেই নিরেট বস্তু (কোষ, চর্বি, প্রোটিন) ঠিক টিউবুলদের আকারে শক্ত হয়ে যায়; মাঝে মাঝেই এই শক্ত ছাঁচেরা মূত্রের সঙ্গে তোড়ে বেরিয়ে যায়। রোগ নিরূপণে রক্তও সাহায্য করে। বাড়তি ইউরিয়া কি থাকে মূত্রে? থাকলে বুঝতে হবে নিজের কাজটুকুও গুছিয়ে করতে পারছি না। আরেকটা পরীক্ষা অনুযায়ী, উপেনের রক্তপ্রবাহে একটা রঞ্জক পদার্থ ইঞ্জেকশন করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। মূত্রের মধ্যে দিয়ে পদার্থটাকে কতক্ষণে বার করে দিলাম সময়ের সেই হিসেব নেওয়া হয়ঃ যত বেশী সময় নেবে, বুঝতে হবে তত বেশী ঝঞ্ঝাটে পড়েছি আমি। এই ধরনের ডজন ডজন টেস্ট আবিষ্কার করে ফেলেছেন ডাক্তাররা।

আমার কাজ সহজতর করার জন্যে উপেনের করণীয় কিছু আছে কী? দুটি কাজ অবশ্যই করণীয়ঃ ওজনের দিকে নজর রাখা আর রক্ত চাপ পরীক্ষা করা। ব্যায়ামেও উপকৃত হই আমি, কিন্তু ধুমধাড়াক্কা ব্যায়ামে

বৃক্ক

হিতে বিপরীত হতে পারে। পেশীকে বেশী খাটালেই অধিকতর ল্যাকটিক অ্যাসিডের উৎপাদন ঘটবে, ফলে এন্তার চাপ পড়বে আমার ওপর। বেশীর ভাগ মানুষই বড় কম জল খায়—রোজ দু এক গেলাস বাড়তি জল খেলেও বেঁচে যাই আমি। উপেনের মূত্র যদি ঘোলাটে, ধোঁয়াটে অথবা মেহগনী রঙের হয়ে দাঁড়ায়, তা হলেই বুঝতে হবে ডাক্তার দেখানো দরকার। মুখ ফোলা-ফোলা হলে, গা বমি-বমি করলে, চোখে ঝাপসা দেখলে এবং ক্লান্তি অনুভব করলেও বুঝতে হবে আমি ব্যাধিগ্রস্ত এবং অবিলম্বে আমার দিকে নজর দেওয়া দরকার।

তাই বলে যেন দিবানিশি আমাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন না থাকে উপেন। ছোট খাট ব্যাপারে নিজেকে সামাল দেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে। কিন্তু কান্নাকাটি করলে যেন অবহেলা না করে—কানপেতে শোনে আমি কেন কাঁদছি।—

মূত্রস্থলী (ব্লাডার)

নরদেহের যে কোনো অতিশয় অসুন্দর দেহযন্ত্রকে পাল্লা দিতে বলুন আমার সঙ্গে, হারিয়ে ভূত করে দেবো। আমাকে নিয়ে উপেনের বিরক্তি আর অপ্রস্তুত হওয়ার অন্ত নেই—এক নাগাড়ে ওকে জব্দ করে যেতে আমার জুড়ি নেই। ঠাণ্ডা কনকনে রাতেও ওকে বিছানা থেকে টেনে তুলি আমি —ঘুমের বারোটা বাজাতে আমি সিদ্ধহস্ত। দারুণ গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে, যেখানে বড় বড় চাঁইদের সঙ্গে কাজকারবার নিয়ে পেঁচার মত গম্ভীর হয়ে কথা বলতে বসেছে উপেন. সেখানেও ওর হোমরাচোমরা মক্কেল বা রাশভারী মনিবদের চেয়েও বেশী কর্তৃত্ব ফলাই আমি ওর ওপর। যে যতই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা নিয়ে সম্মেলনে আসুক না কেন—আমার বার্তার গুরুত্ব সবার আগে। আমি কখনো হাতজোড় করে বলি না—উপেন ভায়া, দয়া করে একটু সময় দেবেন? সে বান্দাই নই আমি। আমি চালাই হুকুম—জানাই দাবী। এবং সে দাবী, সে হুকুম উপেক্ষা করার ক্ষমতা কোনো মিঞার নেই এই পৃথিবীতে। জী হাঁ্যা, আমিই সেই অসুন্দরতম কিন্তু দোর্দণ্ডপ্রতাপ দেহযন্ত্র—উপেনের মূত্রস্থলী অথবা বস্তি, অথবা ব্লাডার।

অনেক ভ্রান্ত ধারণা নিয়েই আছে উপেন। যেমন, নাড়িভুঁড়িই নাকি দেহের আবর্জনা অপসরণের প্রধান ব্যবস্থা; বলাবাহুল্য, ধারণাটা একেবারেই ভুল, নাড়িভুঁড়ি যদি বাংলাবন্ধের মত হরতাল করে দিন সাতেক—এমন কি কয়েক হপ্তাও—তাহলেও উপেনকে গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হতে হবে না। কিন্তু ওর মূত্রতন্ত্র যদি দিন কয়েকের বেশী কাজ না করে, তাহলেই নিদারুণ ঝঞ্ঝাটে পড়বে উপেন।

ভর্তি অবস্থায় আমার আকার অনেকটা বক্সিং প্র্যাকটিসের পাঞ্চ-বলের মত। কতখানি মূত্র ধরে রাখতে পারে মূত্রস্থলী, তা নির্ভর করে ব্যক্তি বিশেষের ওপর। কেউ পারে ছ' আউন্স, কেউ চব্বিশ আউন্স। উপেন স্বাভাবিক আওতায় পড়ে—প্রায় এক পাঁইট। চব্বিশ ঘন্টায় বিরামবিহীন ভাবে, কি দিনে কি রাতে, কিডনিরা তাদের ছাঁকনি দিয়ে রক্ত থেকে আবর্জনা সাফ করে নিয়ে মূত্র হিসাবে চালান করছে আমার মধ্যে। চুইয়ে

মূত্রস্থলী

চুঁইয়ে মূত্র জমা হচ্ছে দুটো ক্ষুদে মূত্রনালীর (ইউরিটার) মধ্যে দিয়ে— পেনসিলের সিসের মত সরু এরা এবং লম্বায় বারো ইঞ্চি।

আমার নির্গমন পথ কিন্তু পেনসিল আকারের ইউরিথ্রা মারফৎ। এটাও মূত্রনালী। চব্বিশ ঘণ্টায় আমি যতখানি মূত্রত্যাগ করি ইউরিথ্রার মধ্যে দিয়ে, তার পরিমাণ কখনো এক পাঁইট, কখনো প্রায় দু'গ্যালন। গড়পরতা হিসাবে তিন পাঁইটই মূত্রত্যাগের পরিমাণ—উপেন এই শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু এই গড়পরতা হিসেবও দারুণভাবে কমে এবং বাড়ে। পরিমাণ খুব বেশী নির্ভর করে ঘাম গ্রন্থি আর ফুসফুসের মধ্যে দিয়ে কতখানি জল ছরিয়ে গেল, তার ওপর। উপেন যখন ঘামতে থাকে, আমার তৎপরতাও হ্রাস পায়। উপেনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলেই দিনের বেলা যতখানি মূত্রের উৎপাদন হয়, ঘুমের সময়ে হয় তার চারভাগের এক ভাগ। তা যদি না হত, তাহলে বরাতে অনেক দুর্ভোগ লেখা হয়ে যেত উপেনের—বিশ্রামলাভ ঘটত অতি সামান্য।

নিজেকে নিংড়ে শূন্য করার সময়ে কি-কি ঘটে, এবার তা শুনুন কানখাড়া করে। ওপরকার পেশীরা আগে সঙ্কুচিত হয়। তারপরেই নিংড়োনোর মত চাপ সৃষ্টি করে তলার পেশীরা। ফলে নিজেই নিজেকে গামছা নিংড়োনোর মত খালি করে ফেলি। কতবার এভাবে নিংড়োই নিজেকে সেটা নির্ভর করে অনেক কিছুর ওপর। উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা আর ভয়—এই তিনটি মানসিক ক্রিয়ার ফলে রক্তচাপ বাড়ে, রক্ত চাপ বাড়ায় কিডনির কাজ—পরিণামে বাড়ে মূত্র উৎপাদন। মানসিক চাপ, ফুটবল খেলা দেখার উত্তেজনা, অথবা ক্রোধ আমার দেওয়ালের পেশীদের টাইট করে তোলে। তখন ভর্তি অবস্থায় না পৌঁছোলেও নিজেকে হাল্কা করতে ইচ্ছে হয়।

উপেনের বউ উমা যখন অন্তঃসত্ত্বা, তখন বলতে গেলে বাচ্চাটা বেচারার মূত্রস্থলীর ওপরেই বসে থাকত গ্যাঁট হয়ে। ফলে ক্রমাগত চাপ পড়ত। উমাকেও ঘন ঘন হাল্কা হওয়ার জন্যে ছুটতে হত কলতলায়। উপেন নিজেও লক্ষ্য করেছে. ঠাণ্ডার দিনে ঘন ঘন হুকুম চালাই আমি ওর ওপর। ব্যাপারটা কি হয় শুনুন, তাপ সংরক্ষণের অভিলাষে উপেনের রক্ত চামড়ার রক্তবাহদের মধ্যে না গিয়ে বেশী করে যায় ভেতরকার দেহযন্ত্রদের দিকে। কিডনি ভায়াদের বেশী করে রক্ত ছাঁকতে হয়,

মূত্রস্থলী (ব্লাডার)
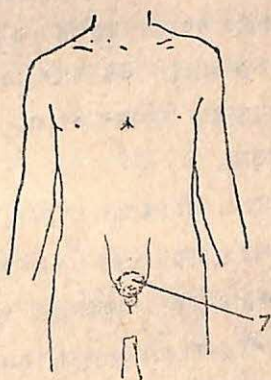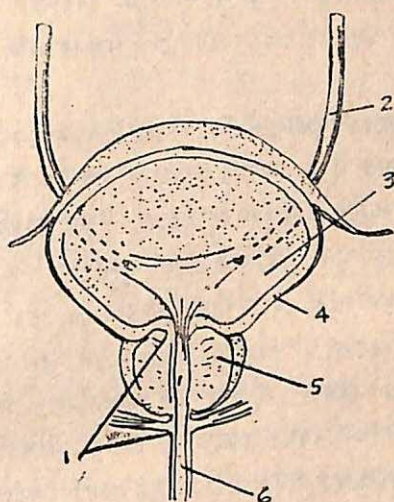
১। গোলাকার পেশী দ্বার ; ২। ইজরটার, গবিনী (বৃক্ক থেকে মূত্রস্থলী পর্যন্ত মূত্রবাহক নালী ; ৩। মূত্রস্থলী ; ৪। পেশী প্রাচীর ; ৫। প্রোসটেট গ্ল্যাণ্ড ; ৬। মূত্রনালী ; ৭। মূত্রস্থলী

মূত্র উৎপাদনের পরিমাণও যায় বেড়ে। কিছু মশলাপাতিও আমাকে বড় উত্যক্ত করে, বিশেষ করে সর্ষে, মরিচ, আদা—চা এবং কাফ পর্যন্ত খোঁচাতে ছাড়ে না আমাকে। অ্যালকোহলও বিরক্তি উৎপাদন করে আমার—বিশেষ করে জিন নামক সুরার যে গন্ধদ্রব্যগুলি থাকে, সেই গুলি।

উপেনের দেহমন্দিরের কোথায় কি ঘটছে, সে সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা সম্ভব শুধু আমার মূত্র পরীক্ষা দ্বারা। অনেক রকমের ডাক্তারী পরীক্ষাই এখন চালু আছে চিকিৎসক মহলে। কিন্তু সবরকম বাছবিচার করার পর দেখা গেছে মূত্র পরীক্ষার মত মূল্যবান পরীক্ষা সম্ভবতঃ আর দুটি নেই। উপেন যদি দেখে যে একনাগাড়ে ওর মূত্র ঘোলাটে, দুর্গন্ধযুক্ত এবং বিরঙ হচ্ছে, তাহলেই ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া ওর পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। মূত্রবর্ণ কি গভীর হলুদ বা অম্বর রঙের? এর দুটো মানে, কিডনিদ্বয় হয়তো দারুণ কাজ করে মূত্রকে অতিশয় গাঢ় করে ফেলেছে, অথবা উপেন খুব বেশী খেলাধূলা করে এবং বিস্তর ঘামাঘামি করে শরীরে জলের অংশ কমিয়ে আনার ফলে, কিডনি বেচারীদের জন্যে মূত্রাকারে বার করে দেওয়ার পর্যাপ্ত জল রাখেনি। মূত্র কি ঘোলাটে? তাহলে হয়তো কিডনি বিগড়েছে অথবা হয়তো কিছুই হয়নি। বেশী ব্যায়াম করার পর মূত্র বস্তুটার একটু ঘোলাটে হওয়ার প্রবণতা থাকে। মূত্রে কি রক্ত আছে? এর মানে কিন্তু মারাত্মক—হেলাফেলা করার ব্যাপার—নয়। মূত্রে রক্ত নিরীক্ষণ করলেই উপেন যেন কাঁচাকোঁচা খুলে দৌড়োয় ডাক্তার বাড়ী।

আজকালকার ডাক্তারেরা ব্যাপক মূত্র পরীক্ষার দিকে খুব ঝুঁকেছেন। সম পরিমাণ বিশুদ্ধ জলের চেয়ে মূত্রের ওজন যদি খুব কম দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে কিডনি দুজন আবর্জনাকে ঘনীভূত করতে অপারগ হচ্ছে, আর যদি খুব বেশী দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে রুগীর শরীরে জলের ভাগ বেজায় কমে গেছে। ইউরিক অ্যাসিড আছে কিনা? যদি থাকে এবং বেশ বেশী মাত্রায় থাকে, তাহলে বুঝতে হবে কিডনিকে বাতে ধরেছে অথবা সেখানে পাথর জমেছে। এ ছাড়াও মূত্রে ইউরিক অ্যাসিড ধরা পড়লেই সন্দেহ করতে হবে শুধু কিডনির অন্যান্য অসুখ নয়—হার্ট পর্যন্ত অসুস্থ হয়েছে। ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিদের গোলমাল

ঘটলেও মূত্রে ইউরিক-অ্যাসিডের সঙ্গে তাদের একটা সম্পর্ক দেখা যায়।

বলতে গেলে প্রায় সব দেহযন্ত্রই আবর্জনা অপসারণ অথবা বাড়তি মূত্র উৎপাদনের সঙ্গে মোটামুটি ভাবে সম্পর্কিত। গ্রন্থিদের ক্ষেত্রে এটা বেশী ভাবে প্রযোজ্য। যেমন ধরুন, অন্তঃসত্ত্বা হলে নারীদেহের অতিরিক্ত হরমোন মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। এই কারণেই গর্ভবতী হয়েছে কিনা জানার জন্যে মেয়েদের মূত্র পরীক্ষা করা হয়।

জলভর্তি থলি খালি করার চাইতেও অনেক বেশী জটিল হল মূত্র ত্যাগের প্রক্রিয়া। স্ফিংক্সটার নামে আমার দুটো ভালব অর্থাৎ দরজা আছে। মূত্র জমার পর আমি স্ফীত হলেই একটা আপনা থেকেই খুলে যায়—এর অবস্থান আমার ঠিক তলদেশে। আর একটা থাকে আর একটু নিচে এবং এর খুলে যাওয়াটা নির্ভর করে ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণের ওপর। প্রথম দ্বার উন্মোচিত হলেই উপেনের ইচ্ছে হয় প্রস্রাব করার। দ্বিতীয়টি নিজেই উন্মোচন করে প্রস্রাবাগারে যাওয়ার পর—প্রস্রাব করার সময়ে।

পেচ্ছাব করে বিছানা ভিজিয়ে দেওয়ার কারণঃ কিন্তু একটা নয়—অনেক এবং বহু বিচিত্র, শিশুদের দেহমন্দিরে আমার আকার নিতান্তই ক্ষুদ্র। কিন্তু দুই থেকে চার বছর বয়েসের সময়ে পরিসর দ্বিগুণ বেড়ে যায়। উদ্বেগ, অরক্ষিত অবস্থা, অনিশ্চিৎ ভবিষ্যৎ এবং আরও অনেক রকমের মনস্তাত্ত্বিক গোলমালের ফলে রাত্রে পেচ্ছাব করে বিছানা ভিজোয় বাচ্চারা। কারণটা ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না, তবে দেখা গেছে বিছানায় পেচ্ছাব করার বদভ্যেসটা ছেলেদেয় মধ্যে যতটা দেখা যায়, মেয়েদের মধ্যে ততটা নয়। নতুন অনভ্যস্ত পরিবেশে কোনো বাচ্চা গিয়ে পড়লে নিজেকে অরক্ষিত কল্পনা করে বিছানা ভিজোতে শুরু করে দেয় রাত্রে। বন্ধুবান্ধব জুটে গেলেই সুরাহা হয় সমস্যার। মূত্রাদি ধারণের অক্ষমতা মোটামুটি ভাবে দেখা যায় পক্ষাঘাতগ্রস্তদের ক্ষেত্রে এবং সাধারণ ভাবেই পরিলক্ষিত হয় বয়োবৃদ্ধদের বেলায়। নিউরোজেনিক (পক্ষাঘাতগ্রস্ত) মূত্রস্থলীর কথা অবশ্য আলাদা। জন্মাবধি যাদের মগজ জখম বা যাদের শিরদাঁড়া কোনো কারণে চোট খেয়েছে, তাদের মূত্রস্থলীই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় সাধারণতঃ।

প্রস্রাবের গতিবেগ একদিক দিয়ে সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে জানবেন। উপেনের প্রোসটেটের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে আমার নির্গমন পথ। কোনো কারণে প্রোসটেট ফুলে উঠলে অথবা প্রোস্টেট ব্যাধিগ্রস্ত হলে প্রস্রাবের গতি

মূত্রস্থলী

হ্রাস পায়—বন্ধ-ও হয়ে যেতে পারে। যৌনরোগ অথবা অন্য কোনো অসুখ বিসুখের ফলে মূত্রনালীর সঙ্কোচন ঘটলেও এই আপদ দেখা যেতে পারে। টিউমার হলেও পেচ্ছাবের গতিবেগ কমে আসতে পারে, বা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

শুনলে অদ্ভুত লাগবে, তবুও বলি। আমি বিনা দিব্বি বেঁচে থাকতে পারে উপেন। মারাত্মক ক্যানসারের চিকিৎসায় যদি আমাকে অপসারণের প্রয়োজন হয়, ডাক্তাররা কিডনি থেকে বেরিয়ে আসা ইউরিটার নামক সরু মূত্রনালী দুটোকে বৃহদন্ত্রে আটকে দেন। তখন কিন্তু পাখীদের দশা হবে উপেনের—পাখীদের মূত্রস্থলীর বালাই নেই।

উপেনের দেহমন্দিরের নানান অসুখ বিসুখের প্রতিফলন আমার মধ্যে দিয়ে ঘটাই ঠিকই—এ-ছাড়াও জানবেন আমার নিজের অসুখ বিসুখও আছে। পাথর জমে প্রায়ই আমার ভেতরে। মূত্রের ভেতরে আসার এবং বাইরে যাওয়ার দুটো পথই বন্ধ করে দিতে পারে এই পাথর। অকল্পনীয় যন্ত্রণার প্রাণটা বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় তখন। মূত্র জমে গিয়ে কিডনিকে স্ফীত করে তোলার পরিণামে ইউরিমিক পয়জনিং এবং মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

পাথর জিনিসটা তৈরী হয় মূত্রের তলানি থেকে। যে কোনো কারণে মূত্র যখন গাঢ় হয় তখন তলানি পড়ে মূত্রের খনিজ দ্রব্যাদির। এরাই জমে গিয়ে পাথর হয়ে যায়। নিগূঢ় কি এক কারণে জানা নেই ঠাণ্ডা আবহাওয়ার চাইতে গরম আবহাওয়াতেই পাথর জমতে বেশী দেখা যায়। ব্যায়ামের অভাব ঘটলেও পাথর সৃষ্টি হয় বলে মনে হয়। আয়তনে এরা অনেক রকমের। কেউ হয় ছোট্ট 'নুড়ি'র মতন—সহজেই বেরিয়ে যায় প্রস্রাবের সঙ্গে। চূড়ান্ত ক্ষেত্রে চোদ্দ পাউণ্ড ওজনের পাথরও দেখা গেছে মূত্রস্থলীতে।

আরও একটা অদ্ভুত কথা বলি। কমলালেবুর মত পেল্লায় পাথর নিয়েও কোনো রকম গুরুতর অসুবিধে অনুভব না করে বছরের পর বছর চালিয়ে গেছে এমন মানুষও দেখা গেছে। আমার প্রবেশ আর নির্গমন পথে যতক্ষণ না অবরোধ ঘটছে এবং পাথরের ধারালো খোঁচায় যতক্ষণ না আমার টিশুরা জখম হচ্ছে, ততক্ষণ পাথরদের নিয়ে সহাবস্থান করতে আপত্তি নেই আমার। কিন্তু পাথররা যদি বিপত্তির সৃষ্টি করে, শল্যচিকিৎসকরা তখন ছুরি কাঁচি নিয়ে নেমে পড়েন তাদের বিদেয় করার জন্য। অথবা তাঁরা একটা বিশেষ ধরনের সিসটোসকোপ আমার ইউরিথ্রা নামক পেচ্ছাবের দ্বার দিয়ে ঢুকিয়ে

দেন ভেতরে। ক্ষুদ্র এই নলের মধ্যে লেন্স থাকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবং বাদাম ভাঙার মত সাঁড়াশিও থাকে বড় পাথর ভেঙে ছোট সাইজে এনে পেচ্ছাবের দ্বার দিয়েই বার করে দেওয়ার জন্য।

সব অসুখের বড় অসুখ হল সিসটাইটিস—আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা। জীবাণুরা গুটি গুটি ঢুকে পড়ে সংক্রমণ বাঁধিয়ে বসে এবং আমাকে বড় অস্বস্তি-কর অবস্থায় ফেলে। কোনো না কোনো সময়ে বলতে গেলে প্রায় সব মেয়ে মানুষকেই এই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের এই সংক্রমণ প্রবণতার কারণটা অতি সহজ। মেয়েদের ইউরিথ্রা—মূত্রের নির্গমন নালী—মোটে এক থেকে দুইঞ্চি লম্বা। কিন্তু পুরুষদের ইউরিথ্রা লিঙ্গের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে এবং আট থেকে বারো ইঞ্চি লম্বা। এই কারণেই মেয়েদের ক্ষেত্রে বাইরের জগতের জীবাণুরা খুব অল্প পথ গিয়েই পৌঁছে যায় আমার কাছে। সৌভাগ্যক্রমে, সিসটাইটিস রোগটা যতটা বিচ্ছিরি এবং অস্বস্তিকর– ততটা মারাত্মক এবং গুরুতর নয়, ঘন ঘন পেচ্ছাব পায়, জ্বালা করতে থাকে, এবং একটা অস্বস্তি হতে থাকে। সাধারণতঃ অ্যান্টি-বায়োটিক ওষুধপত্র দিয়ে সহজেই এ-রোগ নিরাময় করা যায়।

উপেনের মনোযোগ যে হারে আমি কেড়ে নিই এবং যে-হারে আমি উৎপাত সৃষ্টি করি—সেই বিচারে গুরুত্বের দিক দিয়ে উপেনের দেহযন্ত্রদের সর্বোচ্চ সারিতে স্থান হওয়া উচিত আমার। তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে লজ্জা নেই, অতটা গুরুত্ব কিন্তু মোটেই প্রাপ্য নয় আমার। সব কথার পর সব শেষ বিশ্লেষণে আমি আসলে একটা সিসটার্ন ছাড়া আর কিছুই নই—নিয়মিত ভর্তি হচ্ছি, নিয়মিত খালি হচ্ছি।

তা সত্ত্বেও হুজুরের মতই দাপট চালিয়ে যাব আমি উপেনের ওপর—ওর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

প্রোসটেট

এই দেহমন্দির যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি আশ্চর্য যন্ত্র এই নরদেহের প্রতিটি নক্সা এঁকেছেন, ডিজাইন করেছেন—সেই সৃষ্টিকর্তার মাথা হেঁট হওয়া উচিত আমার ডিজাইন সৃষ্টির জন্যে ; নিশার দুঃস্বপ্ন বলা যায় এই ডিজাইনকে এবং আমার জন্যেই দুর্ভোগের সীমা নেই বেচারী উপেনের। ওর দেহমন্দিরে বহু উৎপাতের প্রচ্ছন্ন কারণ আমি। আয়তনে আমি বিরাট কিছু নই—প্রায় আখরোট ফলের মতন। রঙ লালচে-বাদামী। এইটুকু দেহ নিয়েই বহুবিচিত্র ব্যাধির সৃষ্টিকর্তা আমি। প্রতিরাত্রে বহুবার বাথ-রুমে ছুটতে বাধ্য করে উপেনের সুখের নিদ্রাহরণ করতে পারি আমি—অথবা ইউরিমিক পয়জনিং দ্বারা মৃত্যুও ঘটাতে পারি। দীর্ঘজীবি যদি হয় উপেন, তাহলে ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার গুরুত্বের বিচারে আর সবাইকে টেক্কা মেরে কুপোকাৎ হব আমিই সবার আগে।

সৌভাগ্যক্রমে আমার কয়েকটা ভাল দিকও আছে। উপেনের স্বাভাবিক যৌন জীবন যাপনের ক্ষেত্রে রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয় আমাকে। মানব জাতির অস্তিত্বটাই অনেকাংশে নির্ভর করে আমার ওপর। উপেনের প্রোসটেট গ্ল্যাণ্ড আমি—ওর শুক্ররসের প্রধান ভাণ্ডার। আমাকে বাদ দিয়ে ওর বউ উমার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য বললেই চলে।

প্রতিবার বীর্যস্খলনের সময়ে প্রায় পঞ্চাশ কোটি শুক্রকোষ বার করে দেয় উপেনের অণ্ডকোষেরা। সংখ্যায় পঞ্চাশ কোটি হলেও আয়তনে এরা এতই নগণ্য যে পঞ্চাশ কোটিকে এক জায়গায় জড়ো করে একটা আলপিনের মাথায় রাখলেও পিনের মাথা পুরোপুরি ভরাট হবে না। আমার কাজ এমন একটা তরল পদার্থ উৎপন্ন করা যা এদের তরলাবস্থায় এক-এক ভাগে হাজার হাজার রেখে দেওয়ার পর্যায়ে নিয়ে পারে। অত্যন্ত বিশেষ ধরনের এই তরল পদার্থে থাকে প্রোটিন, এনজাইম, চর্বি এবং চিনি—ক্ষীণজীবি শুক্রকোষদের পুষ্টির জোগান দেওয়ার জন্যে, নারী দেহযন্ত্রের মারাত্মক অ্যাসিড আকীর্ণ পথটুকু নিরাপদে পেরিয়ে যাওয়ার জন্যে, এবং একটা

জলীয় মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে ডিম্বকোষ পর্যন্ত শুক্রকোষদের অবলীলাক্রমে সন্তরণের জন্যে।

উপেনের তলপেটে আমার অবস্থান। মূত্রস্থলীর ঘাড়ে বসে আছি গ্যাঁট হয়ে। বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হওয়ার আগে পর্যন্ত আয়তনে ছিলাম জামি
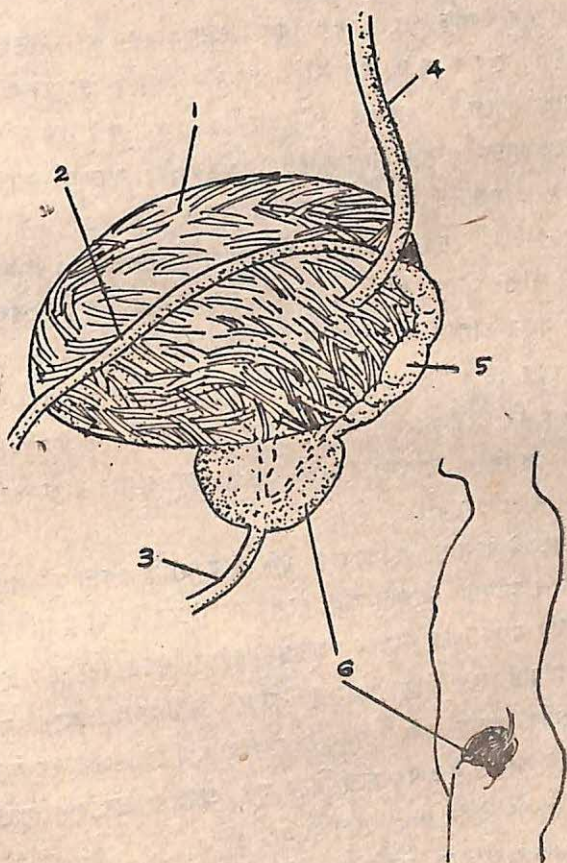
প্রোসটেট

১। মূত্রস্থলী; ২। শুক্ররজ্জু, ৩। মূত্রনালী; ৪। ইউরেটার বা গবিনী; ৫। শুক্রনালী; ৬। প্রোসটেট;

একটা বাদামের মত। তারপর হরমোনের সংকেত পৌঁছোলো আমার কাছে এবং শরীরের সর্বত্র—উপেনকে এবার বালক থেকে লোকে পরিণত করতে হবে। বাড়তে বাড়তে পৌঁছোলাম বর্তমান অবস্থায়। ক্ষুদে ক্ষুদে আঙুর গুচ্ছের মত যে-সব গ্রন্থি থেকে ক্ষরণ ঘটে, আমার সেই গ্রন্থিরাও শুক্ররস উৎপাদন আরম্ভ করে দিয়েছিল পূর্ণমাত্রায় এবং সেই শুক্ররস সঞ্চিত হয়েছিল আমার পেশীপুষ্ট থলির মধ্যে।

যৌন উত্তেজনার মুহূর্তে আমি বুঝি কি করে যে এবার সময় হয়েছে আমার ভাণ্ডার উজাড় করে দেওয়ার? প্রশ্ন করবেন না—উত্তরটা আমার জানা নেই। শুধু হুকুম তামিল করি—হুকুমটা আসে উপেনের শিরদাঁড়ার তলার প্রান্ত থেকে। সংকেত পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো জটিল ঘটনা ঘটতে থাকে আমার ধারে কাছে। মূত্রস্থলীর ঘাড়ের কাছে অবস্থিত স্ফিংক্টার ভালভ এঁটে বন্ধ হয়ে যায় যাতে মূত্র নিঃসরণ আর না ঘটে। পেশী সংকোচনের ঢেউ একের পর এক মাতাল করে তোলে আমাকে।

একই কাণ্ড ঘটতে থাকে সেমিন্যাল ভেসিক্‌ল্ দুটোর ক্ষেত্রেও। শুক্র-কোষদের সঞ্চয়-ভাণ্ডার এরা—থাকে আমার গা ঘেঁসে, দেখতে দুটো জোড়া চীনাবাদামের মত। শুক্ররস মোট যা বেরোয়, পরিমাণে তা এক চামচের মত। এর বিশ শতাংশ সরবরাহ করে সেমিন্যাল ভেসিক্‌ল্‌রা—বাকীটা আমি। দুয়ে মিলে উপেনের ইউরিথ্রা, অর্থাৎ মূত্রনালীর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যায় পরিণতি অভিমুখে।

গোড়াতেই বলেছি, স্থাপত্যের দিক দিয়ে আমি একটা মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন। তিনটে অংশ আমার—একটা ক্যাপসুলের মধ্যে রয়েছি পাশাপাশি। ছোট্ট যে মূত্রনালীটার মধ্যে দিয়ে উপেনের মূত্রস্থলী হাল্কা করে নিজেকে, সেটি কিন্তু গিয়েছে আমার অংশ দিয়ে, কোনো কারণে সেখানকার অংশ যদি স্ফীত হয়—সংক্রমণ, প্রদাহ এবং ক্যানসারের ফলে যদি প্রোসটেট বড় হয়ে ওঠে—তাহলে এই অংশগুলিও বড় হয়ে গিয়ে মূত্র প্রবাহে অবরোধ সৃষ্টি করে—পরিণামে ডেকে আনে গাদা গাদা দুর্ভোগ।

আংশিক অবরোধে মূত্র পিছু হটে মূত্রস্থলীতে গিয়ে সেখানে ডোবা বানিয়ে ফেলে; প্রায়ই জীবাণু হানা দেয় সেই ডোবায়, সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় জীবাণু, ডেকে আনে গুরুতর সংক্রমণ। এর চাইতেও খারাপ হল পথ একেবারেই রুদ্ধ হয়ে যাওয়া। মূত্র তখন আরও পিছু হটে গিয়ে

কিডনিতে পৌঁছায় এবং রক্ত প্রবাহ দূষিত হয়ে ওঠে আবর্জনা জমে যাওয়ার ফলে ; তখনি শুরু হয় ইউরিমিক বিষক্রিয়া—যে অসুখ আস্তে আস্তে মৃত্যু ডেকে আনতে পারে চৌকস মৃত্যুদূতের মত।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপেনের অণ্ডকোষের হরমোন উৎপাদন যখন ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে, যুক্তিসঙ্গত ভাবে আমারও তখন বালক বয়েসের সাইজে সঙ্কুচিত হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু অদ্ভুত কাজটা ঘটে ঠিক তখনি—ঘটে ঠিক বিপরীত। আমি আরো বড় হতে থাকি এবং চূড়ান্ত ক্ষেত্রে গ্রেপফ্রুট লেবুর মত বড় হয়ে উঠতে পারি। এই বৃদ্ধি পাওয়াটা ক্যানসার জনিত হতে পারে—নির্দোষ টিউমার সৃষ্টির জন্যেও হতে পারে—যদি ব্যাপার-টাকে 'নির্দোষ' বলা চলে না কোনমতেই।

এতদিন পর্যন্ত কপাল ভালই গেছে উপেনের। এখনো আমি স্বাভাবিক সাইজেই রয়েছি। শীগগিরই কিন্তু, অবশ্যম্ভাবীরূপে, স্ফীতি শুরু হবে। পঞ্চাশ বছর বয়েসে শতকরা বিশভাগ সম্ভাবনা থাকবে উপেনের প্রোসটেট বৃদ্ধি রোগে ভোগবার, সত্তরে পা দিলে সম্ভাবনাটা বেড়ে পৌঁছোবে পঞ্চাশে, আশীতে শতকরা আশী। স্ফীতিটা হয় কেন জানতে চাইছেন? আমার ধারণা নেই। তবে মনে হয় এর সঙ্গে যৌন হরমোনদের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে, কেন না প্রোসটেট বৃদ্ধি নপুংসকদের ক্ষেত্রে বলতে গেলে অনুপস্থিত।

উপেনের প্রোসটেট বৃদ্ধি নিয়েই যদি মাথা ঘামাতে হয়, তাহলে কিন্তু প্রোসটেট বাড়লেই যে সিরিয়াস গোলমাল দেখা দেবে—এমন ভাবনার কোনো কারণ নেই। তবে বেধড়কভাবে বেড়ে গিয়ে ইউরিথ্রাকে চেপে ধরলে মূত্রপ্রবাহের পরিমাণ কমে আসবে, বেগও কমবে। সংক্রমণ ঘটে থাকলে জ্বালাও কমবে। অন্য লক্ষণগুলো হল ঘন ঘন মূত্রত্যাগ করা এবং প্রতিবারে একটা অস্বস্তিকর অথচ নির্ভুল অনুভূতি যে মূত্রস্থলী পুরোপুরি শূন্য হয়নি।

এই সব ঘটলেই আমার হুকুম উপেন যেন ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। শতকরা বিশভাগ ক্ষেত্রে সার্জনের ছুরীতে আমাকে বাদ দেওয়ার দরকার হয়। ডাক্তার প্রথমেই দেখবেন সংক্রমণ ঘটেছে, না, প্রদাহ দেখা দিয়েছে। সুরাপান, মরিচ খাওয়া, কফি এবং চা-পান পরিহার করতে বারণ করবেন বলেই ধরে নিতে পারেন। এদের প্রত্যেকেই মূত্রের মধ্যে বিরক্তিকর উপাদান চালান করে দেয় যারা সঙ্কুচিত ইউরিথ্রাকে আরো খুঁচিয়ে পথটাকে

প্রোসটেট

আরো সরু করে আনে।

পথ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল জরুরী অবস্থার জরুরী ব্যবস্থা করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। প্রথম সমস্যা হল মূত্রনালীকে খুলে দিয়ে মূত্র বার করার ব্যবস্থা করা। এটা করা হয় ইউরিথ্রার মধ্যে দিয়ে মূত্রস্থলী পর্যন্ত নল ঢুকিয়ে দিয়ে। এরপর অনেকগুলো বিকল্প ব্যবস্থার সম্মুখীন হন ডাক্তার। আয়তনে যদি বড্ড বেড়ে যাই তাহলে আমাকে কেটে বাদ দিতে পারেন। অথচ একটা সহজতর পন্থায় সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করতে পারেন। পেন্সিলের মত সরু একটা যন্ত্র ঢুকিয়ে দেন শরীরের মধ্যে ইউরিথ্রার মধ্যে দিয়ে। আলো জ্বলে নলটায় এবং সেই আলোর লেন্সের মধ্যে দিয়ে ভেতরকার ক্ষয়ক্ষতি দেখে নেওয়া যায়। বিদ্যুত চালিত বিশেষ ধরনের ছুরিও থাকে নলের মধ্যে—যা দিয়ে অবরোধকারী টিশুদের চেঁচে পথ পরিষ্কার করে দেওয়া হয়।

আর একটা বিকল্প ব্যবস্থা হল তরল নাইট্রোজেন দিয়ে অবরোধকারী টিশুকে জমিয়ে খতম করে দেওয়া। মৃত টিশুরা পরে বেরিয়ে যায় পেচ্ছাবের সঙ্গে। উপেনের একটা অকারণ আতংক আছে এইসব ব্যবস্থা সম্বন্ধে। ওর ধারণা এর ফলে ওর পৌরুষহানি ঘটবে। মোটেই তা হবে না। প্রোসটেট সার্জারির পরেও প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে চারজন যৌন ক্ষমতা বজায় রাখে।

নির্দোষ স্ফীতি আমার কাছে বিরাট বিপদ নয়—মস্ত সমস্যাও নয়। ভয় ক্যানসারকে। বিশেষ করে আমার ক্যানসার অতিশয় বদ এই কারণে যে আগে ভাগে কোনো হুঁশিয়ারি পর্যন্ত দেয় না। কুড়ি জনের মধ্যে উনিশ জন যখন প্রোসটেট ক্যানসার নিয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হন, তখন এত দেরী হয়ে যায় যে ছুরি চালিয়ে একেবারে সারিয়ে তোলা যাবে এমন গ্যারান্টি আর দেওয়া যায় না। রোগটা খুব বিরল-ও নয়। পঞ্চাশে পা দিলে সম্ভাবনাটা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে শতকরা পঞ্চাশে।

অংকের হিসেব যতটা আতংকজনক মনে হচ্ছে, ততটা কিন্তু নয়। সাধারণতঃ আমার ক্যানসাররা বাড়ে খুব আস্তে আস্তে—কদাচিৎ দু'একটা কেসে হু-হু করে বেড়ে গিয়ে কয়েক হপ্তা বা মাসের মধ্যে ডেকে আনে মরণকে। কাজেই মরণকে-ডেকে-আনতে-পারে-না এমনি প্রোসটেট-ক্যানসার নিয়ে স্বচ্ছন্দে শ্মশান যাত্রা করতে পারে উপেন আরও পাঁচটা

রোগের যে কোনো একটায় অক্কা পাওয়ার পর—যেমন হার্টের রোগে, ধমনী শক্ত হয়ে যাওয়ায়, ডায়াবেটিসে অথবা অন্য কিছুতে।

আর একটা পয়েন্ট : আমার ক্যানসার যখন শল্যচিকিৎসারও অসাধ্য হয়ে পড়ে, তখন-ও কিন্তু অশল্য চিকিৎসা মারফৎ অনেক সময়ে প্রাণরক্ষে করা যায়। বৃদ্ধির জন্যে আমার ক্যানসারদের দরকার পুং যৌন হরমোনের উদ্দীপনা। খোজা বানিয়ে; মানে, অণ্ডকোষ বাদ দিয়ে, অথবা নারী-দেহের যৌন হরমোন দিয়ে চিকিৎসা করে একবার যদি এই সুড়সুড়িকে সরিয়ে ফেলা যায়—তাহলে প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যন্ত্রণা অদৃশ্য হয়েছে, শক্তি-উদ্যম ফিরে এসেছে, স্বাভাবিক জীবন যাত্রা শুরু হয়েছে। বিকিরণ চিকিৎসার সঙ্গে এই চিকিৎসাও পাশাপাশি চালিয়ে যাওয়া সঙ্গত।

এত এলাহি চিকিৎসা সত্ত্বেও সব দেশেই ফি-বছর হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে প্রোসটেটের ক্যানসারে। এদের দলে যাতে ভিড়তে না হয় তার জন্যে উপেনের করণীয় কি জানতে চাইছেন? ওর বরাত ভাল করণীয় অনেক কিছুই আছে। ডাক্তার যখন ওর দেহ পরীক্ষা শুরু করবেন, তখন যেন উপেন ডাক্তারবাবুকে সিরাম অ্যাসিড ফসফাটেজ টেস্টের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সাধারণতঃ এই টেস্টে যে এনজাইম ধরা পড়ে, তার অধিকাংশই সীমিত থাকা উচিত প্রোসটেটে; রক্তে সেই এনজাইমকে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা গেলেই অনুমান করে নিতে হবে যে ক্যাপসুলের মধ্যে আমার তিনটে অংশ বন্দী—তা ভেঙে গেছে এবং এনজাইম রক্তে গিয়ে মিশছে—মানে, ক্যানসার হয়েছে আমার মধ্যে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা এবার বলে ফেলি; অধিকাংশ ডাক্তারদের বিশ্বাস বছরে একবার কি দুবার যেন মলদ্বার পরীক্ষা করায় উপেন। সময় মাত্র এক মিনিট—কিন্তু প্রোসটেটে ক্যানসার হয়েছে কিনা অনেক আগে থেকেই তা জেনে ফেলার একমাত্র উপায়। ফলে, শল্য চিকিৎসা মারফৎ নিরাময়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। আমার টিশু খুব নরম রবারের মত। কিন্তু ডাক্তার আঙুল বুলিয়ে যদি টের পান শক্ত বোতামের মত কিছু একটা পুঁটলি পাকিয়ে রয়েছে নরম রবারের মত টিশুর গায়ে, তাহলে তিনি ধরে নেন রোগটা ক্যানসার। যতক্ষণ না প্রমাণ করতে পারছেন ক্যানসার নয়—ততক্ষণ তিনি নিশ্চিন্ত হন না। (দেখা গেছে, পাঁচটা

প্রোসটেট

বোতামের মধ্যে তিনটেই ক্যানসার জনিত।) ক্যানসার কিনা জানবার জন্যে উপেনের পেট কেটে অথবা ফাঁপা ছুঁচ দিয়ে খানিকটা টিশু টেনে এনে বোতাম পরীক্ষা করেন ডাক্তার। ক্যানসার প্রমাণিত হলে আমাকে চেঁচেপুঁছে বাদ দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

এত যে উৎপাত সৃষ্টি করি, তা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে উপেনের করণীয় কিছু আছে কি? আমার তো মনে হয়, নেই। তাই আবার পুরোনো কথাটাই আওড়াই : মূত্রের পরিমাণ কমে এলে, জ্বালা অনুভূত হলে এবং ঘন ঘন মূত্রত্যাগের প্রয়োজন হলেই শুধু এই সাধারণ লক্ষণ গুলো বিচার করেই উপেন যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োয় ডাক্তারের কাছে। আমি যে বিপদাপন্ন এই লক্ষণ গুলোই তারই আর্ত চিৎকার। এছাড়াও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মলদ্বার পরীক্ষাটা যেন বছরে একবার কি দু'বার করিয়ে যায় নিয়ম মত।

৯

দেহের অন্যান্য অংশ

মেরুদণ্ড

শরীর নামক এই মহাযন্ত্রের প্রত্যেকটা অংশই কিছু না কিছু কষ্ট দেয় উপেনকে। কিন্তু আমার জন্যে ও যত কষ্ট যন্ত্রণা দুর্ভোগ সহ্য করে—ততটা আর কারও জন্যে ওকে পেতে হয় না, উপেনের শিরদাঁড়া আমি। আমাকে নিয়ে ওর কল্পনা বিলাসেরও শেষ নেই।

যেমন ধরুন, ওর বিশ্বাস আমি আসলে কতকগুলো ধারাবাহিক সন্ধির সমষ্টি এবং এই সন্ধি-সমষ্টিটা মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়। বিগড়ে যায় কোথায়, এ প্রশ্নের জবাব কি দিতে পারবে উপেন? পারবে না। প্রায় প্রতি বছরেই তো আমি রেগেমেগে তেতে উঠি, তখন উপেন আমাকে পেটায়, সেঁক দেয়, ওষুধ দেয়—কিন্তু কোনোটাতেই তেমন উপকার হয় না। এত যে যন্ত্রণা দিই ওকে, তা হল আমার প্রতি ওরই বদ্ আচরণের পাল্টা জবাব। ব্যঙ্গচ্ছলেই বলা যাক, আমাকে যদি সিধে করবে বলে মনে করে থাকে উপেন,

মেরুদণ্ড

তাহলে ওর জেনে রাখা উচিত সে রকম কোনো ব্যামোই আমার নেই এবং ওর ক্ষমতাও নেই আমাকে ঠিকঠাক রাখার। এইটুকু মনে রাখলেই আর কখনো ওকে আর শিরদাঁড়ার যন্ত্রণা নিয়ে কোঁ-কোঁ করতে হবে না।

আমার ডিপার্টমেন্টে গোলমালটা শুরু হল কবে জানেন? যেদিন থেকে উপেনের পূর্বপুরুষরা ঠিক করলেন চতুষ্পদের মত চার হাত পায়ে ভর দিয়ে আর হাঁটবেন না—দু-পায়ে হাঁটবেন মেরুদণ্ড সিধে করে এবং দাঁড়াবেন মেরুদণ্ড খাড়া করে। সেই হল বিপত্তির শুরু। ঝুলন্ত ব্রীজের মত দিব্বি মেরুদণ্ডটা ঝুলছিল এদিকের দু'হাত আর ওদিকের দু'পায়ের ওপর। অত্যন্ত আরামদায়ক এই অবস্থা থেকে আমাকে তাঁবুর খুঁটি করা হল। শুধু কি খুঁটি—হরেকরকম গুণপনার অধিকারীও হতে হল তাকে: তাঁবুর খুঁটি তো সিধে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু আমাকে হেঁট হতে হবে, মোচড় খেতে হবে, মুণ্ডুটাকে নিয়ে এদিক ওদিক পাক খাওয়াতে হবে এবং শরীরের বেশীর ভাগ ওজনটাকে বহন করতে হবে।

উপেনের ১৮ ইঞ্চি লম্বা মেরুরজ্জুকে আগলেও রাখতে হবে আমাকে। আধ ইঞ্চি পুরু এই সাদাটে দড়িটার গুরুতর কোনো ক্ষতি হলেই উপেনকে বাকী জীবনটা চাকাওয়ালা চেয়ারে বসে কাটিয়ে দিতে হবে। কেন না লক্ষ লক্ষ বার্তা অবিরাম আনাগোনা করছে এই মেরুরজ্জু মারফৎ—ঘাড়ের নিচেও যা কিছু তৎপরতা, তার প্রতিটির হুকুম আসছে এই দড়ি থেকে। তিন স্তরের খাপে মুড়ে আগলাচ্ছি এই মেরুরজ্জুকে, ধাক্কার চোট সামলে নেওয়ার জন্যে জলীয় স্নানাগারের ব্যবস্থা রেখেছি, সেই সঙ্গে আছে হাড়ের বাড়ী।

একত্রিশ জোড়া স্নায়ুগুচ্ছ বেরিয়েছে এই রজ্জু থেকে। এদের প্রায় অর্ধেক সেনসরি—খবর নিয়ে যায় ব্রেনে; বাকীগুলো মোটর—ব্রেন থেকে খবর নিয়ে যায় পেশীতে। কিছু পরিস্থিতিতে নিজেই চিন্তা করে নেয় রজ্জু। ধরুন গরম উনুনে আঙুল দিয়েছে উপেন। খবরটাকে ব্রেনে পাঠিয়ে সেখান থেকে আনবার সময় কোথায়? রিফ্লেক্স অ্যাকসনের হুকুম দেয় আমার রজ্জু। রিফ্লেক্স অ্যাকসনের বাংলা মানে প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া। ঝট করে আঙুলটা সরে যায় উনুন থেকে।

আমার রজ্জু দ্বারা উপেনের সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাটা একটু সুদূর পরাহতই বলা যেতে পারে। আমার ৩৩টা কশেরুকা আর তাদের লাগোয়া
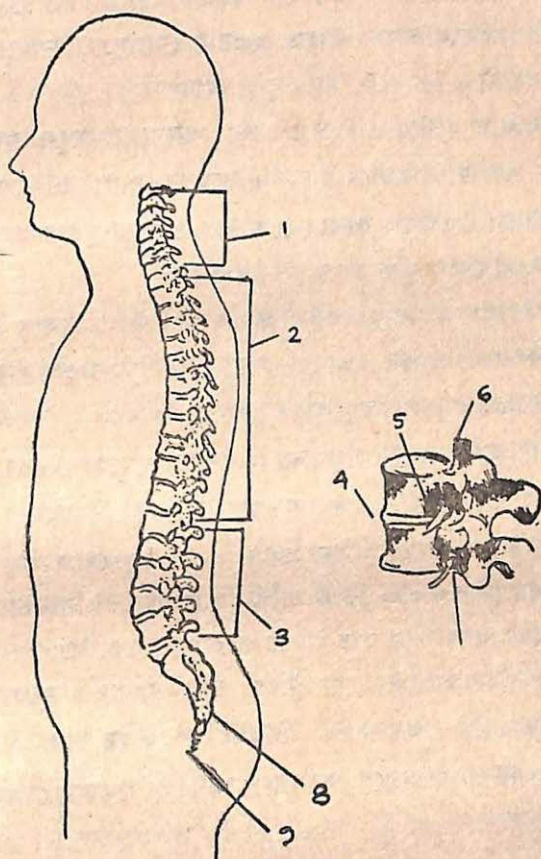
মেরুদণ্ড

১। ঘাড়ের কাছে কশেরুকা (সারভাইক্যাল ভার্টিব্রা) ; ২ । বক্ষপঞ্জরের
কশেরুকা (থোরাসিক ভার্টিব্রা) ; ৩। কোমরের কশেরুকা (লামবার
ভার্টিব্রা) ; ৪। চাকতি ; ৫। মেরুদণ্ডীয় স্নায়ু ; ৬। সুষুম্নাকাণ্ড (স্প্যাইনাল
কর্ড), ৭। ভাঙা চাকতির উপাদান মেরুদণ্ডের স্নায়ুর ওপর চাপ দিচ্ছে।

কাঠামোদের কথা কিন্তু আলাদা। বিস্তর কারণে বেদনা দেখা যায় এই জায়গায় : কিডনির গোলমাল, লিভার বা প্রোসটেটের ব্যামো, আরথ্রাইটিস এবং বিবিধ সংক্রমণ ; এমন কি আবেগ পর্যন্ত যন্ত্রণা জাগায় আমার অঞ্চলে। উদাহরণ স্বরূপ, বেশ কয়েকবার বিরাট দুশ্চিন্তা নিয়ে দিনের পর দিন পাগলের মত থেকেছে উপেন। শিরদাঁড়ার চাপা ব্যথা দেখা দিয়েছে তখন। দুশ্চিন্তার সঙ্গে আমার আহত হওয়ার যোগসূত্রটা মাথায় আসেনি উপেনের। যথারীতি ভেবেছে, আমি বুঝি বিগড়েছি।

কিন্তু আসলে যা হয়েছে তা এই : কড়া আবেগের ফলে শক্ত হয়েছে পেশী ; দিন কয়েক মাঝারিভাবে টান-টান হয়ে থাকার পর চাপা ব্যথার মধ্যে দিয়ে নিজেদের ক্লান্তি ঘোষণা করেছে পেশীরা। দুশ্চিন্তা দূর করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমিও ব্যথা থেকে মুক্তি দিয়েছি উপেনকে।

আমার গঠন প্রণালী নিয়ে একটু চিন্তা করলেই উপেন বুঝবে শিরদাঁড়ার ব্যথা হয় কেন! একদম ওপরে রয়েছে আমার সাতটা সারভাইক্যাল ভারটিব্রা —নড়াচড়ার অসাধারণ ক্ষমতা আছে এদের। উপেনের মুণ্ডকে শুধু খুঁটির ডগায় ধরেই এরা ক্ষান্ত নয়। মোচড় মেরে বেঁকেচুরে মুণ্ডকে নামাতেও পারে যাতে উপেন দেখতে পায় মাটিতে কি আছে ; ওপরেও বেঁকিয়ে তুলতে পারে যাতে উপেন তারা আর চাঁদ দেখে মোহিত হতে পারে। পাশের দিকেও ১৮০ ডিগ্রী পর্যন্ত ঘুরতে পার এই সাতটা কশেরুকা —ফলে দু'কাঁধের ওপর দিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে পারে উপেন।

এর পরেই রয়েছেবারোটা থোরাসিক ভারটিব্রা অর্থাৎ বুকের কশেরুকা এরা অতটা নড়াচড়ায় সক্ষম নয়। তার দরকারও হয় না। পাঁজরাগুলো আঁকশির মত আটকানো রয়েছে সেখানে। কদাচিৎ গোলমাল দেখা যায় এই অঞ্চলে।

তলার প্রান্তে রয়েছে পাঁচটা ভারী লামবার কশেরুকা—উপেনের বেশীর ভাগ ওজন বহন করছে এরা ; লামবার ভার্টিব্রার তলদেশে রয়েছে ত্রিকাস্থি (স্যাকরাম) আর অনুত্রিকাস্থি (ককিক্স) উপেনের পূর্বপুরুষদের ল্যাজের অবশিষ্টাংশ। ত্রিকাস্থির মধ্যে আছে পাঁচটা অংশ—জুড়ে একটা হয়ে গেছে। এই তলদেশ টুকুই জানবেন যত গণ্ডগোলের মূল —বিশেষ করে চতুর্থ এবং পঞ্চম লামবার কশেরুকার আশপাশের জায়গাটা।

উপেন যখন ভূমিষ্ঠ হয়, আমি তখন মোটামুটি সিধেই ছিলাম। তারপর যখন একটু একটু করে মাথা খাড়া করতে শিখল, ঘাড়ের অঞ্চলে আমার কশেরুকাদের বেঁকে যেতে হল। হাঁটি-হাঁটি পা-পা করার সময়ে আর একটা বাঁক দেখা দিল তলার দিকে। ফলে, আজ আমি মোটামুটি ইংরেজী 'S' অক্ষরের আকার লাভ করেছি। সত্যি কথা বলতে কি, একদম সিধে শিরদাঁড়ায় চাইতে এই অবস্থা অনেক ভালো—কেন না বাঁক গুলো ধাক্কা সামলে নেয় ; এক কথায় এরা উত্তম 'শক অ্যাবজর্বার'।

শক অ্যাবজর্বার আরো আছে—থাকতেই হবে। প্রতি পদক্ষেপে একশ পাউণ্ড ধাক্কা চালান করছে উপেন কশেরুকাদের ওপর, এই ধাক্কার পরিণামে যদি কশেরুকায় সরাসরি ঘষাঘষি লাগতো, তাহলে বেশী দিন টিঁকতে হত না আমাকে। প্রতি জোড়া কশেরুকার ঠিক মাঝখানে গদীর মত রয়েছে ডিস্ক অথবা চাকতি। চর্বি দিয়ে ভাজা মুচমুচে ময়দার লেচির মত এরা শক্ত তরুণাস্থির মোড়ক। মোড়কের মধ্যে থাকে থকথকে জেলীর মত একটা স্থিতিস্থাপক পদার্থ। কখনো সখনো শিরদাঁড়ার যন্ত্রণায় কাহিল হলেই উপেন বলে 'ডিস্ক স্লিপ' করেছে—মানে, দুই কশেরুকার মাঝের এই তরুণাস্থির চাকতি পিছলে সরে গেছে। বলা বাহুল্য ধারণাটা ভুল। জীবনে কখনো ওর কশেরুকার চাকতি সরে যায়নি। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ঝামেলার খদ্দের হতে চলেছে যখন, তখন ব্যাপারটা সম্বন্ধে ওর একটু জ্ঞানলাভ করা দরকার।

বেশ কয়েক রকমের চোট লাগতে পারে চাকতিগুলোয়। সত্যিকারের বড় সংঘাতে—যেমন, গাড়ী অ্যাকসিডেন্ট অথবা সাংঘাতিকভাবে পড়ে যাওয়া—স্রেফ গুঁড়িয়েও যেতে পারে একটা চাকতি—সাধারণতঃ গুঁড়োয় শিরদাঁড়ার তলার দিকের কোনো একটা। তখন বড় রকমের শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন। ভাঙা চাকতির টুকরো টাকরা বার করে এনে জুড়ে দেওয়া হয় দুটো কশেরুকাকে। এর চাইতে কম চোট লাগলে চাকতির শক্ত মোড়ক ফেটে ভেতরকার স্থিতিস্থাপক জেলী বেরিয়ে যায়। এর ফলে তীব্র যন্ত্রণা দেখা দিতে পারে। ফাটা চাকতি চাপ দেয় আমার স্নায়ুর ওপর এবং উত্যক্ত স্নায়ুটি খিঁচুনি সৃষ্টি করে আমার কোনো এক পেশীতে। খিঁচুনিটা কিন্তু আমাকেই আগলানোর প্রয়াস, আমি ঝঞ্ঝাটে পড়েছি অনুভব করে পেশীটা তক্তা দিয়ে ভাঙা হাড় জোড়ার মত আমাকে আরো

নড়াচড়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে যাতে ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে না যায়।

পেশীর খিঁচুনির অন্য ফলাফলও আছে। মানুষটাকে মুচড়ে একসা করে ছাড়ে—শরীরের ভূগোল পালটে দেওয়ার মত ব্যাপার আর কি—হেলে পড়তে বাধ্য করে, সামনের দিকে ঝুঁকতে হয় খিঁচুনির দমকে। প্রায় সব সময়েই জানবেন ফেটে যাওয়া চাকতি সিয়াটিক নার্ভকে উত্যক্ত করে—যে নার্ভ গিয়েছে পা পর্যন্ত। ভয়াবহ যন্ত্রণাটা তখন নেমে যায় পায়ের আঙুল পর্যন্ত।

অধিকাংশ ব্যক্তির মত উপেনের শিরদাঁড়ার ব্যথা আসে দুর্বলতা থেকে, আর আমাকে যারা নানান ভাবে খাড়া করে রেখেছে, সেই ৪০০ পেশী আর ১০০০ সন্ধিবন্ধনী থেকে। আমার পেশীদের দুরবস্থাটা ওর জানা দরকার—জানলে বুঝবে কতখানি অবিচার চলছে বেচারীদের ওপর। ওর ধারণা কি রোববার গঙ্গার পাড়ে ছুটোছুটি করলেই বুঝি ওর শরীরখানা বেতের মত ছিপছিপে থাকবে। কিন্তু তা নেই। উপেন যে কটা বোঝা আমার ওপর চাপিয়েছে, তার ফিরিস্তিটা পুরো দিচ্ছি না—কিছুটা তুলে ধরছি। পড়লেই বুঝবেন কেন এত হেদিয়ে মরছি আমি।

নেয়াপাতি ভুঁড়ি দেখা দিয়েছে উপেনের—বাড়তি দশ পাউণ্ড তো বটেই। যেহেতু কিছুদিন ধরেই ওর পেটের পেশীরা এলিয়ে পড়ছে—আগেকার শক্তি হারিয়ে ফেলছে—বাধ্য হয়ে আমার পেছনকার পেশীদের বইতে হচ্ছে এই বাড়তি বোঝাকে। (ঠিক এই কারণেই কিন্তু গর্ভবতী অবস্থায় উপেনের বউ উমার শিরদাঁড়ায় অত ব্যথা করত—পেটের বাড়তি বোঝা বইতে হত বলে।)

আরও ধরুন, আজও ঠিকভাবে বসতে শেখেনি উপেন। এন্তার গদী আর কুশন মোড়া সোফা আর চেয়ারে এঁকে বেঁকে বসে ভারী আরাম পায়। বিশ্রামটা ওর হয়—আমার পেশীদের নয়। নিয়মিত কর্তব্য করার পরেও ওভারটাইম খাটতে হয় বেচারীদের আমার কশেরুকার মধ্যে সুসম অবস্থা বজায় রাখার জন্যে। উপেনের চেয়ারখানা দেখেছেন? যে চেয়ারে বসে ও টেবিলের কাজ করে, সে চেয়ারে নরম গদী আছে ঠিকই এবং দরকারমত এদিক ওদিক ঘুরিয়ে কাজও করা যায় বুঝলাম—খুবই দামী চেয়ার সন্দেহ নেই—কিন্তু আমার কাছে চেয়ারখানা একটা মূর্তিমান

আতংক। দিনের পর দিন ঐ চেয়ারে বসার দরুন একই ধরনের চাপ গিয়ে পড়ছে একই পেশীদের ওপর। সাদামাটা চেয়ার বসে পা দুখানা আড়া-আড়ি ভাবে রাখলে বরং আমি স্বস্তি পেতাম বিলক্ষণ। সবসময়ে তো পা ক্রশ করে বসা যায় না, কিন্তু যখনি সম্ভব তখনি যদি এইভাবে বসে আমাকে জিরেন দিতে পারে, তাহলে আমি কৃতার্থ হই। উপেন আমাকে লীভার অর্থাৎ ওজন তোলার ডাণ্ডা মনে করে। মোটেই তা নই আমি। লীভার ওর হাত আর পা। আমার আদর্শ পজিশন হল সিধে থাকা। ভারী কিছু তোলার দরকার মনে করলে উবু হয়ে বা আসন পিঁড়ি হয়ে বসে কাজটা যেন করে উপেন—বোঝাটা যেন দু'পায়ের ওপর দিয়েই যতখানি সম্ভব যায়—আমি যেন রেহাই পাই। ওজন তোলার ডাণ্ডা আমি নই—এই কথাটা যেন অষ্টপ্রহর খেয়াল থাকে উপেনের—বিশেষ করে এই বয়েসে।

সবচেয়ে ভাল হয়, উপেন যদি ভারী বোঝা বওয়ার ধার কাছ দিয়েও না যায়। এমনিতেই কাহিল হয়ে পড়ছে আমার পেশীরা। বেদম হয়ে পড়ছে রোজের কর্তব্য করতে। এরপর যদি বাড়তি বোঝা চাপানো হয়, এমন কি এঁটে বন্ধ হয়ে যাওয়া জানলা খুলতে গিয়ে চাপ সৃষ্টি করা হয় বেদম পেশীদের ওপর, তাহলে গুরুতর মচকানি অথবা চাকতির সমস্যা দেখা দিতে পারে। ওর খেয়াল রাখা উচিত দুই কশেরুকার মধ্যবর্তী গদীগুলো আগে যেমন শক্ত ছিল, এখন আর তেমন নেই। সত্যি কথা বলতে কি, উপেন যখন বিশ বছরের তরুণ, তখন থেকেই গদীরা নরম হতে শুরু করেছে, একটু একটু করে স্থিতিস্থাপকতা হারাতে আরম্ভ করেছে। তা সত্ত্বেও এখনকার এই অবস্থাতে পৌঁছেও বহু বছর নির্ঝঞ্ঝাট সেবা করে যেতে পারবে ওরা। কিন্তু অপ-ব্যবহার করার পর্যায়ে এখন ওদের কেউ নেই—উপেন মহাশয়, ভুলবেন না কথাটা।

লামবার অঞ্চলে আমার ব্যথা বেদনার কথাই বললাম এতক্ষণ। ওপরের অঞ্চলেও সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে বইকি। দৈবাৎ কখনো ঘাড়ের কাছে চাকতি ফেটে যেতে পারে। যন্ত্রণা ছড়িয়ে দিতে পারে দু'হাত বরাবর। মাঝে মাঝে ঘাড় আড়ষ্ট হয়ে যায় উপেনের; সন্ধি বন্ধনী অথবা পেশীরা টান-টান হয়ে থাকে বলেই এই দুর্ভোগ পোহাতে হয় বেচারীকে। সবচেয়ে বড় সমস্যা অবিশ্যি ঘাড় ভেঙে যাওয়া। কিছু উপদেশ দিয়ে রাখি এই সুযোগে। গাড়ী দুর্ঘটনার অকুস্থলে দৈবাৎ যদি সর্বাগ্রে গিয়ে পড়ে

উপেন, তাহলে জখম মানুষটা হাত আর পা নাড়াতে পারছে, এইটা না জানা পর্যন্ত তাকে যেন স্পর্শও না করে সে। মেরুদণ্ড ভাঙা মানুষটার মাথা তুলে ধরতে গিয়ে মেরুমজ্জাকে আরো জখম করে বসতে পারে উপেন—ফলে স্থায়ী পক্ষাঘাতে বাকী জীবনটা পঙ্গু হয়ে যেতে পারে আহত ব্যক্তিরা।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড়েরাও দুর্বল হয়। কশেরুকাদের ক্ষেত্রেও তা আরম্ভ হয়ে গেছে: ক্যালসিয়াম বেরিয়ে যাচ্ছে নিয়মিত। চাকতিরা যতই নরম হয়ে আসছে, কশেরুকারা যতই কম নিবিড় হয়ে আসছে, উপেনের পিঠও তত বেশী ধনুকের মত বেঁকে আসবে। বুড়ো বয়সের ঈষৎ কুঁজ দেখা দেবে এখন থেকেই। সামান্যই যত্ন আত্যি দরকার আমার এখন থেকে—উপেন যদি সেদিকে একটু নজর দেয়, তাহলেও বহু বছর সেবা করে যেতে পারব কষ্ট না দিয়ে এবং বহু দুর্ভোগের হাত থেকে ওকে পরিত্রাণ দিয়ে। এখনই নিজের দাঁড়ানোর আর বসার ভঙ্গীটা ঠিক আছে কিনা যাচাই করে নিক। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াক দৃঢ়ভাবে—যতটা সম্ভব। তার পর পেছনে হাত চালিয়ে রাখুক পিঠের সঙ্কীর্ণ অঞ্চলে। খুব কম জায়গাই থাকা উচিত। জায়গা যত বেশী থাকবে, বুঝতে হবে আমি তত বেশী তেউড়ে যাচ্ছি —সম্ভবতঃ পেশীদের দুর্বলতার জন্যে—যত বেশী তেউড়ে যাবো ততই উপেন বেচারীকে দুর্ভোগের মধ্য ফেলবার সম্ভাবনা কিন্তু বাড়বে।

সব সমস্যার মূল কিন্তু এক জায়গায়—পেশী দুর্বলতা। পেশীদের সবল করার ব্যায়ামের জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত উপেনের। রোজ মিনিট কয়েক ব্যায়ামের জন্যে খরচ করলে, শক্ত চেয়ারে বসলে এবং শক্ত বিছানায় শুলে, দাঁড়ানোর এবং বসবার ভঙ্গী সঠিক রাখলেই আমি বর্তে যাবো। সামান্য দাম পেয়েই অসামান্য উপকার করে যাবো এখনো বহু বছর। আমি সুস্থ থাকলেই মালিককে সুস্থ রাখব। এবং আমাকে সুস্থ রাখতে হবে উপেনকেই, তবে না আমি সুস্থ রাখব ওকে।

উরুর হাড়

উপেনের ধারণা আমরা এই হাড়েরা নাকি মড়া জিনিস—ওর জ্যান্ত বপুটার একটা জড় কাঠামো ছাড়া আর কিছুই নয়। ধারণাটা কিছুটা ঠিক। আমরা না থাকলে ও একটা থলথলে জেলীর পিণ্ড বনে যেত, হাঁটতে পারত না, কথা বলতে পারত না, খেতে পারত না। কিন্তু আমরা আর যাই হই, মড়া নই, জড়ও নই। উপেনের বপুটাকে কাঠামো হিসেবে ধরে রাখা ছাড়াও আমাদের বিস্তর দায়ীত্ব রয়েছে—কারণ আমরাও যে দেহযন্ত্র। বলতে গেলে শরীরের প্রায় সমস্ত খনিজ সরবরাহটাই রয়েছে আমাদের মধ্যে—উদাহরণ স্বরূপ ধরুন ওর ৯৯ শতাংশ ক্যালসিয়াম আর ৮৮ শতাংশ ফসফরাস ছাড়াও অত্যাবশ্যক খনিজ দ্রব্যাদিদের কিছু কিছু এবং তামা আর কোবাল্টও অল্প পরিমাণে চালান করছি আমরা, এই হাড়েরা। চব্বিশ ঘণ্টা গুদোম খোলা রেখেছি আমরা—অবিরাম মাল আসছে, মাল যাচ্ছে।

এ ছাড়াও আমাদের সদাব্যস্ত প্রস্তুতি বিভাগও রয়েছে—উৎপাদন চলছে সেখানে বিরামবিহীনভাবে—নাম তার হাড়ের মজ্জা। বয়স বৃদ্ধির ফলে মাত্র এক মিনিটেই উপেনের কতগুলো লাল রক্ত কোষ মারা যাচ্ছে বলুন তো? ১৮ কোটি! অবিশ্বাস্য? মনে হয়—কিন্তু সত্যি। উপেনের প্লীহা আর যকৃৎ থেকেও বদলি আসছে—যারা মরছে তাদের জায়গা দখলের জন্যে—কিন্তু বেশীর ভাগটাই যায় আমাদের কাছ থেকে। হাড়েরা মজ্জার স্পঞ্জের মত ভেতরকার কুঠরিতে সাদা রক্তকোষের বেশীর ভাগ উৎপাদন করে চলেছি আমরা সংক্রমণের খপ্পর থেকে উপেনকে রক্ষে করার জন্যে।

উপেনের ডান উরুর হাড় আমি—ইংরেজিতে যার নাম ফিমার। অন্য হাড়দের হয়ে আমি একাই কথা বলব শুধু একটা কারণে, আমিই ওর শরীরের বৃহত্তম, দীর্ঘতম এবং বলিষ্ঠতম অস্থি—এত বলিষ্ঠ যে একটা ছোট গাড়ীর ভার পর্যন্ত বহন করতে সক্ষম। আমরা এই হাড়েরা একটা বৃহৎ পরিবার! উপেনের সাধের শরীরটার মধ্যেই আমাদের

সংখ্যা ২০৬। কারও থাকে বেশী, কারও কম। উপেন যখন বালক, তখন ওর হাড়ের সংখ্যা ছিল এখনকার চাইতে বেশী। জন্মেছিল শিরদাঁড়ায় ৩৩টা কশেরুকা নিয়ে। তারপর তলার দিকে চারটে জুড়ে গিয়ে অনুত্রিকাস্থি (ককিস্ক) হয়ে গেল এবং আরও পাঁচটা জুড়ে গিয়ে হল ত্রিকাস্থি (স্যাকরাম)। ওর পাঁজবার সংখ্যা এগারো জোড়াও হতে পারত। আসলে বেশীর ভাগ মানুষের মত ওর আছে বারো জোড়া।

আকার এবং আয়তনে আমরা এই হাড়েরা রকমারি : আমি তো দীর্ঘতম, বৃহত্তম এবং বলিষ্ঠতম—ক্ষুদ্রতম হাড়েরা রয়েছে মাঝের কানে—যাদের দৌলতে এ-জগতের শব্দসুধা শুনতে পায় উপেন মহাশয়। ওর বাঁ পায়ে আমার পার্টনার আর আমি দুজনে মিলে ওর ওজন বহন করি। সন্ধিবন্ধনী একসঙ্গে বেঁধে রেখে দিয়েছে আমাদের, মানে, হাড়েদের। কণ্ডরা অর্থাৎ টেনডন আঁকশির মত আমাদের আটকে রেখেছে পেশীর সঙ্গে ; সুতো যেমন পুতুল নাচায়। ওরাও তেমনি আমাদের নড়তে চড়তে সক্ষম করে।

মূল দু'ধরনের টিশু দ্বারা নির্মিত আমরা ; এক ধরনের হল ক্যানসেলাস —এরা হাল্কা আর ছিদ্রময় ; আর এক ধরনের হল দৃঢ়, নিবিড় এবং নিরতিশীয় বলিষ্ঠ। উপেনের মেরুদণ্ড আর শ্রোণীচক্র (পেলভিস) মূলতঃ প্রথম শ্রেণী দিয়ে তৈরী ; কিন্তু আমি আর ওর হাত-পায়ের হাড়েরা প্রাথমিকভাবে দ্বিতীয় শ্রেণী দিয়ে নির্মিত। নির্মাণ শিল্পের প্রতিভারা এ-যুগে যে বিস্ময়কর আবিষ্কারে স্মরণীয়, লক্ষ লক্ষ বছর আগে আমরাই তা সবার আগে আবিষ্কার করেছিলাম ; সমান ওজনের রডের চেয়ে টিউব অনেক বেশী শক্ত। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের একশ গ্রাম হাড় জানবেন একশ গ্রাম নিরেট ইস্পাতের চেয়ে অনেক বেশী শক্ত।

উপেন যখন জন্মায়, তখন ওর হাড়েরা ছিল অনেক নরম। অবিশ্যি নরম ছিল বলেই জন্মাতে সুবিধে হয়েছে। অস্থিকরণের সূক্ষ্ম জটিল পন্থায় ওরা আগের চেয়ে কঠিন হয়েছে। ওসটিওব্লাস্ট নামে লক্ষ লক্ষ কোষ রয়েছে আমাদের এই হাড়েদের দেহে—আঁশযুক্ত একরকম প্রোটিন ঠেলে বেরিয়ে আসে এইসব কোষ থেকে। নমনীয় কিন্তু দৃঢ় এই প্রোটিনের নাম কোলাজেন। আঁশগুলোর মাঝে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ফাঁক ফোকরে আঠাযুক্ত

একটা মিশ্র পদার্থ থাকে, এদের বলা হয় ভিত্তিবস্তু। এই ফাঁক ফোকরগুলো মূলতঃ ক্যালসিয়াম, ফসফরাস আর কার্বোনেটের ছোট ছোট খনিজ কণা দিয়ে ভরাট হতে থাকলেই জন্ম হয় হাড়েদের। কণাগুলো বলাবাহুল্য এতই ছোট যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। কাজটা শেষ হওয়ার পর উপেনকে বহন করার মত বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল পদযুগল।

উপেন যখন বালক, তখন কিন্তু আমাদের ওপর দিয়ে যে ঝকি গিয়েছে, তা কহতব্য নয়। ওর বপুটাকে কাঠামোর ঠেকনা দিয়ে খাড়া রাখতে হয়েছে, একই সঙ্গে নিজেদেরকেও বাড়াতে হয়েছে। কম কাজ নয় কিন্তু—

উরুর হাড়
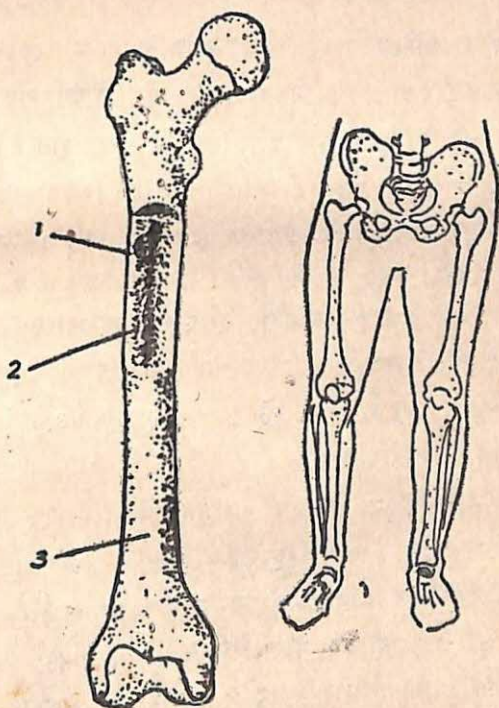
১। নিরেট হাড়; ২। হাড়ের ভেতরকার নরম শাঁসালো উপাদান; ৩। ডানদিকের উরুর হাড়;

বসতবাড়ীর বাসিন্দাদের কারও বিরক্ত উৎপাদন না করে বাড়া বাড়িয়ে চলার মত ব্যাপার আর কি। সেই সময়ে লম্বা লম্বা হাড়গুলোর প্রান্তে কিছু কিছু অঞ্চল নরম তরুণাস্থি দিয়ে তৈরী ছিল। নতুন তরুণাস্থি তৈরী অব্যাহত থাকায় ভেতরকার পুরোনো তরুণাস্থিগুলো শক্ত হাড়ে পরিণত হচ্ছিল। উপেন প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তরুণাস্থির এইসব অঞ্চলগুলো নিরেট হয়ে যায় এবং নতুন কোনো বৃদ্ধিও আর সম্ভব ছিল না। লম্বায় যখন আমরা বড় হতে পারি না, পেশীদের মত তখন আমাদের নিজেদের উপাদান বাড়িয়ে তুলতে পারি, ঝরিয়েও দিতে পারি—আরও বলিষ্ঠ অথবা আরও দুর্বল হতে পারি। ভারবহনের ব্যায়াম করতে বলুন উপেনকে, দেখবেন আমি আরও বলিষ্ঠ, আরও নিবিড়, আরও মোটা হয়ে উঠছি, কয়েক সপ্তাহ শুয়ে থাকতে বলুন বিছানায়—দেখবেন আমি কত দুর্বল হয়ে গেছি।

ক্যালসিয়ামকে জমিয়ে রাখা আর ক্যালসিয়ামকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে আমার ভূমিকা কিন্তু বিষম ও চূড়ান্ত পরীক্ষামূলক। সিদ্ধান্তে ঈষৎ ভুলচুক ঘটলেই বিপর্যয়। আমার যা কিছু কাজ কারবার সব রক্তের মধ্যে দিয়েই—আমার নিজেরও রক্তবাহ আছে এবং তা বিস্ময়করভাবে বিপুল। আমার খনিজ কৃস্ট্যালদের রক্তস্রোতে ছেড়ে দিই, রক্তের বাড়তি ক্যালসিয়ামকে বেছে নিয়ে আসি, কম থাকলে আমার ভাঁড়ার থেকে সাপ্লাই দিই। যত কৃস্ট্যাল আমরা হাড়েরা রক্তপ্রবাহে ছেড়ে দিই, তাদের সবার উপরিভাগটুকুর যোগফল এত বিরাট যে মুণ্ড ঘুরে যাওয়ার মত; এদের সবাইকে চেপ্টে রেখে দিলে ৪,৮৪.০০০ বর্গগজ জমি দখল করে নেবে! ভাবতে পারেন ?

আমাদের ক্যালসিয়াম ভাঁড়ার আনুপাতিক হিসেবে বিপুল—মোট ২·২ পাউণ্ড। কিন্তু যে কোনো মুহূর্তের হিসেব যদি ধরেন, তাহলে দেখবেন এক আউন্সের চল্লিশ ভাগের মাত্র একভাগ ক্যালসিয়াম চর্কি-পাক দিচ্ছে—ওর রক্তপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে। পরিমাণটা নগণ্য সন্দেহ নেই—কিন্তু এই সামান্য ক্যালসিয়াম মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে প্রতিটি মূহূর্তে। এইটুকু ক্যালসিয়াম যদি রক্তে বর্তমান না থাকে, রক্ত তাহলে ডেলা বাঁধবে না এবং স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে কোনো তাড়না, আবেগ অথবা চিন্তা না করে হঠাৎ কাজ করে ফেলবার কোনো ঝোঁকও যাতায়াত

করবে না। বন্ধ হয়ে যাবে পেশীসঙ্কোচন—সেই সঙ্গে হৃদঘাত। অতিরিক্ত ক্যালসিয়ামও গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে—খুব সম্ভব কিডনিতে পাথর সৃষ্টিতে কিছুটা অবদান রাখে। এর পরের ধাপ : রক্তে মূত্রের বিষক্রিয়া এবং মৃত্যু।

ভয়াবহ তথ্যগুলোর উল্লেখ করছি ভয় দেখানোর জন্যে নয়—ক্যালসিয়াম ভাঁড়ারে মজুদ রাখাটা এবং উপেনের রক্তে সঠিক পরিমাণে ক্যালসিয়াম ছেড়ে দেওয়াটা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ—তা হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্যে। মূল নিয়ন্ত্রণ কর্তারা রয়েছে কিন্তু উপেনের ঘাড়ের কাছে। রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমে এলেই একটা হরমোন উৎপাদন শুরু করে প্যারা-থাইরয়েড়—আমার কাছে যা কাজ শুরু করার সংকেত। রক্তে ক্যালসিয়াম বেড়ে গেলেই থাইরয়েডের একটা হরমোন আমাকে বাধ্য করে বাড়তি ক্যালসিয়াম শুষে নিতে।

উপেনের ধারণা হাড় ভেঙে যাওয়াটাই বুঝি আমাদের একমাত্র সমস্যা। কিন্তু ভেঙে যাওয়াটা আমাদের কাছে অনেক কম উদ্বেগের ব্যাপার। ভাঙনটা আসে মূল চাররকম ভাবে : বন্ধ, মানে যেখানে ভাঙাটা পরিষ্কার এবং হাড় চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসেনি। একেই বলা হয় সিম্পল ফ্র্যাকচার। খোলা, মানে যেখানে হাড় চামড়া ফুটো করে বেরিয়ে এসেছে। এর আরেক নাম কমপাউণ্ড ফ্র্যাকচার। গ্রীন-স্টিক ফ্র্যাকচার অর্থাৎ যে হাড়-ভাঙায় হাড় লম্বালম্বিভাবে ভাঙে—পুরোপুরি ভাঙে না। অসম্পূর্ণ এই হাড়ভাঙা বাচ্চাদের বেলায় দেখা যায় যখন, তখন তার নাম গ্রীন-স্টিক ফ্র্যাকচার—নইলে ইনকমপ্লিট ফ্র্যাকচার। সবচেয়ে যাচ্ছেতাই হাড়ভাঙাটার নাম কমিনিউটেড ফ্র্যাকচার—হাড় কয়েক টুকরো হয়ে ভেঙে যায়।

এই সেদিন পর্যন্ত হাড় ভাঙলে চিকিৎসা হয়েছে মূলতঃ প্লাস্টার আর সময় দিয়ে। অর্থাৎ প্লাস্টার করো আর ফেলে রাখো—আপনিই জুড়ে যাবে। বয়স্কদের এই ভাবে ভাঙা হিপ (কোমরের তলদেশ) নিয়ে মাস ছয়েক বিছানায় শুইয়ে রাখলে শরীর খারাপ তো হবেই—নিউমোনিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাণটা পর্যন্ত খাঁচা ছেড়ে উড়ে যেত। আজকালকার হাড়ের ডাক্তাররা কিন্তু যত তাড়াতাড়ি পারেন হাড়ভাঙা রুগীদের খাড়া করে তোলেন বিছানা থেকে। হাড় জোড়া লাগাতে সাহায্য নেন পিন, স্ক্রু আর প্লেটের। কনুই অথবা হাঁটু জমাট হয়ে গেলে কি করণীয় জানতে চাইছেন? কৃত্রিম জয়েন্ট

লাগিয়ে নিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। হিপ-বোন (কোমরের তলদেশ) যদি ভাঙে? নতুন বল আর সকেট (কোটর) লাগিয়ে নিলেই হল। সমস্যা কোনোটাই নয়।

হাড়ের ডাক্তারদের কায়দা কসরৎ চক্ষুস্থির করার মত সন্দেহ নেই, আসল নিরাময় কিন্তু করতে হচ্ছে আমাকেই। আমার অসটিওব্লাস্ট-রা (হাড় গড়ার কোষ) দ্রুত বেগে উৎপাদন শুরু করে দেয়—ফিনকি দিয়ে কোলাজেন ছাড়তে থাকে এবং এই কোলাজেনরাই পালটে গিয়ে হাড়ে পরিণত হয়। এ ছাড়াও আমার অন্যান্য কৌতূহলোদ্দীপক মেরামতি-মিস্ত্রী আছে: আমারই অসটিওক্লাস্টরা (অনাবশ্যক হাডকে যারা ধ্বংস করে ফেলে অপসারণ করে)। হাড়ের খোঁচা খোঁচা অংশ এরা নষ্ট করে মসৃণ করে তোলে—আগেরকার আকারে হাড়কে ফিরিয়ে আনতে দক্ষ ভাস্করের মতই সাহায্য করে।

বহু বিচিত্র হাড়ের রোগের শিকার আমরা—এদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য যেটা তার নাম আপ্ল্যাসটিক অ্যানিমিয়া—রক্ত প্রস্তুত করার প্রণালীটাই ভুলে মেরে বসে থাকে আমাদের মধ্যেকার মজ্জা। অতিরিক্ত বিকিরণের জন্যে এমনটা হতে পারে, অনেকরকমের বিষক্রিয়ার ফলেও হতে পারে অথবা অজ্ঞাত কোনো কারণের দরুন হতে পারে। ডাক্তাররা তখন ফাঁপড়ে পড়েন। মজ্জারা যদি রক্ত তৈরীর মন্ত্রগুপ্তি ভুলে যায় তখন ডাক্তাররা করবেটা কী? স্রেফ রক্তদান এবং অন্যের হাড়ের মজ্জা এনে রুগীর হাড়ের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া ছাড়া করবার আর কিছু থাকে না। নিয়মিত তাই করেন অসহায় চিকিৎসকবৃন্দ এবং সকাল সন্ধ্যে ভগবানকে ডাকতে থাকেন যেন আপনা থেকেই নিজেদেরকে নিরাময় করে নিই আমরা—তা সে যেভাবেই হোক না কেন।

আমাদের আর এক সমস্যা হল আরথ্রাটিস—সন্ধিস্থলের জয়েন্ট প্রদাহ এবং জমাট হয়ে যাওয়া। শল্য চিকিৎসাই এর একমাত্র সমুচিত এবং সুনির্দিষ্ট জবাব—জমাট জয়েন্টকে পালটে নতুন জয়েন্ট বসিয়ে দেওয়াও থাকছে এই সার্জারির মধ্যে। আমরা, হাড়েরা, ক্যানসারগ্রস্তও হই। সংক্রমণ ঘটলে দুর্ভাবনা আর উদ্বেগও হয়। হাড়ের কাছাকাছি কোনো ক্ষত থাকলে, রক্ত স্রোতের মধ্যে দিয়ে জীবাণুরা আঘাত হানে আমাদের ওপর অথবা ফাটা হাড়ের মধ্যে আক্রমণ চালায় পরমোল্লাসে। আকস্মিক এহেন আক্রমণের ফলে হাড়ের যে ধরনের প্রদাহ ঘটে তার নাম অসটিওমাইলাইটিস—বলাবাহুল্য রোগটা অতিশয়

জঘন্য। ডাক্তারদের কাছে এর প্রতিরক্ষা হিসেবে প্রথম পদক্ষেপ হল অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধপত্র দিয়ে চিকিৎসা।

অসটিওপোরোসিস হল আর একটা হাড়ের রোগ—প্রায় সব্বাইকেই এ রোগের আক্রমণে অল্পবিস্তর ভুগতে হয়। উপেন রোগটার নাম শুনেছে কিনা উপেনই বলতে পারে। বিশবছরে পা দিতেই উপেনের দেহমন্দিরের কাঠামো আমরা, এই অস্থি-পরিবার, শক্তি আর ঘনত্বর শিখরে আরোহণ করেছিলাম। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে আমাদের ক্যাল-সিয়াম আর অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের ভাণ্ডার। মজুদ পরিমাণের অনুপাতে বেশী পরিমাণ ছাড়তে আরম্ভ করেছিলাম। রক্ত প্রবাহ এবং কিডনি তাদের বার করে দিয়েছে বাইরে। ফলে তখন থেকেই একটু একটু করে ঘনত্ব আর শক্তি কমে আসছে আমাদের। প্রথম দিকে প্রক্রিয়াটা ছিল ক্রমিক অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে ঘটেছে—আজ উপেনের কোনো লক্ষণই নেই। পরে কিন্তু প্রতি দশজনের মধ্যে একজন হিসেবে ওরও অসটিওপোরোসিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে।

কারণটা বলতে পারব না, তবে এই প্রক্রিয়াটা উপেনের বউ উমার ক্ষেত্রে আরও অনেক বেশী গুরুতর আকারে দেখা দিতে পারে। ঋতুবন্ধের সময়ে গর্ভাশয় ঝাঁপ ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর খনিজ ভাঁড়ার খালি হওয়াটাও আরও দ্রুতগতি হতে পারে। ৬৫ বছরের বুড়ি যখন হবে তখন কশেরুকা, পাছার হাড় আর কব্জির হাড় এত ভঙ্গুর হয়ে দাঁড়াবে যে, যে-পতনে আগে সামান্য কালসিটের ওপর দিয়ে রেহাই পাওয়া যেত—সেই আছাড় খাওয়ায় তখন ফ্র্যাকচার পর্যন্ত হতে পারে।

অসটিওপোরোসিস ব্যাধিটা আজও বেশ রহস্যময়। উপদেশ একটাই দিতে পারি উপেনকে: খেয়াল থাকে যেন বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দামালি কমছে আমাদের। ধাক্কা ঝাঁকুনির ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকলে আখেরে কাজ দেবে।

সবশেষে একটা বড়াই করে যাই। জীবাশ্ম হাড়েরা কোটি কোটি বছর বেঁচে রয়েছে। ধরা পৃষ্ঠের প্রথম মানবের হাড়ের টুকরো-টাকরা আজও উঠে আসছে ধরিত্রীর বুক থেকে। কৃতিত্বটা আমাদের দিতে ভুলবেন না। উপেনের দৈনন্দিন জীবন যাপনে শুধু যে মুখ্য ভূমিকাই পালন করে যাচ্ছি তা নয়—ওর সাধের এই দেহের আর কোনো উপাদান যা পারবে না, আমরা এই হাড়ের গুষ্টিরা তাই করব—প্রায় অমরত্ব লাভ করব।

পা

হার্ট, লিভার, লাঙ্‌স্‌ আর অন্যান্য দেহযন্ত্র নিয়ে সব সময়ে কাঠ হয়েই আছে উপেন। কিন্তু আমার সম্বন্ধে ওর ধারণাটা কি জানেন? আমি নাকি একটা বদখৎ, ঝঞ্ঝাট-পাকানে-ওয়ালা উৎপাত। উপেনের বাঁ পা আমি। কতরকম বর্ণনাই না করা হয়েছে আমাকে নিয়ে। আমি নাকি স্থপতির দুঃস্বপ্ন, এবং এই আমিই নাকি আবার দেহবিজ্ঞানীদের কাছে এক বিপুল বিস্ময়। এই দুইয়ের মাঝে আরও বিস্তর বর্ণনাই রয়েছে আমাকে ঘিরে। কিন্তু সর্বশেষ যে বর্ণনাটাই বোধহয় সত্যের অনেক কাছাকাছি—বাস্তবিকই শরীর-স্থানের (অ্যানাটমির) বিস্ময় আমি।

আমি যে কি পরিমাণ জটিল যন্ত্রপাতির সমষ্টি, উপেনের ধারণাই নেই। ঐ তো দেখুন জানলার সামনে দাঁড়িয়ে শূন্য দৃষ্টি মেলে উদাস চোখে তাকিয়ে আছে রাধাচূড়ার পানে। মন নির্ভার। আমি কিন্তু নই, আমার মধ্যে চলছে বিপুল কর্মকাণ্ড। আমার ২৬ টা হাড়ের, ১০৭ টা সন্ধিবন্ধনীর আর ১৯ টা পেশীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পারস্পরিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে দিয়ে ছ ফুট লম্বা ৭৫ কিলো ওজনের অস্থিমাংসের একটা পিণ্ডকে আমি ব্যাল্যান্স করে যাচ্ছি। ভাল কথা, উপেনের শরীরে যত হাড়ের সংস্থান করেছেন বিধাতা পুরুষ, তার এক চতুর্থাংশই দিয়েছেন এই শর্মা আর তার ডান পার্টনারকে—অর্থাৎ দুই পা'কে। বুঝতেই পারছেন তাহলে আমাদের গুরুত্ব কতখানি।

দুটো পায়ের চেটোর ক্ষেত্রফলের চাইতে বড় নয়, এমনি যে কোনো বস্তুর ওপর এই আয়তনের কিছু একটা ব্যালান্স করার চেষ্টাটাই করে দেখুন না—কত ধানে কত চাল বুঝবেন। রীতিমত সার্কাস দেখাতে হবে আপনাকে। ব্রেন থেকে বার্তা ছুটে নামছে পায়ে, আবার দৌড়ে যাচ্ছে ব্রেনে। চেটোর সেনসর কেন্দ্ররা খবর পাঠাচ্ছে—বিশেষ একটা জায়গায় চাপ বেড়েই চলেছে, মানে উপেন একটু হেলে পড়েছে। হুকুম আসছে তক্ষুনি : এই পেশীটাকে টাইট করো, ওটাকে ঢিল দাও। এই ভারসাম্য বজায় রাখতে গেলে যদি যন্তরের সাহায্য নিতে হয়, তাহলে বড় সাইজের কমপিউটার কিনতে হবে আমাকে।

হাঁটা ব্যাপারটা আরও জটিল। ধাক্কার প্রথম বোঝাটা বহন করে আমার গোড়ালি। সেখান থেকে ধাক্কার বোঝা পাঁচটা পদতলাস্থি (মেটাটারসাল বোন) দিয়ে চালান হয়ে যায় উপেনের পায়ে। পায়ের আঙুলদের ঠিক পেছনে। তারপর, বুড়ো আঙুল দিয়ে সজোরে ঠেলা মারি সামনে। এইতেই ব্যস্ত থাকি আমি। উপেন কিন্তু ওর গাড়ীর টায়ারের দিকে যতটা নজর দেয়, ততটা দেয় না আমার দিকে। নির্দয়

পা
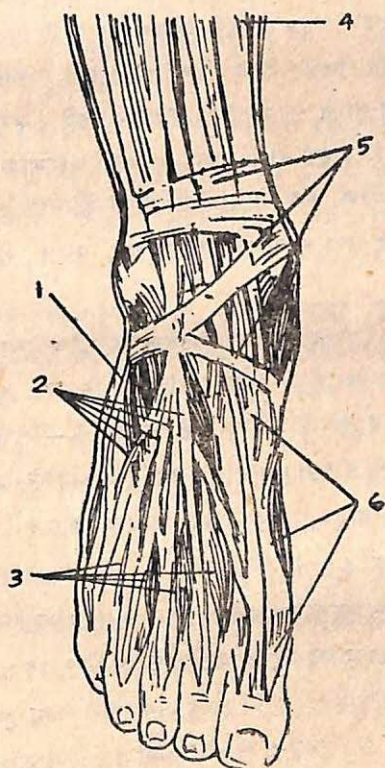
১। পায়ের পেশী; ২। কণ্ডরা সমূহ (টেনডন্‌স্), ৩। পায়ের পেশী; ৪। পায়ের হাড়; ৫। সন্ধিবন্ধনী সমূহ; ৬। পায়ের হাড়;

ভাবে শাস্তি দেয় আমাকে। তারপর যখন চোট পাই—তখন কিন্তু চটে যায় আমার ওপরেই। কারণ অতি সোজা—ব্যাপারটা ওর মাথায় ঢোকে না। বেশ তো, ওকে হাঁটতে বলুন ফুটপাত ধরে—মিনিটে একশ বার পা ফেলে হেঁটে যাক ধীরে সুস্থে। তার মানেই হচ্ছে, প্রতি মিনিটে পঞ্চাশ বার ৭৫ কেজির ধাক্কা মারছি সিমেন্টের ওপর—আমার ডান পার্টনারও একই ধকল সয়ে চলেছে মিনিটে মিনিটে। সারাজীবনে উপেন পথ চলবে প্রায় ৬৫,০০০ মাইলের মত—আমার অবস্থাটা তাহলে কল্পনা করে নিন। কত কোটি ধাক্কা সইতে হবে, কল্পনা করতে পারেন? সবচেয়ে বড় বিস্ময় এইখানেই—আমি কিন্তু পুরোপুরি ভেঙে পড়ি না কখনই। ধকল সইবার জন্যেই যে সৃষ্টি আমাদের।

পৃথিবীতে মানুষ যখন প্রথম হাঁটতে আরম্ভ করে, উপেনের সেই পূর্বপুরুষদের প্রথম দশলক্ষ বছর পায়ের কাজ ভালই চলেছে। এবড়োখেবড়ো উঁচু-নিচু জমির ওপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটেছে প্রত্যেকেই, পদযুগলের পক্ষে যার চাইতে উত্তম ব্যায়াম আর হয় না। তার পরেই পদশোভা, মানে, জুতো মহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটল. এল সিমেন্টে বাঁধানো ফুটপাত আর কঠিন মেঝে। কি বলব মশাই, এদের কথা ভাবলেই গায়ে জ্বর আসে আমার—গা-গতরে যেন ব্যথা ধরে যায়।

উপেন যখন শিশু, ওর বাপ-মা অতশত না বুঝে শাস্তির পর শাস্তি চাপিয়ে গেছেন আমার ওপর। আমার হাড়েরা যে নরম এবং রবারের মত ছিল সেই সময়ে, এই তথ্যটা উপলব্ধিই করেননি—উপেনের বিশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে পর্যন্ত হাড়েরা সাবালক হয়নি। টাইট জুতো আর মোজা পড়িয়ে পা বেঁকিয়ে দিয়েছেন, এবং আরও অনেক অজ্ঞতা প্রসূত আদরের ঠেলায় পায়ে ঈষৎ বিকৃতি এনে দিয়েছেন।

সব বাপ মায়ের মত উপেনের জনক জননীও চেয়েছিলেন, ছেলে যেন হাঁটি হাঁটি পা-পা করতে আরম্ভ করে দেয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ছেলেকে ধরে দাঁড় করিয়ে হাঁটিয়েওছেন। আমি কিন্তু এক থলি নরম জেলী ছাড়া আর কিছুই নই—ব্যাপারটা উপেনের ওপর ছেড়ে দিলেই ভাল করতেন। কখন হাঁটি হাঁটি পা-পা করার ইচ্ছে হবে, কখন সে নিজে থেকেই ধরে দাঁড়াবে এবং হাঁটতে চাইবে—তদ্দিনের আশায় উপেনকে খালি পায়ে রেখে দিলেই মঙ্গল করতেন। হাঁটি হাঁটি পা-পা করার একমাস পরেও জুতো দিয়ে পা

ঢাকবার চেষ্টা না করলেই ভালো ছিল।

বাচ্চাবয়েসে হৃদযন্ত্র, ফুসফুস আর অন্যান্য দেহযন্ত্রের নিয়মিত ডাক্তারী পরীক্ষা হয়েছে উপেনের—অথচ শিশুদের এসব দেহযন্ত্র কদাচ খারাপ হতে দেখা যায়। কিন্তু আমি তো কম উৎপাত সৃষ্টি করি না—অথচ অনাদর করা হয়েছে আমাকেই। অনাদর উপেক্ষার কারণ হয়ত একটাই—পায়ে ফোস্কা পড়লে মানুষ তো মারা যায় না। উপেন যখন চারে পা দিয়েছে, তখনও যদি ডাক্তার দিয়ে আমাদের দেখানো হত—তাহলেই ধরা পড়ে যেত আমাদের দুরবস্থাটা। আমাদেরও যে সাহায্য প্রয়োজন, তা হৃদয়ঙ্গম করতেন ডাক্তার। উপেন যখন ছ'বছরের, আসল ঝামেলার পথ তখন সুপ্রশস্ত। আমি এবং আমার অংশীদার দুজনেই তখন চ্যাপ্টা হয়ে যেতে আরম্ভ করেছি, পায়ের আঙুলের বিকৃতিও দেখা দিয়েছে মূলতঃ জুতো পরার দরুন আর বংশ গতির দরুন।

উপেনকে শেখানো হল কি করে দাঁত মাজতে হয়, চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়াতে হয়, কান পরিষ্কার রাখতে হয়—কিন্তু কেউ তাকে শেখালো না কি ভাবে সঠিক পন্থায় হাঁটতে হয়—বিশেষ করে কি ভাবে পায়ের আঙুলদের সিধে ভাবে রেখে পথ চলতে হয়। জনক-জননী আরও একটি কাণ্ড করেছিলেন। বড় ভাইয়ের ছোট হয়ে যাওয়া জুতো উপেনকে পড়তে দিয়েছিলেন, অথবা এমন জুতো কিনে দিয়েছিলেন যা অনেকদিন টিঁকবে। দুটোই বিপজ্জনক অভ্যাস। ছ'বছর বয়স পর্যন্ত উচিত ছিল এক মাস দেড়মাস অন্তর উপেনের পা মাপানো এবং দরকার হলেই নতুন জুতো পরানো, বারো বছরে পা দেওয়ার পর ওর উচিত ছিল বছরে বারবার জুতো পালটানো।

প্রবাদ আছে পা যখন চোট পায়, চোট দেয় সবাইকেই। আমার কাছ থেকে বহুদূরে অবস্থিত অঞ্চলেও লক্ষণ সৃষ্টি করতে পারি—পিঠ ব্যথা, মাথা ব্যথা, পায়ে খিঁচ ধরা এবং বহুবিধ বহুদূরের গণ্ডগোলের মূলে থাকতে পারে আমার নিজের গণ্ডগোল। আমার কোথাও হয়ত একটা ফোস্কা বা ঐ জাতীয় টনটনে কিছু দেখা দিয়েছে। মূলতঃ সেই ব্যথার জায়গাটায় চাপ দিয়ে ব্যথা না পাওয়ার অভিলাষে উপেন যেই পদক্ষেপে হেরফের ঘটায় বা দেহ ভঙ্গিমায় পরিবর্তন আনে—অমনি শরীরময় নানারকম গোলমাল দেখা যায়। এগুলোর মধ্যে মানসিক ভাবাবেগের তো বটেই, দৈহিক প্রতিঘাতের

পা

প্রতিক্রিয়াও আছে। পায়ের পাতায় জ্বালা মানে মেজাজটাই জ্বলে যাওয়া।

মেয়েদের পায়ের গোলমাল পুরুষদের চেয়ে চারগুণের বেশী—কাজেই এ পর্যন্ত যা বললাম, তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে উপেনের বউ উমার পায়ের গোলমাল দেখা দিলেই। উঁচু গোড়ালির জুতো পরলে এত গোলমাল তো হবেই। ওজনটাকে সামনের দিকে ঠেলে দেয়, পায়ের ডিমের পেশীকে খাটো করে আনে এবং মেরুদণ্ডের ভারসাম্য বজায় রাখতে দেয় না। শুধু এই কারণেই জানবেন মেয়েদের এত বেশী পিঠ ব্যথা দেখা যায়। সুযোগ পেলেই পা থেকে জুতো ছুঁড়ে ফেলে দেয় এরা এই কারণেই। একেবারে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া উচিত এইসব ফ্যাশানেব্‌ল্ যন্ত্রণাদায়ক জুতোগুলোকে।

আমার কতরকম গোলমাল দেখা দিতে পারে? তা প্রায় পঞ্চাশ রকমের তো বটেই। এদের মধ্যে সবচেয়ে মামুলী যে গোলমালটা নিয়ে প্রায় সব মিঞাকেই ভুগতে হয়, নাম তার কড়া পড়া। যখনি আমার আঙুলের বিশেষ কোনো অঞ্চলে চাপ পড়তে থাকে জুতো পরার দরুন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার তাগিদে টিশু স্তূপীকৃত করতে থাকি জখম রোধ করার জন্যে। দেখতে দেখতে মড়া কোষদের এমন একটা স্তূপ সেখানে জমে যায়, যার চাপ গিয়ে পড়ে তলাকার স্নায়ুর ওপর। যন্ত্রণার সৃষ্টি সেই থেকেই। বিছানায় কয়েক সপ্তাহ শুয়ে থাকলে সাধারণতঃ কড়া মিলিয়ে যায়— বহু চিকিৎসার অন্যতম এটি।

উপেনের ধারণা, কড়া পড়ার চিকিৎসায় ও নিজে একজন শল্য চিকিৎসক। মোটেই তা নয়। জীবাণুমুক্ত নয় এমনি ক্ষুর দিয়ে কড়া কাটে উপেন —অ্যাসিড লাগায় কড়া উঠিয়ে দেওয়ার জন্য, দুটোই সংক্রমণের সৃষ্টি করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার উপশম ঘটানোর জন্য, ওর উচিত প্লাস্টার দিয়ে কড়া ঢেকে দেওয়া; তারপর মাপসই জুতো পরা।

পায়ের বুড়ো আঙুলের হাড়ের ডগার বিকৃতি দেখা যায় যখন বুড়ো আঙুল পাশের আঙুলের তলায় ভাঁজ খেয়ে ঢুকে যায়। পুরুষদের ক্ষেত্রে এই বিকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বংশগতির দরুন, কিন্তু উলটো পালটা জুতো পরার ফলে বৃদ্ধি পায় এই বিকৃতি। আত্মরক্ষার তাগিদে টিশুর আড়াল সৃষ্টি করে ফেলি আমি। অবস্থা অতীব শোচনীয় হলে অস্ত্র-চিকিৎসা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই—বুড়ো আঙুলকে সিধে করে দেন সার্জন। গোড়ালীতে কড়া-পড়া যন্ত্রণাদায়ক খুবই—যে জায়গায় এক

নাগাড়ে চাপ পড়ে—কড়া পড়ে সেইখানেই, কাইরপডিষ্ট অর্থাৎ যাঁরা নখ কড়া-পড়া, পা ইত্যাদির চিকিৎসা করেন এ অবস্থায় তাঁরা উপকারে আসবেন ঠিকই—কিন্তু সবচেয়ে বড় উপকার মিলবে যদি চলার ভারসাম্য সঠিক রাখা যায় এবং গোঁজ, যন্ত্র ইত্যাদি দিয়ে তা ফিরিয়ে আনা যায়।

অ্যাথলীটস্ ফুট অর্থাৎ পায়ের দাদ হয় ছত্রাক থেকে। ছত্রাক তো সবসময়েই আছে আমার ওপর। কিন্তু পা ফেটে গেলে এবং সেই পা যদি তখন ভিজে অবস্থায় থাকে, তাহলে খাঁজ খোঁদলের মধ্যে দিয়ে ছত্রাক বাহিনী আক্রমণ চালায় অভ্যন্তরে—নইলে এরা কোনো ক্ষতি করে না। রোগটা যাতে আদৌ না হয় তার সবচেয়ে বড় ব্যবস্থা হল আমাকে শুকনো রাখা—যা মুখে বলা সহজ, কিন্তু কাজে কঠিন। কেন না, শরীরের অন্যত্র ঘাম-গ্রন্থিরা যত আছে, তার চেয়ে অনেক বেশী আছে আমার চেটোতে—হাতের তালুর কথা স্বতন্ত্র—সেখানেও ঘাম-গ্রন্থিরা রয়েছে অগুন্তি। দিনে দু'বার যদি বেশ করে আমাকে ধুয়ে, মুছে, সার্জিক্যাল স্পিরিট আর পাউডার লাগায়—কব্জায় এসে যাবে সমস্যাটা—নির্দ্বিধায় বলতে পারি।

অনেকের পায়ের নখ ভেতর দিকে ঢোকানো অবস্থায় গজায়। টিশুর মধ্যে নখ গজিয়ে প্রদাহের সৃষ্টি করে। সর্বোত্তম চিকিৎসা হল আড়া-আড়ি ভাবে সোজা কেটে ফেলা, এবং খুব ছোট করে না কাটা। সম্প্রতি বেশ কয়েকবার আমার ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া এবং আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া নিয়ে ভুগেছে উপেন। ভোগান্তির কারণ অপর্যাপ্ত রক্তসঞ্চালন—বয়স বাড়লে যা হবেই। রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে দিন—সমস্যাও কর্পূরের মত উবে যাবে। কবোষ্ণ জলে পা ডুবিয়ে রাখলেও রক্তবাহরা স্ফীত হয়ে রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে দেয়। টেবিল বা টুলে আমাকে আর আমার পার্টনারকে তুলে রাখলেও উপকার হয়—উপকার হয় হাঁটা চলা করলেও।

উপেনের পূর্বপুরুষরা যেমন অসমতল ভূমির উপর খালি পায়ে হাঁটতো, ঠিক সেই ভাবে যদি আমাকে নিয়ে হাঁটে উপেন, তবেই সব সেরা ব্যায়ামের সুযোগ দিতে পারবে আমাকে। খালি পায়ে মাঠে খেলাধূলা করলেও আমি বর্তে যাবো। কঠিন ভূমিতে কিন্তু জুতো দরকার নিজেকে ঠেকনা দিয়ে ঠিক রাখার জন্যে। জীবনের দুই তৃতীয়াংশ যে চামড়ার জেলখানায় আমাদের কয়েদ করে রাখতে চায় উপেন, তাদের বাছতে হয় কি ভাবে, সেইটাই কিন্তু ও জানে না। টাই কিনতে যতটা সময় দেয়, তার চাইতে

পা

অনেক কম সময় দেয় আমাকে পছন্দ করার বেলা।

সারাদিনে হাঁটাচলা করার পর যখন আমি ফুলে বৃহত্তম আয়তনে পৌঁছোই, উপেনের উচিত ঠিক তখনি আমার জন্যে জুতোর মাপ নেওয়া। শুধু আমার নয়, আমার ডান পার্টনারের-ও মাপটা যেন নেওয়া হয়। কেন না, প্রায় দেখা যায় যে একটা পা অন্যটার চেয়ে ঈষৎ বড়। মাপ নিতে হবে কিন্তু উপেনের দাঁড়ানো অবস্থায়। জুতো কেনার সময় তাহলে সন্ধ্যের পর—কেমন, তাই নয় কি?

যে আঙুলটা সবচেয়ে লম্বা, জুতো হওয়া উচিত অন্তত পক্ষে তার চাইতেও আধ ইঞ্চি বেশী লম্বা। আঙুল খেলানোর যথেষ্ট জায়গা যে জুতোয় নেই, সে জুতো যেন উপেন না কেনে। কেনবার সময়ে যে আঙুলেরা আরাম পাচ্ছে না, তারা আমাকে এবং উপেনকে অনেক ঝঞ্ঝাটে ফেলতে পারে—খেয়াল রাখবেন। খুব খাটো বা ছোট মোজাও কিনতে যাবেন না—আঙুল মোচড়ানো জুতোর মতই বিভ্রাট সৃষ্টি করতে পারে পরে—এমন মোজা কিনবেন যা টানলে লম্বা হয়।

সব শেষে একটা কথা: উপেন, তুমি হুঁশিয়ার! বার্ধক্য সামনেই, খেয়াল থাকে যেন। বহু বছরের অপব্যবহারের ফলে রোগগ্রস্ত যন্ত্রণাময় পা নিয়ে ভুগতে হয় বহু বৃদ্ধকে। এই কারণেই এরা বেশীর ভাগ সময় দোলনা চেয়ার বা পার্কের বেঞ্চিতে বসে কাটিয়ে দেয়। জীবনের যে সময়টাতে মৃদু ব্যায়াম এবং উদ্দীপনা সৃষ্টি করার মত তৎপরতার একান্ত প্রয়োজন—ঠিক সেই সময়টাতেই তারা নিশ্চেষ্ট হয়ে থেকে উল্টো কাজ করতে থাকে।

এই দিক দিয়ে যদি ধরেন, তাহলে জীবনকে সত্যিই সংক্ষিপ্ত করে আনতে পারি আমি। কিন্তু এই অবস্থা থেকে যদি পরিত্রাণ চায় উপেন, তাহলে যেভাবে বললাম, সেইভাবে আমার দিকে যেন নজর দেওয়া আরম্ভ করে এখন থেকেই।

হাত

উপেনের ধারণা চোখ বা পা হারানো মানেই বুঝি চূড়ান্ত বিপর্যয়। কিন্তু আমাকে অথবা আমার পার্টনারকে হারানোটা তার চাইতেও বড় বিপর্যয়। উপেনের ডান হাত বক্তিমে দিতে বসেছি, বুঝেছেন নিশ্চয় ?

ওর যকৃতের মত অত্যাশ্চর্য রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ দেখানোর যোগ্যতা আমার নেই; ওর ব্রেনের তড়িৎ রাসায়নিক বিস্ময়-সৃষ্টি ক্ষমতাও আমার নেই। মূলতঃ আমি একটা যন্তর ভার বহন করার ডাণ্ডা, কব্জা এবং শক্তি উৎসের এমন একটা সমষ্টি যা মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এতগুলো কলকব্জাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সব যন্ত্রগণকের গুরু যিনি—সেই মাস্টার কমপিউটার—উপেনের ব্রেন। জটিলতার দিক দিয়ে মনুষ্য নির্মিত যন্ত্রপাতি আমার তুলনায় নিতান্তই নগণ্য—বামন বললেই চলে। আমি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, আমি অক্লান্ত, আমি অতিশয় দ্রুতগতি। উপেন যদি প্রথম শ্রেণীর অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন টাইপিস্ট হত, তাহলে প্রতি মিনিটে ওর হাত দিয়ে কাগজে টাইপ হয়ে যেত ১২০কি তারও বেশী শব্দ।

শরীরের কোনো অংশের গুরুত্বের পরিমাপ করা হয় মগজে তার ব্যবহারের জন্যে কতখানি অঞ্চল সংরক্ষিত আছে, তার ওপর। ব্রেনেতে দুটো বৃহত্তম অংশ সংরক্ষিত রয়েছে আমাদেরএই দুই হাতের জন্যে—এদের নাম মোটর কর্টেক্স। উপেন যখন বুড়ো আঙুলকে চক্রাকারে পাক দেয়, তখন কিন্তু প্রত্যক্ষ করে এক অতীব বিস্ময়কর ঘটনা। অতি সহজ এই কাজটাকে করানোর জন্যে হাজার হাজার বার্তার দরকার হয় মগজ থেকে; সঙ্কুচিত হতে অর্ডার দেয় কোনো পেশীকে, কাউকে বলে ঢিল দিতে, কোনো টেনডন অর্থাৎ কণ্ডরাকে বলে টেনে ধরতে, কাউকে বলে ছেড়ে দিতে।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সুদীর্ঘ জীবনযাত্রায় কেবল ঘুমের সময়টুকু ছাড়া কখনো আমরা, এই হাতেরা, স্থির নই। উপেনের সারা জীবনে আঙুলের জয়েন্টদের খোলাবন্ধ করব কম করেও আড়াই কোটিবার।

একনাগাড়ে সক্রিয় থাকলে পা, বাহু, কাঁধ, হাত এবং দেহের অন্যান্য অংশরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ক্লান্ত হাত নিয়ে নালিশ জানাতে ক'বার শুনেছেন উপেনকে?

মাতৃগর্ভ থেকে বেরোনোর সময়েই উপেনের হাতেরা বেশ ভাল ভাবেই গড়ে উঠেছিল। ওর দেহের ওজন বইবার মত শক্ত ছিলাম আমরা—ছ'দিন যেতে না যেতেই শিশু-চিকিৎসকের বুড়ো আঙুল ধরে ঝুলতেও শিখে গিয়েছিলাম। উপেনের কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত হাতের অংশের পেশীরাই নিয়ন্ত্রণ করে আমাকে, কিন্তু এরা তো বেশ দূরেই রয়েছে আমার কাছ থেকে—সে তুলনায় আমার শক্তি বিস্ময়কর নয় কি? ৯০ পাউণ্ড মুঠোর জোর দেখাতে পারে উপেন অনায়াসেই, অতি-বলবান হলে ১২০ পাউণ্ড কি আরও বেশী পারে। মেয়েদের মুঠোর জোর কিন্তু সাধারাণতঃ পুরুষদের মুঠোর জোরের অর্ধেক।

প্রায় ৯৫ শতাংশ মানুষের মত, উপেনও ডান হাতের ওপর নির্ভরশীল। ওর বয়স যখন মোটে ছ'মাস, তখন থেকেই ওর বাছবিচারের শুরু নির্ভর করবে কোন হাতের ওপর? ডান হাতের ওপর, না, বাঁ হাতের ওপর? হাত নাড়া আর চোখ নাড়ার মধ্যে সমন্বয় সাধনের শুরুও তখন থেকে, কোনো কিছুর দিকে তাকিয়ে থেকে হাত দিয়ে তা তুলে নেওয়ার চেষ্টা এই কারণেই। উপেনের ক্রমবৃদ্ধির সোপানে এই ঘটনা একটা মস্ত ঘটনা।

ধৈর্য, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়ানোর আগে পর্যন্ত প্রাণী জগতে সবচেয়ে অসহায় অবস্থায় থাকতে হয়েছিল মানুষকে—আত্মরক্ষার কোনো পথ ছিল না ক্ষুধার্ত সিংহের খপ্পর থেকে বা হায়নার দ্রংষ্টা থেকে। এদের খাদ্য হয়েই জীবনপাত করে গেছে আজকের পৃথিবীর রাজা মানুষ জাতটা। খাড়া হওয়ার পর থেকেই দেহটাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় টেনে নিয়ে যাওয়ার কাজ থেকে অব্যাহতি পেলাম আমরা, অস্ত্র বানাতে এবং চালাতে শিখলাম, নগ্ন নরবানর তখন থেকেই প্রভুত্ব অর্জন করল :এই ধরিত্রী এবং প্রাণীকুলের ওপর, চোয়ালও জাবর কাটার কাজ আরলড়াই করার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে. সাইজে ছোট হয়ে এসে রত হল ভাষার পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, যতই জটিল থেকে:জটিলতর হতে লাগল আমাদের কাজকর্ম, ততই বাড়তে লাগল মস্তিষ্ক, আজকের উপেন:এই সুদীর্ঘ বিবর্তনের শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে ধন্যবাদ জানাক আমাকে এবং আমার দেহের অন্যান্য অংশ

পার্টনারকে। আমাদের জন্যেই মানুষ আজ পোঁছেছে এই অবস্থায়. কৃতিত্ব আমাদেরই—নয় কি ?

সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপারটা কিন্তু খেয়াল রাখবেন ; সুদীর্ঘ বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে উঠে আসার সময়ে আমাদের গড়ন কিন্তু খুব একটা পালটায়নি, অন্যান্য প্রাইম্যাট অর্থাৎ বানর ইত্যাদি সর্বোচ্চ শ্রেণীর প্রাণীদের হাতের গড়নের মতই প্রায় আমাদের হাতের গড়ন, তবে ওদের চাইতে নিরতিসীম দক্ষ আমরা, দরকার হলে চোখ, কান, গলার বদলিও হতে পারি আমরা, উপেন যদি অন্ধ হত, ব্রেল সিসটেমে পড়াশুনা চালিয়ে যেত আঙুল দিয়ে উঁচু উঁচু হরফ ছুঁয়ে ছুঁয়ে। যদি কালা হত, তাহলে হাত দিয়ে সংকেত-ভাষা দেখিয়ে 'কথাও' বলে যেত। আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয় সংক্রান্ত বাছবিচারের ক্ষমতা এত তীক্ষ্ণ যে পকেট থেকে দশ নয়া বার করার সময়ে

হাত
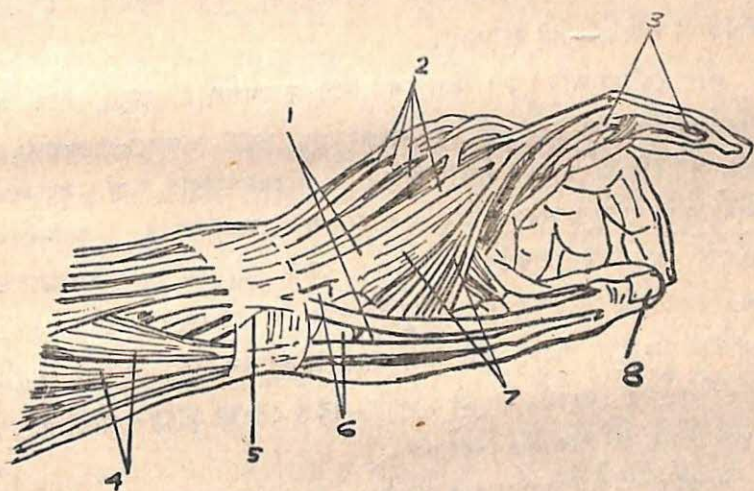
১। হাতের হাড় সমূহ ; ২। সন্ধিবন্ধনী সমূহ, ৩। আঙুলের হাড় সমূহ ; ৪। বাহুর পেশী সমূহ—হাত আর আঙুল নাড়ায় ; ৫। কব্জির সন্ধিবন্ধনী ; ৬। কব্জির হাড় ; ৭। হাতের পেশী সমূহ—আঙুল নাড়ায় ; ৮। বুড়ো আঙুল ;

চোখের সামনে এনে দেখার দরকার হয় না—উপেন আঙুল বুলিয়েই বুঝতে পারে। চাষী হলে আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝুর ঝুর করে মাটি ঝরিয়ে দিয়ে বুঝতে পারত মাটির দানা কি ধরনের, বাড়ীর গিন্নী হলে কাপড়ে আঙুল বুলিয়েই বলে দিত কাপড়টা নিরেস না সরেস, সামান্য আঙুলের পক্ষে এগুলো চমকপ্রদ ক্ষমতা নয় ?

বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধীশক্তি সম্পন্ন কৃতিত্বপূর্ণ কাজের দরুন যথেষ্ট পরিমাণ কৃতিত্বের দাবী রাখি আমরা, এই হাতেরা। গণিতশাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলাম আমরাই ; আমার আর আমার পার্টনারের দশ আঙুল আর উপেনের পদযুগলের দশ আঙুলের ভিত্তিতেই দশমিক পদ্ধতির উৎপত্তি। গঠন প্রণালীর দিক দিয়ে আমরা উপেনের শরীরের সবচেয়ে সূক্ষ্ম অংশ, শরীরে আর কোনো যন্ত্রে এত কম জায়গার মধ্যে এত বেশী জিনিস ঠাসা নেই, সব শুদ্ধ ২৭টা হাড় রয়েছে আমার মধ্যে—আটটা কবজিতে, পাঁচটা তালুতে, চোদ্দটা আঙুলে, এর সঙ্গে জুড়ুন আমার পার্টনারের ২৭টা হাড় ; উপেনের দেহমন্দিরের এক চতুর্থাংশ হাড়ের অধিকারী আমরা—এই হাতেরা।

তাপ, ছোঁয়া আর যন্ত্রণা নিরূপণের জন্যে স্নায়ুমণ্ডলীর যতটা সরবরাহ আমাদের মধ্যে, তা উপেনের দেহমন্দিরের স্নায়ু সমৃদ্ধ অঞ্চলদের অন্যতম। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে হাজার হাজার স্নায়ু প্রান্ত রয়েছে আমার মধ্যে, সবচেয়ে নিবিড় আর ঘনীভূত অবস্থায় রয়েছে আমার আঙুলের ডগায়। এখানকার অনুভূতি সচেতনতা প্রকৃতই অসাধারণ। স্রেফ অনুভূতি দিয়ে অন্ধকারেও পথ চিনে চলতে পারে উপেন, আঙুলের ডগা ভিজিয়ে নিয়ে হাওয়ার গতি নির্ধারণ করতে পারে, এবং আরও হাজার খানেক কাজ সারতে পারে যা ওর ধারণায় নেহাতই মামুলি ব্যাপার—কিন্তু সে-সব কাজের প্রতিটিই যে প্রকৃত বিস্ময়, তা ভাবতেও পারে না।

দূরের পেশীরা নিয়ন্ত্রণ করছে টেনডনের মধ্যে দিয়ে আমার হাড়েদের। হাড় আর পেশীদের মধ্যে এরা যোগসূত্র—শক্তির রেলগাড়ী। হাড়গুলোয় জয়েন্ট বহু—কিন্তু দূরে থেকেও পেশারা এতগুলো জয়েন্টকে ইচ্ছেমত খুলছে এবং বন্ধ করছে শুধু এই আশ্চর্য টেনডন অর্থাৎ কণ্ডরাদের দৌলতেই। যে কোনো একটা আঙুল নাড়ালেই কনুই থেকে কবজির মধ্যে হাতের অংশে টেনডনের অস্তিত্ব টের পাবে উপেন। বেঁধে রাখার জন্যে আছে সন্ধিবন্ধনী দেহের অন্যান্য অংশ

(লিগামেন্ট) আর ফাশিয়া-র গোলকধাঁধা। ফাশিয়া হচ্ছে একরকম সংযোগকারী টিশু (কলাতন্তু) যারা শুধু চামড়াকেই টিশুর সঙ্গে আটকে রাখে না, বিভিন্ন পেশীদের আলাদা করে রাখে আবার একসঙ্গে বেঁধেও রাখে। স্নায়ু, রক্তবাহ, চামড়া এবং অন্যান্য দেহাংশদের ভিত্তি উপাদান এই ফাশিয়া। ধমনী আর শিরার বিরাট জালক (ক্যাপিলারী) রাখার মত জায়গা আমার নেই, কিন্তু বিশাল জালের কাজের মতই বিস্তর জালক আমার আছে। শীতের দিনে উপেনের বাকী দেহ যখন বেশ আরামে থাকে, আমরা ঠাণ্ডায় জমে যাই, কারণ আমার আঙুলদের বহির্ভাগের ধর্মই হল ওর রক্তকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া।

আমার এই আঙুলগুলোই অবশ্য আমার কাজের প্রধান অংশ। আসল শিল্পবিশারদ আমার এই বুড়ো আঙুলটি; অন্য চারজনের একেবারে উল্টো ধাঁচের। বুড়ো আঙুল যে দিকে খুশী হেলেদুলে অন্য চার আঙুলকে ছুঁয়ে যেতে পারে এবং হাত মুঠো করতে বিপুল সাহায্য করে। আমার প্রায় ৪৫ শতাংশ কাজ ও একাই করে; বেশ তো, বলুন না উপেনকে বুড়ো আঙুলকে বাদ দিয়ে লেখালেখির কাজ করতে, অথবা এক গেলাস জল তুলতে, অথবা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে করমর্দন করতে। অন্য চার আঙুলের যে কোনো একটা গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে অথবা চারটে আঙুল একসঙ্গে কাটা গেলে শুধু, অবশিষ্টাংশ নিয়েও কাজ চালিয়ে যেতে পারবে উপেন। কিন্তু বুড়ো আঙুল বাদ দেওয়া মানেই সাঁড়াশির একটা চোয়াল ভেঙে নেওয়া। একলব্যকে বুড়ো আঙুল কাটতে হয়েছিল এই কারণেই।

আমার অশেষ গুণাবলীর কিছু বাদ গেল না তো? ও হ্যাঁ, আঙুলের ছাপের কথাটাই তো বলা হয়নি। মায়ের পেটে থাকতে থাকতেই চতুর্থ মাসে বিধাতা ঠাকরুন উপেনের কচি হাতে এঁকে দিয়েছিলেন আঙুলের রেখা। একজনের আঙুলের ছাপ যে কখনোই আর একজনের মত হয় না, এটা বাসি খবর বলেই বিশদ বিবরণে যাচ্ছি না। সারা ভূমণ্ডলটা পাক খেয়ে আসতে পারেন। হুবহু আমার আঙুলের রেখাওয়ালা আর একটি মানুষও খুঁজে পাবেন না। আরও একটা কথা: আমার এই হাতের তেলো দেহমন্দিরের সমৃদ্ধতম ঘর্মগ্রন্থিময় অঞ্চলদের অন্যতম। ঘামের গ্রন্থি গিজগিজ করছে এই তেলোতে। লক্ষ লক্ষ বছর আগে উপেনের পূর্বপুরুষরা যখন গাছে বাস করত, তখন হাতের তেলো ঘামে ভিজে থাকার ফলে গাছ আঁকড়ে

হাত

ধরতে সুবিধে হত। এখন ক্রিকেটব্যাট অথবা মোটর-গাড়ীর স্টিয়ারিং হুইল ধরতে সাহায্য করে এই ঘাম। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি, উপেনের হাতের তেলো আর পায়ের চেটোই একমাত্র দেহাংশ যা রোদ্দুরে পুড়ে রঙ পালটায় না। মেলানিন নামক গাঢ় রঞ্জক পদার্থের অভাব আছে এই দুই জায়গায়—এই কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতে বিভিন্ন বর্ণের চামড়াওয়ালা মানুষদের হাতের তেলোর রঙ প্রায় একই।

উপেন যা কিছু করে, তার প্রায় প্রতিটিতেই আমি অংশগ্রহণ করি বলেই ওর জীবনের অধিকাংশ দুর্ঘটনায় আমাকে জড়িয়ে পড়তে হয়। আমি দগ্ধ হই, থেঁতলে যাই, কেটে যাই, কালসিটেতে কালো হয়ে যাই। ছত্রাক সংক্রমণে আক্রান্ত হই, চর্মরোগে কাহিল হই, একজিমায় ঘৃণ্য হই, অ্যালার্জিতে কষ্ট পাই। টানের চোটে ছিঁড়ে যায় আমার টেনডনেরা, খিঁচুনিতে পেয়ে বসে আমার পেশীদের। আরথ্রাইটিস এবং বহুবিধ ব্যাধি কাবু করে আমার জয়েন্টদের। মন্দের ভাল, ক্যানসারের মত হাড়বজ্জাত রোগটার নেকনজরে পড়ি কদাচিৎ।

এমন একটা সময় গিয়েছে যখন দুর্ঘটনায় বুড়ো আঙুল হারালে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হত উপেনকে। কিন্তু একালে নার্ভ, টেনডন, রক্তবাহ সমেত গোটা একটা আঙুলকে কাটা আঙুলের জায়গায় চমৎকার বসিয়ে দিতে পারেন দক্ষ সার্জন—বুড়ো আঙুল খোয়া গেলেও তাই আর ভাবনা নেই উপেনের—পাবে নতুন বুড়ো আঙুল। শুনে মনে হচ্ছে ভারী সোজা কাজ—কিন্তু বেশ কয়েক ঘন্টার নিবিড় নিষ্ঠার দরকার এই একটি মাত্র অপারেশনে। অপারেশনের পরেই বেশ কয়েক মাস অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে নতুন বুড়ো আঙুল নাড়ানো শিখতে হবে উপেনকে—অপারেশন টেবিল থেকে নেমে পড়েই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কেটে পড়া সম্ভব হবে না।

প্রকৃতির প্রমাদে যারা হাঁসের আঙুলের মত জোড়া আঙুল, বা বাড়তি আঙুল অথবা অন্যান্য বিভ্রাট নিয়ে জন্মায়, তাদের কাছে মস্ত আশীর্বাদ আজকের এই নতুন হাতের-অস্ত্রচিকিৎসা। আজকের সুদক্ষ হস্ত-অস্ত্রচিকিৎসকরা একাধারে স্নায়ুতত্ত্ববিদ, শিশুরোগের সার্জন এবং রক্তনালী বিশেষজ্ঞদের কিছু-কিছু নিয়ে সম্পূর্ণ হয়েছেন, তাই তাঁরা কাটা হাতের যে কোনো অংশকে এমন ভাবে নতুন রূপ দেন যা গ্রহণ যোগ্য তো হয়ই, সন্তোষ জনক কাজও দেয়।

উপেন এখন যে বয়সে পা দিতে চলেছে, সে বয়সে আরথ্রাইটিস রোগটা জঘন্যতম আঘাত হানে। রোগটা চরমতম বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, প্রদাহ জনিত স্ফীত জয়েন্ট আমার চেহারা দুমড়ে মুচড়ে এমন বদখৎ করে তোলে যা দিয়ে আদৌ আর কোন কাজ হয় না—অকাজ ছাড়া। এহেন পরিস্থিতিতেও সুদক্ষ সার্জনরা ভেল্কি দেখাতে পারেন। পুরু-হয়ে-যাওয়া প্রদাহে-ফুলে-ওঠা সন্ধির আস্তরণ কেটে বাদ দিয়ে আঙুল সিধে করে দেন এবং হাতকে কাজের অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন। আঙুলের জয়েন্ট যদি ধ্বংস হয়ে যায় কোনো কারণে, প্লাস্টিক বদলি দিয়ে সে মুশকিলেরও আসান হয়।

অবচেতন মনে প্রত্যেকেই আমার গুরুত্ব-সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বলেই বোধ হয় কথাবার্তার সময়ে বোকার মত আমাকে কৃতিত্ব দেওয়া হয় যখন তখন। মুঠি পাকিয়ে আস্ফালন, অথবা করমর্দন, হাত তুলে জয়ধ্বনি অথবা হাত ছুঁড়ে মুর্দাবাদ ধ্বনি ; সবার কাজে হাত লাগানোর আহ্বান অথবা হাতে ধরে বরকর্তাকে কম পণ নেওয়ার অনুনয়—সবই যেন এই হাতের খেলা !

এসব হল গিয়ে খেজুড়ে কথা। আমার আসল গুরুত্ব উপেন মহাশয় সেই দিনই টের পাবে যেদিন দুটি আঙুল আগুনে ঝলসে যাবে, সেদিন বাছাধন হাড়ে হাড়ে বুঝবে। কব্জার বোন ভেঙে যাওয়ার চাইতেও অনেক বেশী অসুবিধাকর আঙুল পুড়ে যাওয়া। ভগবান করুন, আঙুল হারা যেন কখনও হতে না হয় ওকে। কিন্তু আমি যে সৃষ্টিকর্তার কত বড় সৃষ্টি, কি বিপুল বিস্ময় এবং আশ্চর্য যন্ত্র এই নরদেহের কি নিখুঁত, উন্নত এবং অপরিহার্য অংগ—তা যেন মর্মে মর্মে এখন থেকে ও উপলব্ধি করে।

হাত

উপেনের শরীরের কয়েকটা অংশ নেহাৎই অকর্মার ধাড়ি—কোনো কাজেই লাগে না ; আমি এদেরই অন্যতম, ব্যবহারিক দিক দিয়ে দেখলে আমি অপদার্থ—আমি না থাকলেও কিছু এসে যায় না, তা সত্ত্বেও মজাটা দেখুন, উপেন আমাকে নিয়েই বেশী ভাবে ; ওর অন্যান্য অধিকাংশ জীবন-মরণের দেহযন্ত্র নিয়ে ওর যতটা না ভাবনা চিন্তা উদ্বেগ উত্তেজনা—তার চাইতে অনেক বেশী দেখাশুনা আমাকে নিয়ে। উপেন আর উমা স্বামী-স্ত্রীতে তন্নিষ্ঠ হয়ে টাকা আর সময়ের শ্রাদ্ধ করে আমার আর আমাদের সহযোগীদের পরিচর্যার জন্যে। উপেনের মাথার ৫৭,৮৮৯ নম্বর চুল আমি ; ওর সারা শরীরে ছড়ানো লক্ষ লক্ষ চুলেদের হয়ে আমি একাই বলে যাব আমাদের কাহিনী।

আকার আর আয়তনে আমরা চুলেরা রকমারি : ভুরুতে আমরা শক্ত এবং খাটো ; মাথায় দীর্ঘ এবং নরম ; কোমল এবং প্রায় অদৃশ্যই বলা যায় শরীরের প্রায় অন্যান্য সব জায়গায়। ওর মাথায় আমাদের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ, দাড়িতে তিরিশ হাজার, ওর শরীরের সবচেয়ে দ্রুত গজায় যে-সব টিশু অর্থাৎ কলাতন্তু, তাদের দলেই পড়ি আমরা। ফি বছর মাথার চুল বাড়ে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি, দাড়ি প্রায় সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি।

আদিম মানবদের রীতিমত সেবা করে গিয়েছি আমরা এই চুলেরা : চোখকে আগলে রেখেছিল ভুরু, শীতে উষ্ণতা দান করেছে মুখাবয়েবের কেশ, তলপেট অঞ্চলের এবং বাহু-সন্ধির লোম হ্রাস করেছে ঘর্ষণ জনিত জ্বালা যন্ত্রণা। শরীরের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু এদের গুরুত্ব কমে গেছে। সামরিক প্রয়োজনে দাড়ি কামাতে হয়েছে—কেন না একহাতে দাড়ি খামচে ধরে আর একহাতে তরবারির কোপে মুণ্ড কাটতে বড় সুবিধে বলে।

আমরা এই চুলেরা কি এবং আসছিই বা কোত্থেকে, জানবার জন্যে আপনার মনের ভেতরটা চুলবুল করছে বুঝতেই পারছি। চামড়ার ঠিক নিচেই রয়েছে উপচর্ম অর্থাৎ এপিডারমিস—রক্ত আর স্নায়ুর জায়গা এখানে।

উপচর্মের নচের স্তরটার নিাম অন্তস্তক্ অর্থাৎ ডারমিস (কোরিয়াম)। আসল চামড়া বলতে পারেন এই অন্তস্তক্-কে, এইখানে এক ইঞ্চির আট ভাগের একভাগ গভীরতায় প্রোথিত রয়েছে আমারই একটা ছোট্ট থলি (ফলিকল)। ছোট্ট এই থলিটা প্রকৃতপক্ষে চুল উৎপাদনের একটা ক্ষুদে কারখানা। একটানা চব্বিশঘণ্টা জটিল এবং বিস্ময়কর কাজকারবার

চুল
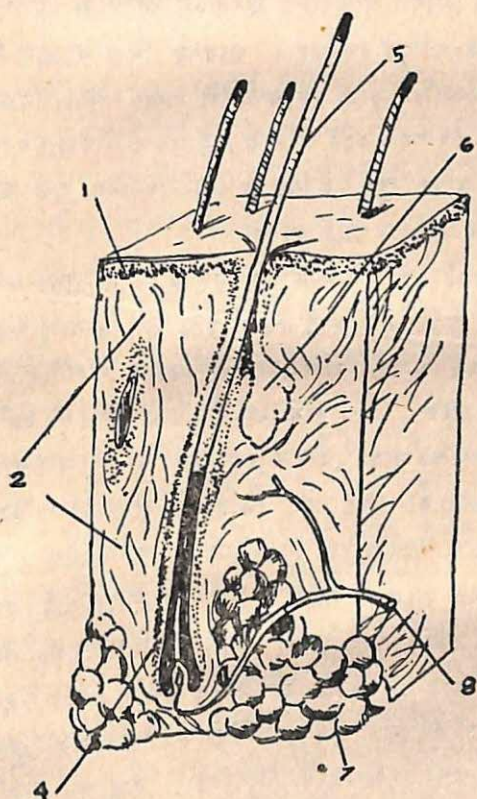
১। উপচর্ম (এপিডারমিস); অন্তশ্চর্ম (ডারমিস); ৪। চুলের গোড়ার ক্ষুদে থলি (হেয়ার ফলিকল) ৫। চুল; ৬। চর্বিগ্রন্থি; ৭। চর্বি কোষসমূহ; ৮। রক্তের জোগান;

চলছে এই ফ্যাক্টরীতে—চলে বিরামবিহীনভাবে অন্ততপক্ষে তিনটে বছর—তারপর কারখানা বন্ধ করে বিশ্রাম নেয় এবং মেরামতি নিয়ে ব্যস্ত হয়। জিরেন নেওয়ার পর আমার এই ফলিকলটি কুঁকড়ে যাবে এবং বাঁক নিয়ে নতুন করে উৎপাদন শুরু করবে। তারপর একদিন ঝরে যাবো আমি এবং আমার জায়গায় আসবে নতুন চুল—এই ঝরে যাওয়াটা ঝটপট ঘটতে পারে, রয়ে সয়েও ঘটতে পারে—কিন্তু ঘটবেই। প্রতিদিন উপেনের মাথা থেকে প্রায় ৭০টা চুল খসে পড়ে এই কারণেই। উপেন মায়ের পেটে আসার দু'মাস পরে ফলিকলরা তৈরী হতে শুরু করে। ল্যানুগো নামে রেশমের মত একটা কোমল আস্তরণের উৎপাদন করেছিল এই ফলিকল্‌রা। সাত মাসে উপেন তা খসিয়ে ফেললে। তারপর শিশু বয়েসে সারা গায়ে ছোট ছোট নরম 'ভেলাস' চুলে ঢেকে গেল সারা গা। বয়ঃসন্ধিকালে, 'ভেলাস' চুল যারা উৎপাদন করে যাচ্ছিল সেই সব ফলিকল্‌দের অধিকাংশই পালটে যায় এবং আরও স্থূল 'টার্মিন্যাল' চুল উৎপাদন শুরু করে। সেই কেশই রয়েছে উপেনের সারা গায়ে আজও।

চুল সম্বন্ধে একটা কৌতূহলোদ্দীপক বৃত্তান্ত জেনে রাখা ভালো। শেষ পর্যন্ত মাথার বহু ফলিকল্‌ই অধঃপতিত হয়ে টার্মিনাল চুলের পরিবর্তে ভেলাস চুল উৎপাদন আরম্ভ করতে পারে, অথবা কারখানা একেবারেই বন্ধ করে দিতে পারে। এর নাম মামুলী টাক পড়া। প্রতি একশজন পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে বেশ উঁচু সংখ্যক ব্যক্তি মধ্য বয়েসে উপনীত হলেই টাকে আক্রান্ত হয়—অনুপাতে মেয়েদের সংখ্যা অবশ্য কম। উপেনের যখন প্রৌঢ়ত্ব আসবে, আসবে বার্ধক্য—আমাদের ব্যাস কমে যাবে কারখানার সাইজ কমে আসার ফলে। সাধারণ নিয়ম অনুসারে সে রকম সরেসও আর থাকবো না—নিরেস হয়ে যাবো—পিছিয়ে যাবো উৎকর্ষ বিচারে।

পটাং করে মাথার একগাছি চুল ছিঁড়ে নিয়ে চুলের গোড়াটা ভাল করে লক্ষ্য করুক উপেন। দেখবে পঁচকে গদার মত ফুলে রয়েছে। দেখেই হয়ত দুশ্চিন্তা আরম্ভ হবে উপেনের। হায় রে, গেল বুঝি চুলটা চিরতরে—আর চুল গজাবে না ঐ জায়গায়। মূল শুদ্ধ উৎপাটন হয়ে গেল বুঝি। অযথা আতংকিত হতে বারণ করুন উপেনকে। চুল ঐ ফলিকল্‌ থেকেই আবার গজাবে। ফলিকল্‌টা এখন জিরেন নিচ্ছে। ঐ যে গদাটা, ওটা টার্মিনাল চুলের প্রান্ত দেশ। খামোকা ভয় পাওয়ার দরকার নেই।

প্রোটিনই চুলের ফলিক্ল্-য়ের অত্যাবশ্যক উৎপাদন। আমরা এই চুলেরা প্রায় পুরোপুরিই প্রোটিন নির্মিত। ফলিক্ল্-য়ের মত এত ছোট একটা বস্তু এত সূক্ষ্ম জটিল কেশ উৎপাদন করতে পারে, এইটাই তো একটা বিস্ময়। আমার বাইরের দিকের কোষগুলো ঘাড়ে ঘাড়ে চাপানো—দেখতে অনেকটা টালির চালের মত। চুলকে সুরক্ষিত রাখছে কিন্তু এই স্তর—জোগাচ্ছে শক্তি। আমার মাঝের স্তরের কোষগুলো লম্বাটে ধরনের—একটু বেশী মোটা—এরা শুধু আমাদের গায়ে গতরে ভারী করে। খুবই নমনীয় আমি এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাকে টেনে আরো লম্বা করা যেতে পারে। বিস্ময়কর ভাবে শক্তিমানও আমি—তিন আউন্স ওজন ঝুলিয়ে রাখতে পারি একাই।

কোষ সৃষ্টি করে তাদের সাজিয়ে আমার জটিল কাঠামো তৈরী করার সঙ্গে সঙ্গে পঁুচকে পিচাকিরি দিয়ে যেন রঙ ছুঁড়ে দেয় আমার ফলিক্ল্। খুব সূক্ষ্ম দানার আকারে ছড়িয়ে পড়ে রঞ্জক পদার্থটা। চুলের রঙ নির্ভর করে এই সব দানাদের আকার, সংখ্যা এবং ছড়িয়ে থাকার ওপর—সেই সঙ্গে রঞ্জক পদার্থটা কি শ্রেণীর, তার ওপরেও—যেমন, বাদামী-কালচে, হলদে-লাল, না কুচকুচে কালো। এ ছাড়াও প্রত্যেকটা ফলিক্ল্-য়ের লাগোয়া সিবেসাস গ্ল্যাণ্ড আছে চুলকে তৈলাক্ত রাখার জন্যে এবং জলনিরোধক চর্বি দিয়ে মুড়ে রাখার জন্যে।

সদ্য তৈরী চুলের কোষেদের কাণ্ডকারখানাগুলো সবই প্রাণবন্ত। চুলের সঙ্কীর্ণ খালের মধ্যে দিয়ে ঠেলে ওঠবার সময়ে কেরাটিনাইজেসন নামে একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়—কোষগুলো শক্ত হয়ে যেতে থাকে এর ফলে। শক্ত আঁশের মত হয়ে যাওয়াকে বলে কেরাটিনাইজেসন। এই কারণেই আমার উপরিভাগে প্রাণ বলে কিছু নেই—মৃত। যে কেরাটিন দিয়ে আমরা চুলেরা নির্মিত, সেই একই কেরাটিন গরুর শিং আর হাঁসের পালকেও দেখা যায়।

উপেনের শরীরে নানা জায়গায় একক ফলিক্ল্দের উৎপাদনের হারে বিলক্ষণ কমবেশী দেখা যায়। চোখের পাতা আর ভুরুর মত কিছু ফলিক্ল্ বেশীর ভাগ সময় জিরিয়েই কাটিয়ে দেয়। কিন্তু অতিশয় সক্রিয় যে সব ফলিক্ল্, তাদের অন্যতম আমার নিজের ফলিক্ল্। মাসে আধ ইঞ্চিটাক চুল উৎপাদন করে এই ফলিক্ল্টি। উপেনের গোঁফ দাড়ির ফলিক্ল্দের উৎপাদন বেগ কিন্তু এর চাইতে সামান্য বেশী। উপেন আর ওর বউউমার ফলি-

ফ্‌ল্ স্নের সংখ্যা প্রায় এক হলেও উমার ফলিক্‌ল্‌রা একেবারেই অন্য ধরনের চুল উৎপাদন করে। উপেন যখন নেহাৎ বাচ্চা: তখন যে ধরনের ভেলাস কেশে ওর মস্তক আবৃত ছিল, প্রায় সেই ধরনের কোমল, প্রায়-অদৃশ্য, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মিহি চুলে উমার মুখ আর সারা দেহ আবৃত থাকে। উমার ভাগ্য ভাল বলেই এমন সুবোধ ফলিক্‌ল্‌দের পেয়েছে। নইলে বুকে চুল আর গালে দাড়ি গজিয়ে যেত।

আমাদের ফলিক্‌ল্‌দের তৈরী চুল হয় সিধে, ঢেউ খেলানো অথবা কোঁকড়ানো। যে-কোনো একটা চুলকে তাড়াতাড়িভাবে কাটলে গোলাকার ডিম্বাকার অথবা চ্যাপ্টা এই তিন আকারের যে কোনো একটা আকার কাটা জায়গাটায় দেখা যাবে। চুল যাদের সোজা, তাদের আকার হচ্ছে গোল, ডিম্বাকার হলে বুঝতে হবে চুল ঢেউ-খেলানো; চ্যাপ্টা হলে পাক-খাওয়া। এই তিন আকারের মধ্যে মাত্রার তারতম্য অবশ্যই আছে। যত চ্যাপ্টা তত ঢেউ খেলানো-আমরা—এবং যত গোল ততই সিধে আমরা, শ্রীমান এই চুলেরা।

উপেনের এতদিনের কুচকুচে কালো চুলে এখন দু-একটা সাদা চুলও চোখে পড়ছে। তাই নিয়েই কত দুশ্চিন্তা ওর। এ যেন যৌবন যাওয়ার রেড সিগন্যাল। আমার রঞ্জক গ্ল্যাণ্ডগুলো উৎপাদন হ্রাস কমিয়ে আনছে, চুলে পাক ধরছে। যথা সময়ে কারখানায় তালা ঝুলিয়ে এরা উৎপাদন বন্ধ করে দেবে একেবারেই। উপেন কিন্তু তখন মাথা ভর্তি পাকা চুল নিয়ে থাকবে।

একদিক দিয়ে ধরে নিতে পারেন, আমরা এই শ্রীমান চুলেরা যেন উপেন বাহাদুরের দেহযন্ত্রের নথি-রক্ষক, চালু ইংরেজিতে যাকে বলে রেকর্ড কীপার। উপেন যা-ই খাক না কেন, অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় তা আমাদের মধ্যে নিজেদের ধরা দেবেই—বিশেষ করে ধাতুরা। আজকালকার মোটর-গাড়ীর দূষিত ধোঁয়া নিঃশ্বেসে টেনে নেওয়ার ফলে নাকি সিসের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে চলেছে বলে প্রায় গজগজ করে উপেন। ঠাকুর্দার একঝুঁটি চুল যদি পেত হাতের কাছে তাহলে দেখত তার মধ্যে রয়েছে ঠিক ততখানিই সিসে যতখানি রয়েছে ওর নিজের চুলে। সিসে দিয়ে চকচকে করা মাটির বাসনকোসন আর সিসের পাইপ থেকে এই সিসে নিশ্চয় আহরণ করেছিলেন বৃদ্ধ পিতামহ। কোনো বদ ব্যক্তি যদি উপেনের চা-য়ে আর্সেনিক অর্থাৎ

সেঁকোবিষ মিশিয়ে তাকে খতম করার চক্রান্ত করে থাকে, তাহলে যে কোনো ভালো কেমিস্ট শুধু ওর চুল পরীক্ষা করেই বলে দিতে পারে আটচল্লিশ ঘণ্টার কাছাকাছি সময়ে কখন বিষটা খাওয়ানো হয়েছে চায়ের মধ্যে দিয়ে।

আমাদের এত গুণপনার জন্যেই তো ইদানীং রক্ত আর মূত্র পরীক্ষার রুটিন টেস্ট ছাড়াও রোগনির্ণয়ে সাহায্যের জন্যে আমাদের নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার জল্পনা কল্পনা চলছে। ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের তলায় রেখে আমাদের চুলচেরা বিচার করলে অথবা এক্স-রে বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়ে যাবে উপেন বিশেষ কোনো বংশানুক্রমিক ব্যাধিতে ভুগছে, না, অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

উপেনের সাধারণ স্বাস্থ্যের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করছে আমাদের স্বাস্থ্য। বেশ কয়েকটা রোগে, যেমন, স্কারলেট ফিভার আর নিউমোনিয়াতে, আমাদের ফলিকল্ বন্ধ হয়ে যেতে পারে সাময়িক ভাবে এবং তখন খামচা খামচা চুল উঠে আসতে পারে উপেনের মাথা থেকে। এ ছাড়াও অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, দীর্ঘকাল একনাগাড়ে আতীব্র ভাবাবেগে থাকার ফলে কাতারে কাতারে ফলিক্ল্রা জিরেন নিতে আরম্ভ করে এবং সাময়িক টাকের সূচনা করে।

অনেক বাজে কথাই লেখা হয়েছে আমাদের নিয়ে—অনেক উদ্ভট অনেক বিদঘুটে গালগপ্পই শুনবেন শ্রীমান এই কেশদের নিয়ে। আমরা নাকি মানুষের মৃত্যুর পরেও গজাতে থাকি। মোটেই না। চামড়া কুঁচকে গিয়ে ঝুলে পড়ে, তলাকার চুলকে বার করে দেয়, মনে হয় যেন চুল বাড়ছে। আরও একটা ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে প্রায় সকলের মধ্যেই। রোজ দাড়ি কামালে নাকি চুল পুরু হয়ে যায়, কড়া হয়ে যায়। উপেনের বউ উমার একবার মেমসাহেবদের দেখাদেখি সখ হয়েছিল পায়ের চুল কামানোর। কামিয়েওছিল। কিন্তু যেই শুনল উপেনের মুখে—আহা! আহা! করছ কি? লোম মোটা হয়ে যাবে যে!—ব্যস, ভয়ে ময়ে পা কামানো বন্ধ করে দিল উমা। মশায়, আবার বলছি, ধারণাটা বিলকুল ভুল। হাজার কামালেও আমরা মোটা হই না, শক্ত হই না।

আরও একটা ধারণা শেকড় গেড়ে বসে আছে বহু কেশ ভক্তদের মগজের গোড়ায়। রক্ত চলাচল অপর্যাপ্ত হলে, বেশী রোদ্দুর লাগলে, আবার খুব কম রোদ লাগলেও নাকি মাথায় টাক পড়ে। প্রমাণ করে দিতে পারি, টাক পড়ার

চুল

মূলে এদের কোনটাই নেই। ধরে নিন, উপেনের মাথার ডিমের আকারে বেশ চকচকে একটা টাক দেখা দিয়েছে। ভালো সার্জন এসে ঘাড়ের কাছ থেকে চুল তুলে নিয়ে টাকে বসিয়ে দিতে পারেন এবং তখন দেখা যাবে অনুর্বর বলে যে চামড়াকে ধরে নেওয়া হয়েছে—সেখানেও চুলেরা বেঁচেবর্তে রয়েছে সুতরাং মাথায় চামড়া আঁট হয়ে গেলে অথবা রক্ত চলাচল অপর্যাপ্ত হলেই যে টাক পড়বে তার কোনো মানে নেই—টাক জিনিসটা এ দুটি কারণ ছাড়াও অনেকের মাথা আলো করে থাকতে পারে।

বংশগতি একটা বড় ভূমিকা পালন করে টাক ফেলার ব্যাপারে। উপেনের বাবা যদি টেকো হতেন, তাহলে উপেনের নিজের টেকো হওয়ার সম্ভাবনা থাকত শতকরা পঞ্চাশ। বাপ মা দুজনেই টেকো হলে সম্ভাবনা আরো উজ্জ্বল হত। উপেনের চুলের ক্ষেত্রে গ্রন্থিদেরও একটা ভূমিকা আছে। কৈশোরের কিশলয় যখন যৌবনের পর্ণে পরিণত প্রায়, বর্ণ রঙীন সেই বয়ঃসন্ধিকালে তখন উপেনের অ্যাড্রেন্যাল এবং পুং হরমোনদের বর্ধিত তৎপরতার ফলে টার্মিন্যাল চুলে ছেয়ে গিয়েছিল তলপেট অঞ্চল, বগল, পা এবং বুক। মুখাবয়বের কোমল, প্রায়-অদৃশ্য কেশ সহসা গাঢ় রঙ এবং শক্ত আকার লাভ করেছিল যৌবনের যাদুদণ্ডের স্পর্শে।

হরমোনরা উমার চুলেও পরিবর্তন এনেছিল। গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত স্ত্রী-হরমোন লাভ করেছিল উমা। লক্ষ্য করেছিল, হু-হু করে মেঘের মত ঘন কালো চুলে ছেয়ে যাচ্ছে মাথা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার মাস কয়েক পর থেকেই কিন্তু চিরুনি ভর্তি চুল উঠে এসেছে সকাল সন্ধ্যে। উমার তখন কি ঘ্যানঘ্যানানি উপেনের কাছে—অমুক ওষুধ এনে দাও, তমুক তেল এনে দাও—টাক পড়লে আর তো তুমি ভালবাসবে না। উপেনকে অতটা উত্যক্ত না করলেও চলত কিন্তু। কিছুদিনের মধ্যেই হরমোনেরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসায় ফের কুঁচবরণ রাজকন্যের মেঘবরণ কেশের মত চুল গজিয়েছিল নতুন করে—শেষ হয়েছিল দুশ্চিন্তার।

পুং হরমোন মাত্রাতিরিক্ত মাত্রায় পেলে উমার ক্ষেত্রে ফলাফলটা হবে বিপর্যয়কারী। সাধারণতঃ, অত্যন্ত অল্প মাত্রায় পুং হরমোন উৎপাদন করে উমার অ্যাড্রেন্যাল গ্ল্যাণ্ডেরা। কিন্তু যদি টিউমার হওয়ার ফলে অতি উৎপাদন আরম্ভ করে দেয় উদ্দীপ্ত হওয়া ফলে, তাহলে দাড়িওয়ালা মেয়েছেলের চাকরী নেওয়ার জন্যে রথের মেলার সার্কাসে দরখাস্ত পেশ করতে পারবে

উমা। থাইরয়েড হরমোনেরও কারসাজি আছে। খেয়াল রাখবেনঃ ইনি যদি উৎপাদন অতিশয় কমিয়ে আনেন, আমরা পাতলা, ম্যাড়মেড়ে হয়ে ঝরে পড়তে থাকব শীতের ঝরা পাতার মতই।

অন্যান্য দেহযন্ত্রের মত আমরা চুলেরাও বহু রোগের উপসর্গ হিসেবে কুপোকাৎ হই। ছত্রাক রোগ (দাদ) আমাদের আক্রমণ করে। কয়েকটা ওষুধ শরীরে ঢুকে আমাদের উৎপাটিত হতে বাধ্য করে—যেমন করে অতিরিক্ত মাত্রায় ভিটামিন এ। জীবাণু রোগেও আক্রান্ত হই আমরা। অ্যালোপেসিয়া আরিয়াতা অথবা ছোপ-ছোপ টাক একটা প্রকৃতই অদ্ভুত ব্যায়রাম। কারণ? সত্যিই জানা নেই। বংশগতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে। কেশ বিশারদদের কাছে এ রোগ পরম আদরণীয়। কেন না, তারা তো জানে উপেনের যা বয়স, এই বয়েসে মাস কয়েক পরেই চুল আবার গজাবে। কাজেই কেশবিশারদরা তাদের 'বিদ্যে' জাহির করে এবং ফল দেখিয়ে দেয় মাস কয়েক পরে।

চুলের যত্নের কথা জিজ্ঞেস করছেন? সামান্য কয়েকটা করা এবং না করাটাই অত্যাবশ্যক বলে জানবেন। ধুলো, জীবাণু আর অন্যান্য নোংরাদের ফাঁদ পেতে ধরি আমরা, এই চুলেরা। কাজেই ফি হপ্তায় একবার কি দু'বার শ্যাম্পু করাটা উত্তম অভ্যেস বলেই জানবেন। গ্রীষ্মের চড়া রোদ চুলে বেশী লাগলে আমরা শুকিয়ে যাই, খড়মড়ে ভঙ্গুর হয়ে যাই এবং বিরঙ হয়ে যাই; তখন একটাই কাজ করা উচিত আপনার। মাথায় চওড়া কিনারা টুপি পরুন অথবা বড় রুমাল বাঁধুন—আগলে রাখুন আমাদের। নোনাজলে অথবা ক্লোরিন মিশানো জলে সাঁতার কেটে উঠে মাথা ধুয়ে নিলে অথবা শ্যাম্পু করে নিলে চুলের রুক্ষ হয়ে যাওয়া নিবারণ করে।

এ ছাড়া যে সর্বোত্তম উপদেশটা দিতে চাই উপেন এবং উমাকে তা এই : সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা হোক দেহে, তাহলেই বিলক্ষণ স্বাস্থ্যবান থাকব আমি। বংশগতির রায় এসে পৌছালেই উপেনের মাথার চামড়া থেকে আমাদের চির বিদায় নেওয়ার সময় যখন আসে তখন আর করার কিছু থাকে না বললেই চলে। উমার মাথার একদা মেঘতুল্য কেশদাম যখন পাতলা হয়ে আসতে থাকে, তখন হয় চুলে রঙ, নয় পরচুলা ধারণ—এই দুটোর একটা ছাড়া বলতে গেলে আর কোনো করণীয়ই থাকে না উমার। কিন্তু এদের কারোরই এতটুকু ক্ষমতা নেই আমাদের নিয়তিকে উল্টে দেওয়ার। □